স্বামী বিবেকানন্দ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রমথনাথ বসু

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

সূচীপত্র

ভারতে জয়োল্লাস

ইতোমধ্যে স্বামীজির অপূর্ব্ব বিজয়বার্ত্তা ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সংবাদপত্র-পরিচালকগণ আমেরিকার কাগজপত্র হইতে স্বামীজি কর্ত্তৃক মহাসভায় ও অন্যান্য স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সারাংশ নিজ নিজ পত্রে উদ্ধৃত করিতেছিলেন এবং ঐসকল বক্তৃতা আমেরিকায় কি সুফল প্রসব করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতেছিলেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভেও প্রত্যহ ঐ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ মন্তব্য ও আলোচনা প্রকাশিত হইতেছিল। এইরূপে মান্দ্রাজ হইতে আলমোড়া ও কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্বামীজির যশোবার্ত্তা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। দেশের সকলেই তাঁহার কীর্ত্তিতে প্রাণে গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল।

মঠের ভ্রাতারাও এ সংবাদে আনন্দে আত্মহারা হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব যে বলিতেন, 'নরেন জগৎ মাতাইবে' এত দিনে তাহা ঠিক ফলিয়াছে,—আর মাতাইবার বাকি কি? অর্দ্ধেক পৃথিবী এখন তাঁহার জন্য পাগল বলিলেই হয়। সকলে ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এইবার ভারতও মাতিল। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব ও রাজপুতানা সর্ব্বত্র কোটি কণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল, কোটি কণ্ঠে উচ্চারিল 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জয়!' 'জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়!' কোটি মুখে ঘোষিত হইল 'জয় হিন্দুধর্ম্মের জয়! জয় হিন্দুস্থানের জয়!' বহু শতাব্দীর মধ্যে এরূপ ভারতব্যাপী আন্দোলন, উৎসাহ, জয়োল্লাস ও হর্ষের কলরোল উত্থিত হয় নাই। মুমূর্ষু ভারতবাসী

যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সঞ্জীবন মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল; যেন নব মদে মাতিয়া, নব শক্তিতে বলীয়ান হইয়া, নব আশায় উৎফুল্ল ও নব প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া জগতের সমক্ষে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিল। এমন দিন ত আর কখনও হয় নাই! পরপদ সেবা করিয়া, পরের দুয়ারে হাত পাতিয়া, পরের লাঞ্ছনা অঙ্গের ভূষণ করিয়া যে জাতির দিন কাটিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে এমন একজন জন্মিয়াছেন, যাঁহার সিংহনির্ঘোষে আজ জগৎ কাঁপিতেছে, যাঁহার উপদেশ আজ সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্ত্য জাতি মাথায় তুলিয়া লইতেছে, যাঁহার চরণধূলি মুছাইবার জন্য বিশ্বের লোক ছুটিতেছে। এ কি অদ্ভুত ভাগ্যবিপর্য্যয়!

সমগ্র ভারত আনন্দে উন্মত্ত হইল। সমগ্র ভারতের ঘরে ঘরে তাঁহার নাম তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় রটিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ জনসভা বসিল, বিপুল পুলকে সকলে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। রামনাদ হইতে মহারাজ ভাস্কর সেতুপতি তাঁহাকে তারযোগে হৃদয়ের আনন্দ জানাইলেন, খেতড়ির রাজা অজিৎ সিংহ বাহাদুর এই উপলক্ষে বৃহৎ দরবার করিয়া হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন, মান্দ্রাজ হইতে রাজা স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, দেওয়ান বাহাদুর স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার সি. আই. ই. ও অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি একটি বৃহৎ সভা করিয়া স্বামীজির কৃতকার্য্যতার জন্য বক্তৃতাদি দিয়া তাঁহাকে আপনাদের সহানুভূতি জানাইলেন। আর কুম্ভকোণম্, বাঙ্গালোর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরেও কত যে আনন্দ-উৎসব হইল, কত সভা যে স্বামীজিকে কত অভিনন্দন পাঠাইল তাহার আর সংখ্যা হয় না।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহ দৃষ্ট হইল কলিকাতায়। ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবার কলিকাতাবাসিগণ টাউন হলে রাজা প্যারীমোহন

মুখোপাধ্যায় সি. এস. আই. মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা আহ্বান করিল। এই সভায় পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, রায় নন্দলাল বসু বাহাদুর প্রভৃতি হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ন, চণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কেদারনাথ বিদ্যারত্ন, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, নন্দকুমার ন্যায়রত্ন, কৈলাসনাথ বিদ্যারত্ন, তারাপদ বিদ্যাসাগর, বেণীমাধব তর্কালঙ্কার, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন, বৈকুণ্ঠনাথ বিদ্যারত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কুমার দীনেন্দ্রনাথ রায়, কুমার রাধিকাপ্রসাদ রায়, রায় রাখালচন্দ্র চৌধুরী (বরিশাল), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী) প্রভৃতি সুশিক্ষিত, উৎসাহশীল ভূম্যধিকারিগণ, এবং মাননীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান নেশন-সম্পাদক মিঃ এন. ঘোষ, মিরর-সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, ডেলি নিউজ-সম্পাদক ডাক্তার জে. বি. ড্যালি, ন্যাশানেল গার্জ্জেন-সম্পাদক বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হোপ-সম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায় সিউবক্স বগলা বাহাদুর, মিঃ জে পাদ্শা, সিংহলের রাইট রেভারেণ্ড এন. সাধনানন্দ প্রভৃতি দেশনায়কগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও কত যে উকিল, ডাক্তার, জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অসুস্থতানিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া সহানুভূতিসূচক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

(১) এই সভা হিন্দুধর্ম্মের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন ও আমেরিকায় অন্যান্য স্থানে যেসকল কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন।

(২) এই সভা চিকাগো মহাসভার সভাপতি ডাক্তার জে. এইচ. ব্যারোজ, বিজ্ঞানশাখার সভাপতি মিঃ মারউইন মেরী স্নেল ও সাধারণভাবে সকল আমেরিকাবাসীকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(৩) এই সভা উপরি উক্ত দুইটি প্রস্তাব স্বামী বিবেকানন্দ, ডাঃ ব্যারোজ ও স্নেল মহোদয়কে এবং নিম্নলিখিত পত্রখানি স্বামী বিবেকানন্দকে পাঠাইবার জন্য সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর প্রতি

আর্য্য !

আপনি ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো মহানগরীর ধর্ম্মসভায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করাতে ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতানগরী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিবৃন্দ কলিকাতা টাউন হলে একটি মহতী জনসভা আহ্বান করেন। তাহার সভাপতিরূপে আমি আপনাকে অতিশয় আনন্দ সহকারে স্থানীয় হিন্দুসমাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনি হিন্দুধর্ম্মের গৌরবধ্বজা উড্ডীন করিবার জন্য আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনার কঠোর আত্মত্যাগ ও দুঃসহ কষ্ট সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের হৃদয়ের প্রিয়বস্তু পবিত্র আর্য্যধর্ম্মকে আপনি যেভাবে বক্তৃতা ও উপদেশাদি

দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনি বিশেষভাবে তাঁহাদিগের ধন্যবাদের পাত্র।

আপনি ১৮৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার সমক্ষে আপনার পঠিত প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি যেরূপ সুন্দর ও পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন, মনে হয় একটি বক্তৃতার মধ্যে ঐরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা আর হইতে পারে না। পরে আপনি ঐ বিষয়ে অন্যান্য স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক ঐরূপ সরল ও বিশুদ্ধ হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের ধর্ম্ম বহু দিন হইতে জগতে অনাদৃত ও মিথ্যারূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং যিনি সেই অনাদর দূর ও মিথ্যা কল্পনা নষ্ট করিয়া তাহার স্থলে সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য সাহস ও শক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক বিদেশে বিভিন্নধর্ম্মী বিপরীতাচারী লোকের মধ্যে গমন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা না হইয়া যায় না।

যে মহোদয়গণ মহাসভার আয়োজন করিয়াছিলেন ও আপনাকে উৎসাহ ও বলিবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন এবং যেসকল মহোদয় শ্রোতা ধীর সহিষ্ণু ভাবে ও প্রসন্নচিত্তে আপনার বচনাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আমাদের কম ধন্যবাদের পাত্র নহেন। হিন্দু-ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই প্রথম একজন এই ধর্ম্মের প্রচারকরূপে বিদেশে ও বিধর্ম্মীদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রচারক আপনার ন্যায় একজন কৃতী ও সর্ব্ব-গুণান্বিত মহানুভব পুরুষ।

আপনার স্বদেশীয়গণ. স্বনাগরিকগণ ও স্বধর্ম্মিগণ মনে করেন যে, প্রাচীন ধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য প্রচারের জন্য যদি তাঁহারা আপনাকে হৃদয়ের একান্ত সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা না জানান, তাহা হইলে তাঁহারা

কর্ত্তব্যহানিজনিত গুরুতর অধর্ম্মে লিপ্ত হইবেন। আপনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ভগবান তাহাতে আপনার সহায় হউন এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য আপনার মধ্যে উপযুক্ত বল ও শক্তি সঞ্চার করুন।

ইতি

নিবেদক

শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

সভাপতি

এই উপলক্ষে যাঁহারা বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গ-ভাষায় বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের এবং ইংরেজীতে বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও মিঃ এন. ঘোষের বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বক্তৃতার কিয়দংশ—

"কলিকাতা শহরে এই প্রকার সভা পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। কারণ অদ্য আমরা কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এ স্থানে সমবেত হই নাই। যে হিন্দু সন্ন্যাসী সমুদ্রপারে গমন করিয়া তাঁহার বিদ্যা ও বক্তৃতা-প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মবিস্তারের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারই সম্মানার্থ আমরা আজ মিলিত হইয়াছি। আর গৌরবের বিষয় এই যে, যাঁহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিতে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি একজন ত্রিশবৎসরবয়স্ক যুবক মাত্র। তিনি যে এত অল্প বয়সে তাঁহার অসামান্য গুণগ্রামপ্রদর্শনে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাগ্রণী জাতিকে বিস্ময়াভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় এই যুবক কিরূপ অসাধারণশক্তিসম্পন্ন। কথায় বলে, সত্য ঘটনা কল্পনাচিত্র অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। আমার মনে হয় যে, সম্প্রতি যাহা ঘটিতেছে তাহা ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত আখ্যায়িকা হইতে সমধিক বিচিত্র। আমার মনে সবিস্ময়ে এই প্রশ্নের

উদয় হইতেছে—'আমরা কি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি?' নতুবা চিকাগো নগরের ধর্ম্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অত্যদ্ভুত কৃতকার্য্যতা ও তৎপরে সমগ্র মার্কিনদেশে তাঁহার কার্য্যাবলী কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহার সফলতায় হিন্দুজাতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। বাস্তবিক উহাকে তাহাদের বর্ত্তমান অন্ধকারময় ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল রেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কারণ উহার ফলে তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইয়াছে। যখন আমাদিগের সকল আশা উন্মূলিত-প্রায়, তখন এই প্রতিভাবান যুবকের চেষ্টায় আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়লাভে আমরা অনন্ত আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। স্বামী বিবেকানন্দের মত পুরুষ জগতে অতি দুর্লভ। জাতীয় ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ নাট্যাংশ অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার জন্ম। ··· আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইব তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামনা করেন তাঁহার মূলমন্ত্র হউক 'কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম'—স্বদেশভক্ত স্বামীজি যেরূপ নিষ্কাম ও একনিষ্ঠভাবে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য এবং তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী।"

মিঃ এন্. ঘোষের ইংরেজী বক্তৃতার মাধুর্য্য অনুবাদে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। তথাপি পাঠকগণকে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য উহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"পুরাকালের গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেকানেক মনীষী আচার্য্য স্ব স্ব মত প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, অবজ্ঞাভরে সেসকল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এমন কি, অনেক স্থলে উক্ত আচার্য্যগণকে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করিতেও

কুণ্ঠিত হয় নাই। বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহ কখনও এত অল্পকাল মধ্যে এতাদৃশী সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বাগ্মিতার ইতিহাসে এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ বিরল। তিনি তাঁহার প্রাঞ্জল, সুমধুর ও যুক্তিগর্ভ বচনবিন্যাসে শ্রোতৃবৃন্দকে অনায়াসে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছেন। কিন্তু একপক্ষে আমেরিকাবাসীদিগের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও গুণগ্রাহিতা এবং অপরপক্ষে বিবেকানন্দের অতুলনীয় বক্তৃতা—এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি যে অধিকতর প্রশংসনীয় তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। এরূপ অপূর্ব্ব বিজয়লাভের বার্ত্তা ইতিহাসে আর লিখিত নাই। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, কংফুছো প্রভৃতি মহামতি জগদ্‌গুরুগণের মধ্যেও কেহই প্রথম উদ্যমে শত শত ব্যক্তিকে স্বীয় ধর্ম্মমত গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। কিন্তু এই হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক পীতবসনধারী সন্ন্যাসী চেষ্টামাত্রেই শত শত লোকের মন হইতে বহুযুগসঞ্চিত ভ্রান্ত সংস্কারসমূহ দূর করিয়া সনাতন ধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করাইতে সমর্থ হইয়াছেন—যে ধর্ম্মের কথা তাহারা পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই, বা শুনিলেও ঘৃণার চক্ষে দেখিত, বিশেষতঃ এই যুগে যখন মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায়।···

"কিন্তু এই মহাপ্রাণ পুরুষের খ্যাতি কেবল একটী বক্তৃতার উপরই প্রতিষ্ঠিত নহে। ধর্ম্মমহাসভার বক্তৃতার ফলে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য সেইখানেই শেষ হয় নাই। ইত্যাদি—"

তৎকালে দেশের লোক স্বামীজির প্রতি কিরূপ ভাব পোষণ করিতেছিলেন তাহা উপরি উক্ত বক্তৃতাসমূহ হইতে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু তাঁহারই নাম উচ্চরবে ঘোষিত হইতেছে। তিনি তখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান গৌরবস্তম্ভ, আর্য্যজাতির আশাস্থল ও আর্য্যধর্ম্মের বরণীয় আচার্য্যরূপে সকল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

প্রকৃত কার্য্যারম্ভ

বক্তৃতা-কোম্পানীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া স্বামীজিকে অনেক স্থানে ঘুরিতে হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তারপর তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবেও বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা বা লোকের বাটীতে বৈঠক অথবা ক্লাস করিয়া উপদেশাদি দিতেন। এইরূপে এক বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি আটলান্টিকের উপকূল হইতে মিসিসিপি নদীর তীর পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশের প্রত্যেক প্রধান শহরে ঘুরিয়াছিলেন এবং অসংখ্য সাধারণ সভা ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য আহূত ক্ষুদ্র বৈঠকে বক্তৃতা ও লোকশিক্ষা দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সময়কার কার্য্যাবলীর বিশেষ বিবরণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। তিনি যেখানেই যাইতেন, কাহারও না কাহারও গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ডেট্রয়েটে তিনি প্রায় একমাস মিচিগানের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জন. এইচ. ব্যাগ্‌লি মহোদয়ের সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা বিধবাপত্নীর গৃহে অতিথি ছিলেন। এই অশেষ গুণবতী রমণী প্রায় বলিতেন, "এই কালে স্বামীজির মুখে যেসব কথা শুনিতে পাওয়া যাইত তাহাতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান নিহিত ছিল। তাঁহার পবিত্র, সৌম্য মূর্ত্তি ও সারগর্ভ উপদেশাবলী যেন জগদীশ্বরের বিশেষ আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে হইত।" মিসেস্ ব্যাগলীর গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীজি মাননীয় ডব্লিউ. পামার মহোদয়ের বাটীতে দুই সপ্তাহ যাপন করিয়াছিলেন। ইনি বিশ্ব-শিল্পমেলা পরিষদের সভাপতি এবং পূর্ব্বে মার্কিনদেশের একজন সেনেটর (মহাসভার সভ্য) ও স্পেনদেশের মার্কিনের রাজদূত ছিলেন। অন্য কোথাও যাইবার কথা না থাকিলে

বা কোন স্থান হইতে নিমন্ত্রণ না আসিলে স্বামীজি প্রায় চিকাগোর জর্জ্জ হেল সাহেবের বাটীতে অবস্থান করিতেন। ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডেট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়ার পর তিনি মার্চ্চ মাস চিকাগোতে, এপ্রিল মাস নিউইয়র্কে, এবং মে মাস বষ্টনে অতিবাহিত করিলেন। জুন মাসটাও তিনি চিকাগোতে কাটাইলেন, আর গ্রীষ্মের মধ্যভাগে নিউইংলণ্ডের অন্তর্গত গ্রীন-একার নামক স্থানে কতকগুলি বক্তৃতা দিলেন। সেখানে তখন 'গ্রীন-একার কন্‌ফারেন্স' নামক সমিতির কতকগুলি অধিবেশন হইতেছিল এবং তিনি সেই অধিবেশনসমূহে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। এখানে জনকতক আগ্রহশীল ছাত্র জুটিয়াছিল। তাহারা একটি প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষের তলে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া স্বামীজির মুখে বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত। তদবধি সকলে ঐ বৃক্ষটিকে 'স্বামীজির দেবদারু বৃক্ষ' (Swami's Pine) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

এই অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ ধর্ম্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা বিদ্যালয়ের (School of Comparative Religions) সাহায্যে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রুকলিন নৈতিক সভায় বহুগুণান্বিত উদারমতি সভাপতি স্বর্গীয় ডাক্তার লুইস্ জি. জেন্‌স্ মহোদয় ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন। গ্রীন-একারের কার্য্য শেষ হইলে স্বামীজি সেখানে তাঁহার অবিনশ্বর স্মৃতি অঙ্কিত রাখিয়া বষ্টন, চিকাগো ও নিউইয়র্ক শহরের মধ্যে ও আশেপাশে বক্তৃতা দিবার জন্য তত্রত্য শিক্ষা ও সমাজনেতৃগণ কর্তৃক আহূত হইলেন। এইরূপে অক্টোবরের শেষভাগ বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটনে কাটিল। নবেম্বরে তিনি বষ্টন হইতে পুনরায় নিউইয়র্কে আসিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যে কয়বার তিনি নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন, সেই কয়বারই কাহারও না কাহারও গৃহে আতিথ্য গ্রহণ

করিয়াছিলেন, বক্তৃতাও দু-চারটি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বেশ রীতিমত কার্য্য হয় নাই। ঐরূপ একটি বক্তৃতাস্থানে স্বামীজির সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত ডাক্তার লুইস্ জেনস্ সাহেবের আলাপ হয়। তিনি স্বামীজির কথোপকথন-শ্রবণে ও গুণগ্রাম-দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, ব্রুকলিন নৈতিক সভার সমক্ষে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন; স্বামীজিও সাদরে তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে জেনস্ সাহেবের সহিত তাঁহার আমরণ সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। ৩১শে ডিসেম্বর স্বামীজি ব্রুকলিনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দিলেন। এই এক বক্তৃতাতেই আসর জমিয়া গেল, কারণ এই বক্তৃতাসভায় গুণগ্রাহী শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা স্বামীজির বক্তৃতায় এতদূর আকৃষ্ট হইলেন যে, সভার কার্য্য শেষ হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীজি সানন্দে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, পর পর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোচনা-সভা বসিল এবং 'পাউচ্ ম্যান্সন্' নামক ভবনে অনেকগুলি সাধারণ বক্তৃতাও হইয়া গেল। এ সম্বন্ধে 'ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন—

"বিবেকানন্দের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কীর্ত্তিকথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছিল। সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব বিদ্যা, বাগ্মিতা, রসিকতা, সারল্য ও পবিত্র চরিত্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, এবং তাঁহার নিকট হইতে অনেক উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি লাভের আশা করিয়াছিল। তাহাদের এ আশা নিষ্ফল হয় নাই। আচার্য্য বিবেকানন্দ প্রকৃতই একজন অতি উচ্চশ্রেণীর লোক। এমন কি, লোকের মুখে যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি তাহা অপেক্ষাও মহত্তর। তাঁহার বক্তৃতাগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। ইত্যাদি—"

১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে নিউইয়র্কে ধারাবাহিক বক্তৃতার সূত্রপাত হইল। এখান হইতেই প্রকৃত কার্য্যের আরম্ভ। স্বামীজি এখন হইতে এদিক্ ওদিক্ যাওয়া বন্ধ ও নিমন্ত্রণ-রক্ষা স্থগিত রাখিয়া নিজে স্থায়িভাবে নিউইয়র্কে একটি বাড়ী লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কতকগুলি সত্যনিষ্ঠ, উৎসাহশীল ছাত্র না পাইলে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া গঠিত করিতে না পারিলে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। হৈ-চৈ, খবরের কাগজে হুজুক যথেষ্ট হইয়াছে ও উহার ফলে তাঁহার প্রকৃত কার্য্যের পথ অনেকটা সাফ হইয়াছে—এক্ষণে আর ঐগুলির কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং তিনি এক্ষণে রীতিমত ক্লাস খুলিয়া বিনামূল্যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন ও তাহার সমুদয় ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা-কোম্পানীর কার্য্যে লব্ধ অর্থ এইরূপে ব্যয়িত হইতে লাগিল এবং এই ধর্ম্মসভার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি সময়ে সময়ে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গুরুতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন—প্রায় সর্ব্বক্ষণই লোক-শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং কয়েকজন বাছা বাছা শিষ্যকে নিয়ম করিয়া ধ্যান-ধারণা শিক্ষা দিতেন। ধ্যান শিক্ষা দিতে গিয়া কিন্তু সময়ে সময়ে নিজে এমন ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে সহজে বাহ্য-চৈতন্য ফিরিত না। তাঁহার শিষ্যেরা তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে স্বামীজি শিক্ষাদান অপেক্ষা ধ্যানের ভাব অধিক প্রবল হওয়ার জন্য নিজের উপর বিরক্ত হইতেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ-না ঘটে তাহার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিতে চেষ্টা করিতেন। দুই-এক জন শিষ্য নিকটে থাকিলে তিনি একটি নাম শিখাইয়া বলিয়া রাখিতেন যে যদি হঠাৎ তাঁহার গভীর ধ্যান বা সমাধি-অবস্থা আসিয়া পড়ে তবে ঐ নাম

কর্ণে শুনাইলে তৎক্ষণাৎ ধ্যান ভঙ্গ হইবে। কখন কখন তিনি অনুচ্চ স্বরে বেদ বা উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি বা কোন সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার শরীর হইতে যেন সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক তেজ ফুটিয়া বাহির হইত! বাস্তবিক দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চতুষ্পার্শ্বে যে গভীর শান্তি ও আধ্যাত্মিক আনন্দ বিরাজ করিত, এক্ষণে সুদূর আমেরিকায় স্বামীজির পার্শ্বেও যেন ঠিক সেইরূপ শান্তি ও আনন্দের ভাব উথলিয়া উঠিতেছিল।

ওদেশের একজন বিখ্যাত লেখক এই সময়ে স্বামীজিকে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

"যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা চিরদিন তাঁহার মনোহর ব্যবহার, প্রতিভার স্বর্গীয় জ্যোতিঃমণ্ডিত শিশুর ন্যায় সরল সহাস্য বদন, বীণাবিনিন্দিত গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার বিষয় স্মরণ রাখিবেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এতদূর বিস্ময়কর যে, তদ্দর্শনে শ্রোতৃবর্গের অন্তস্তল ভেদ করিয়া স্বতঃই এই কথা নিঃসৃত হয়—'দেবতার বরে এরূপ অপূর্ব্ব বাগ্মিতার অধিকার জন্মিয়াছে।'"

এবার নিউইয়র্কে আসিয়া স্বামীজি সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু প্রকাশিত হইত। অন্যান্য পত্রের কথা ছাড়িয়া সুবিখ্যাত 'নিউইয়র্ক ক্রিটিক' হইতে অনূদিত নিম্নলিখিত অংশটি এখানে উদ্ধৃত হইল—

"সভাসমিতি ও ধর্ম্মমন্দিরে বহুবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে এবং তাঁহার বিদ্যা, বাগ্মিতা ও মধুর ব্যবহার-দর্শনে হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের নূতন

ধারণা জন্মিয়াছে। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল ও গীতধ্বনিবৎ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁহার প্রতি শীঘ্রই অনুরাগের সঞ্চার করে। তিনি বক্তৃতা দিবার সময় কোন কাগজপত্র দেখিয়া বলেন না, অথচ বর্ণনীয় বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ এরূপ কৌশলের সহিত ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলেন যে তাহাতে শ্রোতৃবর্গের বিশ্বাস-উৎপাদন অনিবার্য্য।”

‘নিউইয়র্ক ফ্রেনলজিক্যাল জার্ন্যাল’ অর্থাৎ করোটি-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রেও স্বামীজি সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতুককর মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এখানে সেগুলি পাঠককে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না—

“স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বিষয়ে তাঁহার স্বজাতীয়গণের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। তিনি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি এবং তাঁহার ওজন ১৭০ পাউণ্ড অর্থাৎ দুই মণের উপর। তাঁহার মস্তকের উপরি-ভাগের পরিধি এক কাণ হইতে অপর কাণ পর্য্যন্ত পৌনে বাইশ ইঞ্চি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার মস্তিষ্কের পরিমাণ দৈহিক আয়তনের অনুপাতে ঠিক আছে। তিনি যেস্থানে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগী ও অনুকূল কর্ম্ম পাইবেন সেইখানেই স্বচ্ছন্দচিত্তে থাকিতে পারিবেন এবং তাঁহার বন্ধুত্বের অর্থ—তৎপ্রচারিত কার্য্যের প্রতি যাঁহারা উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তাঁহার মনোবৃত্তিসমূহ এতদূর কোমল যে তাহাতে দাম্পত্য ভাবের পোষণ অসম্ভব। আর তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে আজ পর্য্যন্ত তিনি কোন স্ত্রীলোককে প্রণয়ীর চক্ষে দেখেন নাই। তিনি দ্বন্দ্বের অবিরোধী এবং বিশুদ্ধ অহিংসাধর্ম্ম শিক্ষা দেন, সুতরাং আশা করিয়াছিলাম কর্ণমূলের নিকটে মস্তকের যে অংশ দ্বন্দ্ব ও হিংসাবৃত্তির পরিচায়ক, তাঁহার মস্তকের সেই অংশ সঙ্কীর্ণ হইবে এবং দেখিলামও তাহাই। কিঞ্চিদূর্দ্ধে অর্থোপার্জ্জন

ও সঞ্চয় এই দুই স্থানের পরিধিতেও ঐ সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিলাম। তিনি নিজেও সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, তিনি বিষয়-সম্পত্তির কোন ধার ধারেন না এবং তাঁহার কোন সঞ্চিত ধন নাই। আমেরিকানদিগের কর্ণে এই কথা বিসদৃশ শুনায় সন্দেহ নাই, কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার মুখমণ্ডলে যেরূপ শান্তি ও সন্তোষের চিহ্ন বিদ্যমান তাহা রাসেল সেজ, হেটী গ্রীণ এবং আমাদের অনেক ক্রোড়পতিদিগের মুখেও দেখিতে পাওয়া যায় না; দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও ধর্ম্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত এবং পরোপকার-প্রবৃত্তি সুপরিস্ফুট; ললাট-প্রান্তদ্বয়ের বিস্তৃতি হইতে সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বিশাল চক্ষুদ্বয়ে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় সুব্যক্ত এবং অদ্ভুত বাগ্মিতার নিদর্শন সূচিত। ললাটের ঊর্দ্ধভাগে কারণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি, মনুষ্য-চরিত্রের জ্ঞান ও অমায়িকতার ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তাঁহার মস্তিষ্কযন্ত্রের লক্ষণসমূহ মোটের উপর এইভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, দয়া, সহানুভূতি, দার্শনিক বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চশিক্ষা-সম্বন্ধীয় কৃতকার্য্যতালাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং এরূপ বিশুদ্ধ ইংরেজী বলেন যে, মনে হয় যেন ইংলণ্ডেই তাঁহার জন্ম। তিনি বিশ্বশিল্পমেলায় যে উদার ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যদি আর কিছু না করিয়া কেবল তাহারই বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হন, তাহা হইলে তাঁহার এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সার্থক ও সুসিদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।"

এদিকে স্বামীজি এত প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিতেছিলেন, আর এক দিকে আবার তিনি এক দল লোকের নিরতিশয় ঈর্ষার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজে মহর্ষি ঈশার একজন পরম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার

খ্যাতি-প্রতিপত্তি-দর্শনে গোঁড়া খৃষ্টানেরা নিজেদের স্বার্থহানি-সম্ভাবনা দেখিয়া নানাপ্রকারে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে স্বামীজি স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শরৎ বাবুকে স্বয়ং এইরূপ বলিয়াছিলেন—

শরৎ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মশায়, গোঁড়া খৃষ্টানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই ?"

স্বামীজি—হয়েছিল বৈকি ! আবার যখন লোকে আমায় খাতির করতে লাগল তখন পাদ্রীরা আমার পিছনে খুব লাগল। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বলত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য্য হয় না, তাই ঐসকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ করত, তারা অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে প্রতিবাদ করে ক্ষমা চাইত। কখনও কখনও এমনও হয়েছে—আমায় কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐসকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ীওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভোঁ, কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে ! কি জানিস, বাবা, সংসারে সবই দুনিয়াদারী ! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব দুনিয়াদারীতে ভোলেরে বাপ ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি বলছে—এসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না। (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্ব্বভাগ)

শুধু নিম্নশ্রেণীর খ্রীষ্টান পাদ্রীরাই যে তাঁহার কার্য্যে বাধা দিয়াছিল তাহা নহে। ঐ সময়ে কিছুদিন পরে মান্দ্রাজের ‘ব্রহ্মবাদিন্’ কাগজে প্রকাশিত স্বামী কৃপানন্দ নামক একজন আমেরিকান শিষ্যের পত্রে আমরা দেখিতে পাই, স্বামীজিকে নানা বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্য দিয়া কার্য করিতে হইয়াছিল। ঐ পত্রপাঠে জানা যায়, সে সময় সুসভ্য মার্কিনদেশে লোকের অজ্ঞতার অভাব ছিল না। ধর্ম্মের নামে লোকে যত রকম আজগুবি কথাই বলুক না কেন, আর যত রকম জুয়াচুরি করুক না কেন, আমেরিকায় বেশ চলিত। একটা অলৌকিক কিছু দেখিবার বা শুনিবার জন্য লোক হাঁ করিয়া থাকিত এবং তাহাদিগের অস্বাভাবিক কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতেও কাতর হইত না। প্রবঞ্চকের দলও সুযোগ পাইয়া শত শত সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ভূত, প্রেত, মহাত্মা, ভবিষ্যদ্বক্তা প্রভৃতি দেখাইবার ছুতা করিয়া অগ্রিম ২৫ হইতে ১০০ ডলার পর্য্যন্ত শুধু প্রবেশের দক্ষিণা বলিয়া গ্রহণ করিত। কৃপানন্দ বলেন, ঠিক যেন মধ্যযুগ ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই শঠতা, প্রবঞ্চনা, খেয়াল, কল্পনা ও কুসংস্কারের উর্ব্বরক্ষেত্রে স্বামীজি বেদের মহিমময় ধর্ম্ম, বেদান্তের গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ঋষিদিগের অনুপম জ্ঞানবার্ত্তা বিতরণ করিতে অবতীর্ণ হইলেন। পূতিগন্ধময় বিরাট আবর্জ্জনাস্তূপ পরিষ্কার করিয়া তাহার স্থানে সুরভি পুষ্পোদ্যানসমন্বিত শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বুঝুন কি কঠিন কার্য্য! প্রথম প্রথম রাশি রাশি লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলেই যে ধর্ম্মপিপাসু তাহা নহে; কৌতূহল-পরায়ণ হুজুকপ্রিয় লোকও ছিল, আবার কতক পূর্ব্বকথিত জুয়াচোরের দলও ছিল। এই শেষোক্ত লোকেরা স্বামীজিকে তাহাদের দলে টানিয়া

লইবার চেষ্টা করিল এবং তাঁহার কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিবে বলিয়া নানারূপ সাহায্যের প্রত্যাশা ও প্রলোভন দেখাইল। অবশেষে আবার তাহাদের সহিত না মিশিলে তাঁহার অনিষ্ট ও কার্য্যের ক্ষতি করিবে এই বলিয়া ভয়-প্রদর্শনও করিল। কিন্তু তাহাদের কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তিনি সকল প্রস্তাবের একই উত্তর দিলেন—"আমি সত্যের উপাসক। সত্য কখনও মিথ্যার সহিত আপস করিতে পারে না। যদি সমগ্র বিশ্ব আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তথাপি পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে।" তিনি শঠতা, প্রবঞ্চনা ও কুসংস্কারকে ঘৃণার সহিত দূরে পরিহার করিলেন, তাহারাও তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ সরিয়া পড়িল।

খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা ত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃপানন্দ স্বামীও ইহাদের বিরুদ্ধাচরণের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাদের অপেক্ষাও একদল যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বামীজির বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল। তাহারা সাধারণতঃ স্বাধীনচিন্তাশীল সম্প্রদায় নামে অভিহিত। নিরীশ্বরবাদী, জড়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী প্রভৃতি ধর্ম্মের বিরোধী সকল শ্রেণীর লোকই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা মনে করিয়াছিল, স্বামীজিকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিবে। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা স্বামীজিকে নিউইয়র্কে তাহাদের সমাজ-গৃহে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিল। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা তর্ক, যুক্তি ও বিজ্ঞানের বুকনি দিয়া অতি সহজেই ধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিবে এবং সেই মতলবে নিজেদের বহু শিষ্য-সামন্তকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। স্বামীজি তাহাদের আহ্বানে একাকী নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের সভাগৃহে উপস্থিত হইলে তাহারা সদলবলে তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইল। ঘোর তর্ক চলিল—তাহারা মহাদম্ভে পদার্থ, শক্তি,

বংশানুগতিকতা, প্রাকৃতিক নিয়ম, ন্যায়শাস্ত্র, সাধারণ বুদ্ধি প্রভৃতি জড়-বাদীদের ঝুলিতে যাহা কিছু চোখাচোখা ব্রহ্মাস্ত্র আছে তাহা একে একে ছাড়িতে লাগিল। কিন্তু কি বিপদ! দেখিল, যেসকল বড় বড় কথা শুনিয়া মূর্খ জনসাধারণ সহজেই ঘাবড়াইয়া যায়, স্বামীজির নিকট সেগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। তিনি শুধু অদ্বৈতেরই প্রচারক নহেন, জড়বাদীদের সব যুক্তি-তর্ক যেন তাঁহার নখদর্পণে। তিনি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা তাহাদের সকল যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে নিরুত্তর করিলেন।

তাঁহার এইদিনকার বক্তৃতার ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। পরদিন দলে দলে জড়বাদীদের শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া ঈশ্বর ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অমৃতময় উপদেশ প্রার্থনা করিল।

এইরূপে ক্রমশঃ স্বামীজি আপনার কার্য্যবিস্তার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। কালক্রমে তিনি আমেরিকার অনেক বিখ্যাত ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার ব্যবহারে অধিকতর বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইতোমধ্যে কলিকাতা টাউনহল-সভার পত্র ও ভারতের অন্যান্য স্থানের অনুমোদন ও অভিনন্দন-লিপি তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি স্বদেশীয়গণের উৎসাহ-দর্শনে আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, এবং একান্তচিত্তে জগদীশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন তিনি সনাতনধর্ম্মকে আরও উপযুক্তভাবে প্রচার করিতে পারেন। এই উৎসাহের প্রেরণায় তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত সাধারণের নিন্দা-প্রশংসা গ্রাহ্য না করিয়া কতকগুলি শিষ্যকে প্রাণপণে নিজ আদর্শে গঠিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এখন হইতে আমেরিকার কার্য্য-পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখিলেন। তিনি দেখিলেন, বিদেশে তাঁহার সফলতাদর্শনে দেশের লোকের মন এখন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে; এখন যদি তাহাদিগকে যথাযথ পথে পরিচালনা করা যায়, তবে কালে দেশ আবার পূর্ব্ববৎ উন্নত হইবে—বুঝিলেন, এই উপযুক্ত অবসর। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত অভিনন্দনসমূহের উত্তরে স্বদেশীয়গণকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে রীতিমত পত্রাদি দ্বারা কিভাবে ভারতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সেসকল পত্রের প্রতি ছত্র হইতে যে কি অদম্য তেজ, বিশ্বাস, উৎসাহ, শৌর্য্য ও ইচ্ছাশক্তি ক্ষরিত হইতেছে, তাহা পাঠক স্বয়ং না পড়িলে ধারণা করিতে পারিবেন না। ঠিক যেন রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান সেনাপতির আদেশধ্বনি! সে তূর্য্যনিনাদে যেন একই কথা উচ্চারিত হইতেছিল—এগিয়ে যাও! এগিয়ে যাও! এগিয়ে যাও! যাহারা আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতেছিল, তাহাদিগকে তিনি পুনঃ পুনঃ অভয় দিয়া লিখিলেন—"আত্মশক্তির উপর নির্ভর কর। যদি তোমরা বাস্তবিক আমার সন্তান হও, তবে কিছুতে ভয় পাইও না, কোনও কিছুর অপেক্ষা রাখিও না, সিংহের মত কাজ করিয়া যাও। ভারতকে জাগাইতে হইবে, সমস্ত জগৎকে জাগাইতে হইবে। ইত্যাদি।"

তাঁহার এসময়কার প্রত্যেক পত্র যেন অগ্নিবর্ষী। এসকল পত্র স্বামীজির 'পত্রাবলী' নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। আমরা নিম্নে যদৃচ্ছাক্রমে কতক কতক স্থল উদ্ধৃত করিলাম—

"বৎস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতে

আমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম্ম করিব, এই গরীব আমরা—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে।"

"সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দুধর্ম্মের মহান্ উপদেশসমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি-জনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।"

"বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়—যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না।"

"গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে।"

"ভগবান অনন্তশক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি, কিন্তু হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ

করিতেছি। যাও এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষদিগের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বারনারীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড় এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর, বলি— জীবন-বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন,—সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।"

"এ এক দিনের কাজ নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদেরও সারথি হইতে প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া শত শত যুগসঞ্চিত পর্ব্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।"

"তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া! এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে। তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড় লোককে গ্রাহ্য করি না। হৃদয়শূন্য, মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র-প্রবন্ধ-সমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময়

বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।"

"আমাদের কার্য্য—কাজ করিয়া মরা, 'কেন' প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমার দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে—এই বিশ্বাস রাখ।"

"ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন।"

"মনে করিও না, আমরা দরিদ্র; অর্থ জগতে শক্তি নহে, সাধুতাই, পবিত্রাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কিনা।"

"দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও এবং প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাজে লাগো। আমি আসিতেছি। আমাদের কার্য্যের এই মূল কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবে—জনসাধারণের উন্নতি-বিধান, ধর্ম্মে এক বিন্দু আঘাত না করিয়া।"

"আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!"

"বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যক নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়, তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্য্যন্ত নয়। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহদাশয় বালকগণ, উঠে-

পড়ে লাগো। নাম যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও ও কার্য্য কর। মনে রাখিও অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়। তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক—আমি বিশ্বাস করি, তাঁর শক্তি তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমানই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন—'উঠ, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ, থামিও না।' জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবসের আলোক দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরী করিলে বিষণ্ণ বা নিরাশ হইও না। লেখায় কি ফল? উৎসাহ, বৎস, উৎসাহ—প্রেম, বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় করিও না, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়।"

"অহঙ্কৃত হইও না। মতের বিভিন্নতার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কাজ কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্রে রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে ও কখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। সর্ব্বোপরি, আমার বা তোমাদের কৃতকার্যতায় অহঙ্কৃত হইও না, বড় বড় কাজ এখনও করিতে বাকি। যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে, আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্ব্বাচিত যন্ত্র। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতে উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না—অনন্ত, অনন্ত, সর্ব্বগ্রাসী; সকলেই সামনে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত

যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক। জয় প্রভুর জয়।"

"কার্য্যের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন-সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কাজ কর।... লাগো, লাগো, বৎসগণ! প্রভুর জয়!"

"হে মহামনা রাজন্![1] এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর—জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য এসকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবন ধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।"

" 'না' বলিলে চলিবে না! আর কিছুরই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনগতি-নিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু।"

"পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত প্রেত বই আর কি! হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হউক, তোমরা পাগল হইবার মত হও! তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের

১ মহীশূর-রাজ

অন্তরের বেদনা জানাও; তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে।"

"সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত যে কৃতকার্য্য হইব, এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কাজ করিয়া যাও, মনে কর আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাজে লাগ, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাজের ভার। ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে; কাজ করিয়া যাও।"

"গুপ্ত বদমায়েসি, লুকানো জুয়োচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন আপনাকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না, গুরুগিরিও চলিবে না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্য্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক বা নাই থাক, মানুষের সহায়তা পাও বা নাই পাও, তোমার প্রেম আছে ত? ভগবান ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।"

"যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয় কিন্তু উহা অবার্থ।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

তাঁহার পত্রাবলী হইতে এইরূপ অসংখ্য স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে—সেগুলি কিরূপ সদ্ভাবপূর্ণ ও স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক। কোথাও তিনি বেদান্তের গূঢ় মর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতেছেন ঋষিদিগের প্রকৃত মনোভাব কি ছিল, কোথাও দেখাইতেছেন ভারতবর্ষ ও নব্যজগতের মধ্যে প্রভেদ কোন্খানে, কোন্ বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতি হইতে হীনতর, আবার কোন্ বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা অধিক

শ্রেষ্ঠ। কোথাও হয়ত ভারতের বর্ত্তমান অভাব কি, কি করিয়া সে অভাব পূরণ হইতে পারে, এই সম্বন্ধে নানাবিধ কার্যকর উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই পত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, তিনি ভারতে আত্মত্যাগ ও বৈরাগ্যবান লোকের সাহায্যে সুপ্রণালীবদ্ধ কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য কতদূর উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বিশেষভাবে একদল সন্ন্যাসীকে সুশিক্ষিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ঐহিক ও পারমার্থিক বিদ্যা প্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে প্রেরণ করিবেন। একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

"ভারতের জনসাধারণকে উন্নত করা এখন তোমাদের একমাত্র কার্য্য। ইহার জন্য মন প্রাণ দিয়া খাটিতে পারে এমন সব যুবক লইয়া কার্য্য আরম্ভ কর।··· আর একটি সদ্‌গুণ অভ্যাস করা আবশ্যক—সেটি হইতেছে আদেশ-পালন। যাঁহাদিগের হস্তে অধ্যক্ষতার ভাব ন্যস্ত, তাঁহাদিগের কথামত কাজ না করিলে কোন সঙ্ঘকেন্দ্র গঠিত হইতে পারে না। আর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত শক্তিসমূহ একস্থানে সংহত ও কেন্দ্রীভূত না হইলে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব। ঈর্ষ্যা, অভিমান দূর কর। পরার্থে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা কর। ইহাই বর্ত্তমানে এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

এই সকল পত্রের অধিকাংশ তাঁহার উত্তরভারত ও মান্দ্রাজবাসী শিষ্যদিগকে এবং মঠের গুরুভ্রাতৃগণকে লিখিত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে যে ফল হইত প্রায় তত্তুল্য ফল প্রসূত হইয়াছিল। যিনি তাঁহার পত্র পাঠ করিতেন, তিনি উৎসাহে পূর্ণ হইতেন এবং তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। এবার নিউইয়র্কে রীতিমত কার্য্য আরম্ভ করিবার পর স্বামীজি মান্দ্রাজী শিষ্যগণকে একখানি বেদান্তবিষয়ক পত্র প্রকাশ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ

লিখিতেছিলেন। এমন কি, এজন্য বক্তৃতা কোম্পানীর নিকট হইতে লব্ধ অর্থ হইতেও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পরই ঐ পত্র 'ব্রহ্মবাদিন্' নামে পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি শিষ্যদিগকে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কিভাবে উক্ত 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজখানি চালাইতে হইবে তৎসম্বন্ধে নিউইয়র্ক হইতে ৬ই মে (১৮৯৫) তারিখে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"বেদান্ত অর্থাৎ বেদান্তের অন্তর্গত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত নামক সোপান-ত্রয়-সমন্বিত সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রে জগতের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মভাব নিহিত আছে। ঐ তিনটি সোপান ঠিক পর পর অবস্থিত ও মানব-মনের ত্রিবিধ অবস্থার উপযোগী—ইহাই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। প্রথম অবস্থায় দ্বৈতবাদ—খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপীয় জাতিরা খৃষ্টধর্ম্ম ও সেমিটিক জাতিরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তারপর—বিশিষ্টাদ্বৈত। সর্ব্বশেষ—অদ্বৈত। এই অদ্বৈতবাদের শুদ্ধযোগোপ-লব্ধির দিকটা বৌদ্ধধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই ত্রিবিধ বাদসমষ্টিই হিন্দুধর্ম্ম নামে খ্যাত এবং হিন্দুস্থানের বিবিধ জাতির মধ্যে এই ত্রিবিধ অবস্থার লোকই বিদ্যমান। অতএব হিন্দুধর্ম্ম বলিতে কোন ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বুঝায় না। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে বুঝিবে বেদান্তধর্ম্ম, আর বেদান্তধর্ম্মই জগতের ধর্ম্ম। কেবল বিভিন্ন জাতির বিভিন্নরূপ অভাব, আকাঙ্ক্ষা, মনোবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে ইহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। মূলতত্ত্ব সেই এক; শুধু শাক্ত শৈবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছে; তোমরা তোমাদের কাগজে ঐ তিন মতেরই সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইতে থাক যে, কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ নাই, তিনই একের অঙ্গীভূত,

তবে পর পর ক্রমিক অবস্থায় প্রযোজ্য, তিনের মধ্যে কোন গোল বা অসামঞ্জস্য নাই। আর তফাৎ যা, সে শুধু বহিরাচার-অনুষ্ঠানে—মূলে লক্ষ্য এক। অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি প্রচার করিয়া যাও, তার পর যাহার যেরূপ ভাব, সে সেইভাবে উহাকে আত্মগত করুক। কাগজখানি যেন ছ্যাব্‌লামি ছাড়িয়া ধীর, স্থির, গম্ভীর স্বরে লেখা হয়। এইরূপে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে একনিষ্ঠ হইয়া আপন ব্রত সম্পাদন করিয়া যাও।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

এই সময়ে শুধু 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রে নহে, ভারতের জনহিতকর অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় *-প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর হিন্দু-বিধবা বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই স্কুলটি ব্রাহ্মদিগের স্কুল ও সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্ম-পরিচালিত। ইহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। সেজন্য স্বামীজি অকপট আগ্রহের সহিত ইহার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ব্রুকলিন নৈতিক সভার সমক্ষে তিনি 'হিন্দুরমণীর আদর্শ'-শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতা উপলক্ষে যত টাকা উঠিয়াছিল তাহা তিনি সভাপতি মহাশয়কে শশিপদ বাবুর বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে সভাপতি ডাক্তার লুইস্ জেন্‌স্ মহোদয় শশিপদ বাবুকে নিম্ন-লিখিত পত্রের সহিত উক্ত সমুদয় অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"আপনার স্বনামধন্য দেশবাসী স্বামী বিবেকানন্দ একটি বক্তৃতা দিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাই আপনাকে পাঠাইতেছি। তিনি আমাদের জন্য অনেকবার বৃহৎ জনমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং

---

* কলিকাতায় 'দেবালয়' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদান্তদর্শন ও ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা জানিবার জন্য এতদ্দেশবাসীর আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্বামীজির মহত্ত্বের পরিচয়স্বরূপ একথাও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, আপনার স্কুলের জন্য বক্তৃতা দিয়া অর্থসংগ্রহ করিবার প্রস্তাব তিনিই সর্ব্বপ্রথম উত্থাপিত করেন এবং পরে আমরা তাঁহাকে ঐ কার্য্যে সাহায্য করি।"

হিন্দু হউক, ব্রাহ্ম হউক, আর্য্যসমাজী হউক, মুসলমান বা খৃষ্টান যে-কোন ধর্ম্ম বা সমাজ হউক, যাঁহারা প্রকৃত প্রেমের সহিত স্বদেশসেবা ও স্বদেশের হিতসাধন করিতেন বা কোন প্রকার উদার ভাব পোষণ করিতেন, স্বামীজি কখনও তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না; বরং সুযোগ পাইলেই তাঁহাদের প্রশংসা ও তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা করিতেন। খৃষ্টান পাদ্রীরা ত তাঁহার এত নিন্দা এবং তাঁহাকে এত জ্বালাতন করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি প্রকৃত খৃষ্টভক্তকে তিনি কতদূর সমাদর করিতেন, নিম্নলিখিত পত্র হইতে তাহা বোধগম্য হইবে—

"এখানকার খৃষ্টধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে এপিস্কোপাল ও প্রেস্‌-বিটিরিয়ান্ সম্প্রদায়ের অনেক খৃষ্টধর্ম্মযাজক আমার বন্ধু। তাঁহারা তোমাদিগের ন্যায় স্বধর্ম্মানুরক্ত ও উদারপ্রাণ। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির হৃদয় প্রশস্ত; প্রেমের প্রেরণায় তিনি এইরূপ উচ্চস্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মের নামে বাণিজ্য করিতে বসেন, তাঁহারাই ধর্ম্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতা টানিয়া আনিয়া অপরের অনিষ্ট সাধন করেন এবং নিজেদের ক্ষুদ্রচিত্তের পরিচয় দেন।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

আবার এদেশের পাদ্রীরা তাঁহার নিন্দা ও তাঁহার কার্য্যকে আক্রমণ

করিয়া যে বিষপূরিত সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহার ভারতীয় বন্ধুরা তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—

"ভবিষ্যতে লোকে আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যাহাই বলুক না কেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি অবিশ্রান্ত ভাবে কার্য্য করিয়া যাইব—এমন কি, মৃত্যুর পরেও জগতের কল্যাণের জন্য কার্য্য করিব। মিথ্যা অপেক্ষা সত্যের গুরুত্ব সহস্রগুণে বেশী।... চরিত্র-বল, পবিত্রতা-বল, সত্যের বল, মনুষ্যত্বের বল—এই থাকিলেই হইবে। যতক্ষণ আমার এসব আছে, ততক্ষণ তোমাদের কোন চিন্তা নাই—ততক্ষণ কেহ আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি কেহ আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, নিশ্চয় জানিও সে বিফলপ্রয়াস হইবে—ইহা সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

সত্যের প্রতি ও নিজের প্রতি তাঁহার এমনই অগাধ ও অসীম বিশ্বাস ছিল! এই প্রসঙ্গে এখানে এই সময়ের কিছু পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৯৪ সালে কলিকাতার পাদ্রীরা গবর্ণমেণ্টের চক্ষে তাঁহাকে একজন রাজনৈতিক প্রচারক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার আমেরিকার কার্য্যকলাপের বিকৃতার্থ করিয়া বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার কোন কোন শিষ্য দুঃখিত হইয়া পাদ্রীদিগের দুষ্টামির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে তিনি ১৮৯৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন—

"... কলকাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যেসব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি রাজনীতিজ্ঞ বা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নই। আমার লক্ষ্য কেবল

আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে—এই আমার মত। ··· অতএব তুমি কলকাতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান করে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভিতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপ করা না হয়। কি আহাম্মকি! ··· শুনলাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে নাকি খৃষ্টান মিশনারীদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এ কথা বলা হয়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে উক্ত বাবুকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি তাঁর উক্ত কথাটা কলকাতার যে-কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় প্রমাণ করুন, না হয় ঐ বাজে অর্থহীন কথাটা প্রত্যাহার করুন। এটা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে অপদস্থ করবার জন্য খৃষ্টান মিশনারীদের একটা কৌশলমাত্র। আমি সাধারণভাবে সমুদয় খৃষ্টান-পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ করে সরলভাবে সমালোচনাচ্ছলে কয়েকটা কড়া কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা তজ্জাতীয় বিষয়চর্চ্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সংশ্রব আছে। যারা ভাবেন, ঐসব বক্তৃতা থেকে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করে ছাপানো একটা মস্ত হুজুক নয়, আর প্রমাণ করতে চান যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাঁদের আমি বলি, 'হে ঈশ্বর, এই সব বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।' ··· আমার বন্ধুগণকে বলবে, যারা আমার নিন্দাবাদ করছেন তাঁদের কথায় আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি যদি ঢিল খেয়ে পাটকেল ছুঁড়ি, তবে তাদের সঙ্গে আর আমার পার্থক্য রইল কি! আমার বন্ধুদের বলবে—সত্য নিজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে, আমার জন্য তাদের কারও সঙ্গে বিরোধ করতে হবে না। ··· সাধারণের সামনে বেরোনোর দরুন এই ভুয়ো নাম

যশ পেয়ে ও খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে বেরিয়ে ক্রমাগত হৈ চৈ সৃষ্টি হওয়ায় আমি একেবারে দিক্ হয়ে গেছি। এখন কেবল প্রাণ চাচ্ছে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

কর্ম্মের প্রসার

নিউইয়র্কে স্বামীজি যে ক্লাস খুলিয়াছিলেন, তাহাতে প্রধানতঃ রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ শিক্ষা দেওয়া হইত। তিনি শিষ্যদিগকে প্রথম হইতেই বুঝাইয়া দিলেন যে, ধর্ম্ম একটা বিশ্বাসমাত্র নহে, সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়। ইহা লাভ করিতে হইলে শরীর ও মনের সংযমবিধায়ক কতকগুলি নিয়ম প্রত্যহ অভ্যাস করা আবশ্যক। অষ্টাঙ্গ যোগশাস্ত্রে এই সমুদয় নিয়ম প্রণালীবদ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই যোগেরই নাম রাজযোগ। স্বামীজি নিজেও এই সময়ে আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে যোগিজনোচিত সংযম পালন করিতেন। সুতরাং তাঁহার শিক্ষাগারটি অনেক পরিমাণে একটি মঠের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল।

রাজযোগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা জোর দিতেন ধ্যানের উপর। ধ্যান অর্থে বিষয়বিশেষে অবিচ্ছিন্ন তৈলাধারাবৎ মনঃসংযম বুঝায়। এ অবস্থায় মনকে বলপূর্ব্বক কোন বিষয়ে লিপ্ত করিতে হয় না, অভ্যাসবশতঃ মন আপনিই ধ্যেয় বিষয়ে তন্ময় হইয়া পড়ে। ধ্যানের পরিপক্কাবস্থার নাম সমাধি। সে অবস্থায় বাহ্য বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়। স্বামীজি বলিতেন, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ কোন-না-কোন আকারে বরাবরই পৃথিবীর নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। মধ্যযুগে রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সেণ্ট বার্ণার্ড অব ক্লেয়ারভো, সেণ্ট বোনাভেনচুরা অব্ দি ফ্রান্‌সিস্‌কান অর্ডার, এবং সেণ্ট থেরেসা অব্ যীশাস প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সাধকগণ ইহা অবগত ছিলেন, তবে ভারতে এই পুথগুলি যেরূপ সুন্দর ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, জগতের আর কুত্রাপি তাহা হয় নাই। স্বামীজি বলিতেন, এই দুরূহ বিষয়গুলি ঋষিদিগের হস্তে প্রকৃত বিজ্ঞানে

পরিণত হইয়াছিল, অন্য দেশের লোকেরা অজানিত ভাবে তাহার কতক কতক অংশের আভাস পাইয়াছিল মাত্র। তিনি আরও বলিতেন, রাজযোগের সাধনা করিতে হইলে অতিশয় নিয়মপূর্ব্বক ধ্যান-ধারণা অভ্যাস ও ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি শিষ্যদিগকে অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিতেন, কারণ ঐরূপ ইচ্ছা প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের পথে বিষম অন্তরায়। ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে শুধু একনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে হয়। অন্যদিকে মন দিলে সাধক কখন অভীষ্টলাভে সমর্থ হন না। এইহেতু তিনি পরমহংসদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শিষ্যদিগকে সর্ব্বদা বলিতেন, শুধু এক বস্তুর—ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর।

স্বামীজি কেবল যোগমার্গের তত্ত্ব উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, কেমন করিয়া সে তত্ত্বের সাধনা করিতে হয় তাহা স্বয়ং কার্য্যে দেখাইতেন। তিনি একাধারে জ্ঞানী ও সাধক ছিলেন; তাই আমরা দেখিতে পাই, তিনি নিউইয়র্কের এই নিভৃত আশ্রমে প্রাতে, সন্ধ্যায় বা গভীর রজনীতে প্রায়ই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সময়ে সময়ে এই ধ্যান এরূপ গাঢ় হইত যে, তিনি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন।

এইরূপ গুরুই প্রকৃতপক্ষে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিবার উপযুক্ত। যিনি পরমহংসদেবের চরণ ছায়ায় বসিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা ও মুহুর্মুহুঃ সমাধি-অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং যিনি সেই ঈশ্বরপ্রতিম শ্রীগুরুর জ্বলন্ত ত্যাগ-বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিরজীবন ঈশ্বরচিন্তা, কঠোর তপস্যা ও সাধন-ভজন করিয়াছেন, তিনি যে যোগবিদ্যার সকল গূঢ় রহস্যই অবগত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি প্রত্যেক শিষ্যের মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তদুপযোগী উপদেশ দিতেন এবং ধ্যানজ দর্শনসমূহের অতি সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ

অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া অন্য কোন জিনিস শিষ্যদিগের নিকট বলিতেন না। স্নায়ু-বিধান-গঠন-কৌশল, মস্তিষ্কের সহিত উক্ত বিধানের সম্বন্ধ এবং স্নায়বিক পরিবর্ত্তনের সহিত মানসিক অবস্থার সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিসমূহ আমেরিকার বহু চিকিৎসক ও শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদের অনেকে তাঁহার মতসমূহ অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিতেন; বলিতেন, যদিও তাঁহার মতগুলি অতিশয় অদ্ভুত রকমের (bold) তথাপি উহাদিগের মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় এবং ঐগুলি বিশেষ যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ধ্যানের দ্বারা মনুষ্য-বুদ্ধির বিকাশ ও অতীন্দ্রিয়শক্তি লাভ হয়; সেই শক্তিকেই এতাবৎকাল সকলে দৈবশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন—তাঁহার এই কথায় আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, বিশেষতঃ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌স্‌, জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভক্ত, সাধক ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণের বিভিন্ন প্রকার মানসিক অবস্থার পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজ শিষ্যেরা এসকল ধর্ম্মবিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে সাধনভজনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

স্বামীজির নিজের ধ্যানাবস্থায় এত বিবিধ প্রকারের অনুভূতি হইত যে, তিনি কোনরূপ দর্শন বা শ্রবণেই আশ্চর্য্য বোধ করিতেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বেও এ প্রকার অনুভূতি অনেকবার হইয়াছিল। বরাহনগরের মঠে ধ্যান করিতে করিতে একদিন তিনি দেহাভ্যন্তরস্থ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়কে দেখিতে পাইয়াছিলেন। আর একবার (সম্ভবতঃ ১৮৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে) পরিব্রাজক অবস্থায় গভীর ধ্যানকালে দেখিয়াছিলেন, যেন একজন ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া

"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥"

এই বৈদিক গায়ত্রী-আহ্বান-মন্ত্র অতি অপূর্ব্ব সুরে উচ্চারণ করিতেছেন। সে সুর ঐ মন্ত্রের প্রচলিত সুর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্বামীজি বলিতেন, সম্ভবতঃ প্রাচীন আর্য্যগণ ঐরূপ সুরে ঐসকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন।

রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তিনি যেসকল গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি যে যে বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তৎসমুদয় স্বয়ং অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। আর এই কারণেই সভ্যজগতের মহা মহা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার কথায় অতদূর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদিগের উক্তির সমর্থন করিয়া বলিতে পারি—

"প্রকৃতই তিনি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারসম্পন্ন, আত্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন।"

এই সময়েই ইঁহার বিখ্যাত 'রাজযোগ' গ্রন্থ ও পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্য রচিত হয়। কতকটা প্রথমে শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য বক্তৃতাকারে প্রদত্ত হইয়াছিল, বাকীটা পরে ব্রুকলিনবাসিনী মিস্ ওয়াল্ডো নাম্নী তাঁহার এক ছাত্রী কর্ত্তৃক তাঁহার সম্মুখে লিখিত হইয়াছিল। স্বামীজি মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন, মিস্ ওয়াল্ডো লিখিয়া লইতেন। মিস্ ওয়াল্ডো লিখিয়াছেন—

"সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে স্বামীজি মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হইতেন। আমি এদিকে কলমটি কালিতে ডুবাইয়া চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছি। অনেকক্ষণ পরে হয়ত তাঁহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, তিনি একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেটি লিখিয়া লইলাম।"

জুন মাসে 'রাজযোগ' গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। ইতোমধ্যে আমেরিকার

অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি স্বামীজির অনুরাগী, পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল, কয়েকজনকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার কার্য্যপরিচালনার ভার তাহাদিগের উপর দিয়া যান। দুইজন প্রকাশ্যে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেই সকলের নিকট আপনাদিগকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম ম্যাডাম মেরী লুই ও হার লিওঁ ল্যান্সবর্গ। মেরী লুই একজন ফরাসী রমণী, বহুদিন হইতে নিউইয়র্কে বাস করিতেছিলেন। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইনি জড়বাদী, ও সোশ্যালিষ্টদিগের অগ্রণী এবং একজন নির্ভীক, উন্নতিপ্রয়াসী, বিদুষী রমণী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন রুষজাতীয় ইহুদী, ইঁহারও পূর্ব্ববৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে ইনি নিউইয়র্কের একখানি প্রধান সংবাদপত্রের লেখক ও পরিচালক-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। দীক্ষাগ্রগণের পর ইঁহারা যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নামে পরিচিত হন। অন্যান্য ভক্তের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য—বিখ্যাত নরওয়েবাসী বেহালাবাদক ও ন্যাশনালিষ্টের পত্নী মিসেস্ ওলী বুল, ডাক্তার এলান ডে, মিস্ এস. ই. ওয়াল্ডো, প্রফেসর ওয়াইম্যান, প্রফেসর রাইট, ডাঃ ষ্ট্রীট এবং আরও বহু বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক ও সাধারণলোক। এই সময়ে বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ড তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দার্শনিক উপদেশ ও জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা মাদাম কাল্‌ভেও তাঁহার একজন বিশেষ ভক্তমধ্যে পরিগণিত হন। এতদ্ব্যতীত নিউইয়র্ক সমাজের সর্ব্বজন-সুপরিচিত ধনী ও ক্ষমতাশালী মিঃ ফ্রান্সিস্ লেগেট ও তাঁহার পত্নী এবং মিস্ জে. ম্যাকলাউড তাঁহার

অন্তরঙ্গ বন্ধুশ্রেণীভুক্ত হন, এবং বহু প্রকারে তাঁহার সাহায্য করেন। 'ডিক্সন্ সোসাইটি' নামক সভার সম্মুখে তিনি অনেকবার বক্তৃতা প্রদানার্থ আহূত হইয়াছিলেন। তাহার সভ্যেরাও তাঁহার সকল ভাব বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি, তড়িদ্বিদ্যাবিশারদ জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিকোলা তেস্‌লা পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া সাংখ্যোক্ত প্রাণ, আকাশ ও কল্পবাদ-পূর্ণ সৃষ্টিতত্ত্বকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি নিজে গণিতশাস্ত্রসাহায্যে ঐ তত্ত্ব প্রমাণ করিতে পারেন এবং বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যদি সৃষ্টিতত্ত্বের সমাধান করিতে চাহেন, তবে একবার ঐ সাংখ্যোক্ত তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

এইরূপে ১৮৯৫ সালের প্রারম্ভ হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্বামীজি অমানুষিক পরিশ্রমসহকারে সমগ্র আমেরিকাখণ্ডে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিয়া সহস্র সহস্র ভক্ত ও অনুরাগী শিষ্য লাভ করিলেন। তাঁহার এমন অনেক শিষ্য আছেন, যাঁহারা জীবনে কখনও তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু তাঁহার ভাবগুলি গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতেছেন। এমন কি, খৃষ্টীয় উপাসনা-মন্দির ও ভজনালয়ে পর্য্যন্ত এবং সাধারণ সভায়ও অনেকে তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেকে হয়ত সেগুলি প্রচার করিবার সময় তাঁহার নাম করিত না, তথাপি তাঁহার ভাব যে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে ইহা দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর মন শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িল। একাকী নূতন দেশে নূতন লোকের মধ্যে আজন্মসঞ্চিত কুসংস্কাররাশি দূর করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাব প্রতিষ্ঠা করা যে কি দুঃসাধ্য কার্য্য তাহা আমরা অনুমান করিতেও পারি না। তবে এইটুকু বুঝিতে বিলম্ব

হয় না যে, সুমেরুর ন্যায় অটল যাঁহার অধ্যবসায় ও বর্ষাবারিস্ফীত গিরিনদীর ন্যায় দুর্ব্বার যাঁহার কর্ম্মচেষ্টা, তিনি নিতান্ত সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত বা কাতর হন নাই।

তিনি বেদান্ত-প্রচারের জন্য প্রাণপাত করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত ছিলেন না সেই জন্য শত সহস্র বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়াও অবিরত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কিন্তু তাঁহার অনুরাগী ভক্তেরাও বুদ্ধির দোষে তাঁহাকে জ্বালাতন করিত। বষ্টনের একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে বক্তৃতাশিক্ষার ক্লাসে গিয়া কেমন করিয়া বক্তৃতা দেওয়া শিখিতে হয় তৎসম্বন্ধে উপদেশ লইবার জন্য বলিতে লাগিলেন। যাঁহার বাগ্মিতায় জগৎ মুগ্ধ, যাঁহাকে আজন্ম বাগ্মী বলিলেও দোষ হয় না, তাঁহাকে আবার বক্তৃতাশিক্ষার ক্লাসে গিয়া বক্তৃতা দেওয়া শিখিতে হইবে! কি অত্যাচার! আর একজন তাঁহাকে দল গড়িবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। আর একজন বলিতে লাগিলেন, "স্বামীজি, আপনার এই এই করা উচিত—ভাল বাড়ীতে ভাল ভাল গণ্যমান্য লোকের মধ্যে থাকা উচিত। যদি আপনি সমাজের বড় বড় লোককে বাগাইতে চান তবে আপনার নানা রকম 'চাল' দুরস্ত করা চাই, কারণ এটা ফ্যাশনের দেশ—এখানে বাহ্য ভড়ং না হলে কোন কাজ উদ্ধার হয় না", ইত্যাদি। স্বামীজি এসকল অনাবশ্যক উপদেশের উত্তরে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ওসব তুচ্ছ জিনিসে আমার দরকার কি? আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর মত থাকিব। ইহার বেশী কোন 'চাল' আমার দরকার নাই। আমি যে কাজ করিতে বা যে কথা শুনাইতে আসিয়াছি তাহারই সময় পাই না, আবার তোমাদের ভব্যতা শিখিতে যাইব! আমার সে সময় কৈ? আমি যেমন জানি সেইমত বলিয়া যাইব; যাহার ভাল লাগিবে শুনিবে—যাহার ভাল লাগিবে না, সে শুনিবে না। আমি

তোমাদের ধারণামত কার্য্য উদ্ধার করিতে চাই না।" বাস্তবিক লোকগুলির ধৃষ্টতা দেখিলে হাসি পায়।

স্বামীজি কোন বিষয়ে কাহারও প্রত্যাশী বা মুখাপেক্ষী ছিলেন না, কিন্তু যাহাদিগের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইতেন, তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে কখনও বিস্মৃত হইতেন না। আমেরিকা আগমনের প্রারম্ভে তাঁহার দুর্দ্দিনে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি সুযোগ পাইলেই নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিতেন। কাহাকেও কাশ্মীরী শাল, কাহাকেও মহার্ঘ গালিচা, মস্‌লিন বা রেশমীবস্ত্র, কাহাকেও বা পিত্তল-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ও অন্যান্য কারুকার্য্য-খচিত দ্রব্যদানে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই জুনাগড়ের প্রধান মন্ত্রী ও মহীশূরের মহারাজ তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতবর্ষে পত্র লিখিয়া তথা হইতে তাঁহার শিষ্যগণের জন্য কুশাসন ও রুদ্রাক্ষের মালা আনাইয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত গুরুতর পরিশ্রমের সহিত নিজ ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান ও ডাঃ পল কেরাসের সহিত ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পর উহারই বিস্তারস্বরূপ যে ধর্ম্মসভাগুলির আয়োজন হয়, সেইগুলিতে বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে কতকগুলি বক্তৃতা করিবার পর শ্রান্ত ক্লান্ত স্বামীজির ভাগ্যে বিশ্রামলাভের সুযোগ ঘটিল। মেন ক্যাম্প নামক জনবিরল স্থানের এক বন্ধু তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য নিজ আবাসে আসিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামীজিও আনন্দসহকারে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল ঐ স্থানের নির্জ্জন পাইন-কুঞ্জের মধ্যে যাপন করিলেন। মেন ক্যাম্পে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিউইয়র্কস্থ শিক্ষাগারের ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সকলেই তাঁহাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া

পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বারংবার বলিয়াছিল, কিন্তু তখন গ্রীষ্ম পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি আর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে সমুদ্রতীর বা শৈলাবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল ; সুতরাং কিছুদিনের জন্য ক্লাসের কার্য্য বন্ধ রাখাই স্থির হইল। তখন এই সময়টা কি করা যায় ইহা লইয়া জল্পন-কল্পনা চলিতে লাগিল। কিন্তু বেশী জল্পনা-কল্পনার প্রয়োজন হইল না। স্বামীজির এক শিষ্যা প্রস্তাব করিলেন, সেণ্টলরেন্স নদীর মধ্যস্থিত 'সহস্রদ্বীপোদ্যান' নামক দ্বীপে তাঁহার একটি রমণীয় কুঞ্জকুটীর আছে, স্বামীজি যদি ইচ্ছা করেন তবে কিছু দিন ঐ স্থানে গিয়া থাকিতে পারেন। স্থানটি অতি নির্জ্জন ও মনোরম। চতুর্দ্দিক্ জলরাশিবেষ্টিত, নদীবক্ষে দূরে দূরে আরও অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ অস্পষ্ট প্রতিভাত এবং কুটীরখানি দ্বীপের মধ্যভাগে অনতি উচ্চ শৈলোপরি অবস্থিত। সেখানে অধিক লোকের স্থান নাই বটে, কিন্তু দশ-পনর জন অক্লেশেই থাকিতে পারে। প্রস্তাবটি স্বামীজির ভাল লাগিল, তিনি মেন ক্যাম্প হইতে ফিরিয়া ওখানে থাকিবেন স্থির হইল। কুটীর-স্বামিনী এই উপলক্ষে স্থানটিকে পবিত্র দেব-নিকেতনের ন্যায় সজ্জিত করিতে বাসনা করিলেন এবং স্বামীজি ও তাঁহার শিষ্যদিগের সুবিধার জন্য পূর্ব্ব কুটীরের ন্যায় বৃহৎ আর একটি নূতন অংশ নির্ম্মাণ করাইলেন। এখানে স্বামীজি সশিষ্য দেড় মাসেরও অধিক কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমে শিষ্যসংখ্যা দশ জন ছিল। তারপর আরও দুই জন বহুশত মাইল দূর হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে দুইজন পরে স্বামীজির নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা ও আর পাঁচ জন ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাকী কয়জনও তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এখানে ১৯শে

জুন বুধবার হইতে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মমত শিক্ষা প্রদত্ত হইত। প্রথম দিন বাইবেলের জন-লিখিত সুসমাচার লইয়া আরম্ভ করা হয়, তারপর বেদান্তসূত্র, গীতা, নারদ-ভক্তিসূত্র, যোগদর্শন, বৃহদারণ্যক ও কঠ উপনিষদ্, অবধূতগীতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের অধ্যাপনা ও আলোচনা হইত। এই সময়কার প্রাণস্পর্শী উপদেশাবলী লইয়া মিস্ ওয়াল্ডো কর্ত্তৃক 'দেববাণী' নামক গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে।

এই স্থানে অবস্থানকালে সেণ্টলরেন্স নদীতীরে একদিন স্বামীজি নির্ব্বিকল্প সমাধিরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু ঐ দিনকার অনুভূতিকে তিনি তাঁহার জীবনের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি বলিয়া মনে করিতেন।

এই স্থানেই তিনি সুবিখ্যাত 'সন্ন্যাসীর গীতি' (Song of the Sannyasin) নামক কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ধনীদিগের পরিবর্ত্তে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া একজন শিষ্য ঐ সঙ্কল্পের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লেখেন, তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ তিনি এই কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ উচ্চ ও গম্ভীরভাবপূর্ণ কবিতা জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে সেই কাননবেষ্টিত নিভৃত শৈলনিবাসে স্বামীজির দিনগুলি পরম শান্তিতে কাটিতে লাগিল। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার অবকাশে তিনি কখনও কখনও স্বহস্তে পাক করিয়া শিষ্যদিগকে ভোজন করাইতেন এবং হিন্দু পুরাণাদি হইতে নানাবিধ গল্প বলিতেন।

ইংলণ্ডযাত্রা

সহস্রদ্বীপোদ্যান হইতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজি ইংলণ্ডগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মে মাস হইতেই ওখানে যাইবার সঙ্কল্প মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল এবং মিস্ হেন্‌রিয়েটা মূলার তাঁহাকে নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যগতিকে এতদিন যাইবার সুবিধা হয় নাই। এক্ষণে আবার ই. টি. ষ্টার্ডি নামক অপর এক ইংরেজ বন্ধুও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ লণ্ডনে আসিবার জন্য লিখিতে লাগিলেন এবং 'এখানে কার্য্যের বিস্তৃতক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, আপনি আসিলেই আমরা সব ব্যবস্থা করিয়া দিব', এইরূপ আশা দিতে লাগিলেন। সুতরাং অগত্যা স্বামীজি ইংলণ্ড যাওয়া স্থির করিলেন। যাত্রার আরও এক সুযোগ উপস্থিত হইল। নিউইয়র্কের একজন ধনী বন্ধুরও সেই সময়ে প্যারি হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার কথা ছিল। তিনি স্বামীজিকে তাঁহার সহিত একত্রে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সুতরাং আগষ্টের মাঝামাঝি স্বামীজি উক্ত বন্ধুর সহিত একত্রে নিউইয়র্ক ত্যাগ করিলেন এবং ঐ মাসের শেষভাগে প্যারিতে পৌঁছিলেন। প্যারি ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি। স্বামীজি প্যারি দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং নেপোলিয়ানের সমাধিস্থান, চিত্রশালা, গির্জ্জা, মিউজিয়াম প্রভৃতি বহুবিধ দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করিলেন। এখানেও তিনি তাঁহার বন্ধুর সাহায্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট নানা বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিলেন।

কিন্তু এখানে দুই দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াও নিস্তার নাই,

ভারতবর্ষের পত্রে তিনি জানিতে পারিলেন যে মিশনরীরা তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে ও তাঁহার আহার, বিহার, লোকশিক্ষা ও মতের সমালোচনা করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধ, কাগজপত্র ও পুস্তিকা চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতেছে। এমন কি তাঁহার অমল-ধবল চরিত্রের উপরও কলঙ্কারোপ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। তিনি মিশনরীদের চালাকি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার শিষ্যদিগের মনে কষ্ট হইতেছে ও হিন্দুসমাজের অনেক ব্যক্তি ঐসকল মিথ্যা প্রবন্ধাদি-পাঠে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতেছে দেখিয়া তিনি বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। বাস্তবিক অনেক হিন্দুর ধারণা হইয়াছিল যে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া স্বামীজির জাতি গিয়াছে, এবং যিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন তিনি সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মই করিতে পারেন। সুতরাং ৯ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনযাত্রার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"আমি আশ্চর্য্য হলাম যে, তোমরা মিশনরীদের আবোল তাবোল কথায় এতদূর বিচলিত হয়েছ। ভারতের লোক যদি চায় যে, আমি ঠিক খাঁটি হিন্দুর খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকব, তাহা হইলে একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও তাকে রাখার উপযুক্ত অর্থাদি পাঠাতে বলো। আসল বিষয়ে একটুও সাহায্য না করে আহম্মকের মত এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করা দেখে আমার হাসি পায়। পক্ষান্তরে যদি পাদ্রীরা তোমাদের বলে থাকে যে আমি সন্ন্যাসীর যে দুটি আসল ধর্ম্ম—কামকাঞ্চনত্যাগ, তা থেকে এক তিলও ভ্রষ্ট হয়েছি, তা হলে বলো তারা ঘোরতর মিথ্যাবাদী।…

"আর আমার নিজের সম্বন্ধে কি জান, আমি কাহারও হুকুমের চাকর নই। আমি জানি আমার জীবনের কাজ কি, তাই করে যাব। হৈ চৈ-এর ধার ধারি না। আমি ভারতের যেমন, সমুদয় জগতেরও তেমনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার পশ্চাতে এক মহাশক্তি দাঁড়িয়ে আমায়

চালাচ্ছেন। আমি কারও সাহায্য চাই না। মনে করেছ কি, আমি তোমাদের হাল-ফ্যাশনের শিক্ষিত হিন্দুদের মত জাতের গোঁড়া, হৃদয়হীন, কুসংস্কারের ঢিপি, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, কপট কাপুরুষ? কাপুরুষতা আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। কাপুরুষতা বা রাজনৈতিক বাঁদ্‌রামোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার রাজনীতি—ভগবান ও সত্য। আর সব ছাই-ভস্ম।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

বাস্তবিক মিশনরীরা চতুর্দ্দিক হইতে স্বামীজির বিরুদ্ধে যেরূপ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, অন্য লোক হইলে তাহাতে মহাবিব্রত হইয়া পড়িত। কিন্তু স্বামীজি সাধারণ লোকের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না। তিনি অতিশয় তেজস্বী ও নির্ভীক ছিলেন এবং আবশ্যক হইলে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া আত্মরক্ষা করিতে জানিতেন। প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই। তাঁহাকে প্রতিপদে ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের সহিত সংগ্রাম করিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। মিশনরীরা যখন তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়াছিল, তখন তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহাদের কথার উত্তর দিয়াছিলেন। সে উত্তরে এতটুকু সঙ্কোচ বা ইতস্ততঃ ভাব ছিল না। তবে কখনও কখনও তাঁহার বালকের ন্যায় সরল প্রাণে অভিমান হইত, তখন তিনি নির্জ্জনে জগজ্জননীর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এমন কি, আমেরিকায় প্রথম অবস্থায় একদিন তিনি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলি অমূলক নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিকটস্থ ব্যক্তিরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, "ওঃ, জগতের লোকগুলা কি দুষ্ট, এবং ধর্ম্মের নামে তারা আর একজন ঈশ্বরসেবকের কিরূপ নিন্দা করতে পারে দেখুন!" এই সকল গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতাদর্শনে তাঁহার

বন্ধুশ্রেণীভুক্ত অনেক আমেরিকান ধর্ম্মযাজকও এদেশের নীচ পাত্রীদের উপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজিকে উত্তমরূপে জানিতেন এবং অনেকে তাঁহাকে 'আমাদের প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতা' বলিয়া সম্মানের সম্বোধনে অভিহিত করিতেন। এইরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অন্যায় অপবাদ রটনা করাতে তাঁহারা আন্তরিক দুঃখিত হইয়া স্বামীজির সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ তাঁহার শত্রুদিগের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিল।

রমাবাই নাম্নী জনৈকা বিদুষী মহিলা ওদেশে শিক্ষাকার্য্যের জন্য টাকা তুলিতে গিয়াছিলেন। কথা উঠিল যে স্বামীজি নাকি ব্রুকলিন নৈতিক সভায় বক্তৃতা দিতে দিতে রমাবাইয়ের নিন্দা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি রমাবাই সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কথাই উত্থাপন করেন নাই। ব্রুকলিন নৈতিক সভায় ত মোটেই নহে—তবে একবার 'লঙ্গ আইল্যাণ্ড ঐতিহাসিক সভা' হলে তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে একজন তাঁহাকে রমাবাই সম্বন্ধে গুটিকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, রমাবাঈয়ের শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যের সহিত তাঁহার খুব সহানুভূতি আছে, কিন্তু তিনি ওদেশে যে উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন সেই উপায়গুলি-অবলম্বন সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে, আর হিন্দু বিধবাদের জীবনযাপনপ্রণালী ও তাঁহাদিগের উপর নির্য্যাতন সম্বন্ধে যে-সকল কথা রমাবাই কর্তৃক ওদেশে প্রচারিত হইয়াছে তিনি তাহার অনুমোদন করেন না। ডাঃ লুইস্ জেন্‌স্ এ সম্বন্ধে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন' নামক পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন—

"স্বামীজি প্রকাশ্যে বা স্বেচ্ছায় রমাবাইয়ের সম্বন্ধে কোন সমালোচনাই করেন নি। আর যা কিছু দু-এক কথা বলেছিলেন তাও তাঁর শিক্ষাবিষয়ক

কার্য্যসম্বন্ধে নয়, তৎকৃত অতিরঞ্জিত বর্ণনা ও কাহাকেও বাদ না দিয়া তাঁর স্বদেশীয়গণের নিন্দার বিরুদ্ধে।”

যাহা হউক, অতঃপর স্বামীজি লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলেন। লণ্ডনে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিজিত জাতির একজন প্রচারককে কিভাবে গ্রহণ করিবে, এ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল, এবং শীঘ্রই তাঁহার যশোধ্বনিতে ইংলণ্ডের আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিল। তিনি ওখানে বহু বন্ধু কর্তৃক সমাদৃত হইলেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বপরিচিত মিঃ ষ্টার্ডি ও মিস্ হেনরিয়েটার নাম পাঠক অবগত আছেন। তিনি এই সকল বন্ধুদিগের বাটীতে কয়েক দিবস যাপন করিয়া ধীরে ধীরে সামান্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মধ্যাহ্নে লণ্ডনের দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখিয়া বেড়াইতেন, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ক্লাস করিতেন বা যাঁহারা দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। শীঘ্রই তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে এবং চতুর্দ্দিক হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। এইরূপে লণ্ডন পৌঁছিবার তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি গুরুতর পরিশ্রমে ব্যাপৃত হইলেন এবং বেদান্ত ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের চতুর্ব্বিধ মার্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

লণ্ডনে যেসকল বন্ধু স্বামীজির কার্য্য-বিস্তারের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ ই. টি. ষ্টার্ডি সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন অবস্থাপন্ন, পণ্ডিত ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। বহুদিন হইতে তিনি ভারতীয় চিন্তাসমূহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভারতবর্ষে আসিয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্য নিবাসে বহু কঠোর তপস্যাও করিয়াছিলেন। ইনি স্বামীজির সহিত অনেকের আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, এমন

কি প্রথম অবস্থায় লেডী ইসাবেল মার্গেসন ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আরও কয়েকজন নিয়মমত স্বামীজির ক্লাসে যোগ দিতেন। তাহার পর ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার গেজেট, ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্রসমূহের লোকেরা তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল এবং ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাসম্বন্ধে মহাসুখ্যাতি করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথমে তিনি এই প্রচারকার্য্য বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিবেন ভাবিয়াছিলেন, কি তাহা হইল না। এই 'হিন্দু যোগী'কে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহার বন্ধুগণ ২২শে অক্টোবর পিকাডিলিস্থ 'প্রিন্সেস্ হল' নামক বাটীতে তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এখানে স্বামীজি বহু শ্রোতার সমক্ষে 'আত্মজ্ঞান' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতা-ক্ষেত্রে লণ্ডনের অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতাটি শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। পরদিন প্রাতে সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার খুব প্রশংসা বাহির হইল। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্র লিখিলেন-

"সেদিন এক ভারতীয় যুবক 'প্রিন্সেস্ হলে' বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত ভারত-বাসীর মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখনও ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দৃষ্ট হয় নাই।··· বক্তৃতাপ্রদানকালে তিনি মহাত্মা বুদ্ধ বা যিশুর দুই-চারিটি কথার তুলনায় রাশি রাশি কলকারখানা, বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পুস্তকাদি দ্বারা মানুষের যে কত সামান্য উপকার সাধিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি তিনি যে পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখেন নাই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর এবং বক্তৃতা দিবার সময়ে মুখে একটি কথাও বাধে না।"

দি লণ্ডন ডেলী ক্রনিক্‌ল, ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট প্রভৃতি আরও বহু পত্রে ঐরূপ সমালোচনা বাহির হইল।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেটের একজন সংবাদদাতা স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই সাক্ষাতের বিবরণ উক্ত কাগজের ২৩শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, "স্বামীজি যখন কথা কহেন, তখন তাঁহার মুখ বালকের মুখের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে—মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ" ; এবং এই বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছিলেন, "আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইনি যে একজন প্রধান মৌলিকভাবপূর্ণ ব্যক্তি, এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"

এইরূপে লণ্ডনে আগমনের এক মাসের মধ্যে স্বামীজি লণ্ডনবাসীর চিত্তের উপর বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়েই মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ (যিনি পরে সিষ্টার নিবেদিতা নামে জগৎপ্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন) স্বামীজির দর্শনলাভ করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের উদারতা ও দার্শনিক যুক্তির নূতনত্বে বিস্মিতা হন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মিস্ নোব্‌ল্ শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। তিনি 'সিসেম ক্লাবে'র একজন বিশিষ্টা সভ্যা ছিলেন এবং নিজে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি বিদ্বান ও বিদুষীদিগের সংসর্গে বাস করিতেন এবং আধুনিক জগতের সর্ব্বপ্রকার মতামত ও চিন্তাপ্রবাহের সহিত পরিচিতা ছিলেন। স্বামীজির কথাগুলি তাঁহার নিকট নূতন ও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। তিনি বিশেষ মনোযোগসহকারে উহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সব ধারণা করিতে পারিলেন না। বাস্তবিক স্বামীজি অতি সরলভাবে বুঝাইলেও বেদান্তবাক্যের অর্থ উপলব্ধি করা বৈদেশিকের পক্ষে বড় সহজ নহে।

বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে তন্মধ্যে প্রবেশলাভ করা আরও দুরূহ। সেই জন্য মিস্ নোব্‌ল্ স্বামীজির সকল কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তথাপি ঐগুলি মনোমধ্যে বারংবার আন্দোলন ও গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎফলে স্বামীজি ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মিস্ নোব্‌ল্ তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রথম দর্শন-লাভের বৃত্তান্ত নিবেদিতা তাঁহার 'স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' (The Master as I Saw Him) নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের অভিজাতসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের আলয়ে মধ্যে মধ্যে যেসকল কথোপকথন-সভা হইত স্বামীজি তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের, বিশেষতঃ বেদান্তমার্গের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করিতেন। এইরূপে কখনও কর্ম্ম ও পুনর্জ্জন্মবাদ, কখনও শান্তদাস্যাদি পঞ্চভাবের সাধনা, কখনও জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগ এই চতুর্ব্বিধ সাধনমার্গ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হইত। তাঁহার ক্লাসেও বহু ব্যক্তির সমাগম হইত। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার কথাশ্রবণের জন্য এত ব্যগ্র হইত যে, স্থানাভাবে ঘরের মেজেতে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠা-বোধ করিত না। এসম্বন্ধে একটি দৈনিক পত্রে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন—

"বাস্তবিক লণ্ডনের গণ্যমান্য-পরিবারভুক্ত মহিলাগণকে চেয়ারের অভাবে ঠিক ভারতীয় শিষ্যদের ন্যায় সশ্রদ্ধভাবে গৃহতলে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে দেখা এক বিরল দৃশ্য! স্বামীজি ইংরেজ জাতির হৃদয়ে ভারতের প্রতি যে প্রেম ও সহানুভূতি সঞ্চার করিতেছেন, তাহা ভারতের উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে।"

এইরূপে স্বামীজির ইংলণ্ডগমনে আশাতিরিক্ত ফল ফলিল। ইংলণ্ডে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ওদেশে বেদান্তপ্রচারের সুবিধা হইবে কিনা তাহাই অল্পস্বল্প পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, কিন্তু ফলে যাহা দাঁড়াইল তাহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ, বাছা বাছা ক্লাব, সোসাইটি, সাধারণ নরনারী, অভিজাতবর্গ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, এমন কি ধর্ম্মযাজকেরা পর্য্যন্ত সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও তাঁহার ভাব গ্রহণ করিতে লাগিল। তিনি ইংলণ্ডীয় সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সহিত মিশিলেন এবং সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহার সহিত চিরবন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

ইংলণ্ডে গিয়া স্বামীজি এইটুকু বুঝিলেন যে, আমেরিকার লোকে খুব আগ্রহের সহিত নূতন ভাব গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সে ভাব তাহাদিগের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের লোক যদিও সহজে নূতন মত গ্রহণ করিতে বা নূতন লোককে আমল দিতে চাহে না, তথাপি যদি একবার তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, কোন ভাব বা মত উত্তম, তবে তাহারা চিরদিনের জন্য সেটিকে গ্রহণ করিবে ও কিছুতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। ইংরেজ চরিত্রের এইটুকু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া তিনি ইংলণ্ডে অধিকতর কার্য্যবিস্তারের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এ যাত্রায় তাহা হইয়া উঠিল না। তাঁহার আমেরিকান বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণ তাঁহাকে আমেরিকায় ফিরিয়া যাইবার জন্য পত্রের উপর পত্র লিখিতেছিলেন এবং প্রতি পত্রে জানাইতেছিলেন যে আমেরিকার কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ব্যাপকভাবে চলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে[১] ইত্যাদি।

১ কারণ এই সময়ে বষ্টনের একজন ধনবতী মহিলা আগামী শীতের সময়ে স্বামীজির কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক উৎসাহের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল।

এদিকে ইংরেজবন্ধুগণও তাঁহাকে ইংলণ্ডে আরও কিছুদিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, আরব্ধ কার্য্য এরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া গেলে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বামীজি বলিলেন, "ইংলণ্ডে যে বীজ বপন করিয়া গেলাম, ইহার অঙ্কুর-উৎপত্তি হইতে কিছু সময় লাগিবে। এখন এই পর্য্যন্ত থাকুক। ইহার পর আবার আসিব।" তবে ইংলণ্ডত্যাগের পূর্ব্বে তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট বন্ধুকে আরব্ধ কার্য্য চালাইবার পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে ই. টি. ষ্টার্ডি সাহেবের চেষ্টায় একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল। তাঁহারা নিয়মিতভাবে ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ পঠন-পাঠন ও আলোচনা করিতে লাগিলেন।

স্বামীজির এই একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অতি অল্প কথায় বড় বড় ভাব ও জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহ জলের মত সহজ করিয়া বুঝাইতে পারিতেন। তাঁহার সহিত যে একবার দেখা করিতে যাইত, সে-ই সম্পূর্ণ নূতন ও উচ্চভাব লইয়া ফিরিত। সে-ই প্রাণে প্রাণে বুঝিত, এইরূপ মহাপুরুষ সে জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। যিনি যতই বিরুদ্ধভাব লইয়া প্রথমে তাঁহার নিকট আসুন না কেন, ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভগবৎ-প্রেমের সম্মুখে অবনত মস্তকে আন্তরিক শ্রদ্ধার অঞ্জলি উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। নিবেদিতার মত অনেকেই প্রথম প্রথম তাঁহার সমগ্র ভাব গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে 'গুরু ও আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমেরিকায় বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তিস্থাপন

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে স্বামীজির পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ—স্বামী কৃপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ও মিস্ ওয়াল্ডো আমেরিকার বেদান্তপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা নিউইয়র্ক শহরে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বেদান্ত-ক্লাস করিতেছিলেন এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য শহরেও স্বামীজি-প্রদর্শিত পথে কার্য্য করিতেছিলেন। এইরূপে বাফেলো ও ডেট্রয়েট নামক স্থানে দুইটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রেই বহু সত্যান্বেষী শ্রোতার সমাগম হইত। স্বামীজি ইংলণ্ডে তিন মাস অতিবাহিত করিয়া ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার সুন্দর স্বাস্থ্য লইয়া নিউইয়র্কে প্রত্যাগমন করিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার পরিশ্রম যদিও কম হয় নাই তথাপি তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং মনেও খুব স্ফূর্ত্তি বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি ও স্বামী কৃপানন্দ ৩৯ নং ষ্ট্রীটে দুইটি বৃহৎ ঘর লইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং উহাকেই তাঁহাদের প্রধান কার্য্যস্থান করিলেন। ঐ ঘর দুইটিতে দেড়শত লোকের স্থান হইতে পারিত। বষ্টনের যে স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে সাহায্যের আশা দিয়াছিলেন তিনি কোন কারণবশতঃ উপস্থিত সে সাহায্য করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু স্বামীজি কোন লোক বা কাহারও সাহায্যের উপর বড় বেশী নির্ভর করিতেন না। সুতরাং তিনি নিজেই পুনর্ব্বার প্রবল উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। এবার তিনি প্রধানতঃ 'কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই বক্তৃতাগুলি এক্ষণে 'কর্ম্মযোগ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে তাঁহার এই গ্রন্থখানিকে তৎপ্রণীত রচনাসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। দুই সপ্তাহ এই প্রকারে অবিরাম

প্রচার চলিল। প্রতি সপ্তাহে সতেরটি ক্লাস হইত; তা ছাড়া বিস্তর চিঠিপত্র লিখিতে এবং যেসকল লোক দেখা করিতে আসিত তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। এই সময়ে যেসব বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহার মধ্যে কতকগুলির নাম প্রদত্ত হইল—(১) ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি? (২) সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের আদর্শ, (৩) বিশ্বজগৎ, সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্রম।

স্বামীজি স্বয়ং কখনও কোন বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করাইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মুখে মুখে বক্তব্য বিষয় অনর্গল বলিয়া যাইতেন, তাহার কোন খসড়া বা নকল থাকিত না। এইরূপে অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা নষ্ট হইয়া যায়। তদ্দর্শনে তাঁহার শিষ্যদের ইচ্ছা হইল একজন রিপোর্টারকে দিয়া ঐগুলি টুকিয়া রাখেন। তদনুসারে ১৮৯৫ সালের শেষে তাঁহারা একজন রিপোর্টারকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীজির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিলেন না। বাস্তবিক তাহা সম্ভবপরও নহে। কারণ, প্রথমতঃ বিষয়টাই তাঁহার জানা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, স্বামীজি এত দ্রুত বলিতেন যে বিশেষ অভ্যাস না থাকিলে কাহারও পক্ষে তাঁহার বক্তৃতা লিখিয়া যাওয়া সহজ ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে বিদায় দিয়া আর একজনকে আনা হইল। কিন্তু তিনিও তদ্রূপ হইলেন। অবশেষে দৈবক্রমে জে. জে. গুড্‌উইন নামক এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেল। ইনি অল্পদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন। ইঁহাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করামাত্রই আশ্চর্য্য ফল ফলিল। ইনি সাঙ্কেতিক লিখনপ্রণালীর সাহায্যে স্বামীজির প্রত্যেক কথাটি ঠিক ঠিক তুলিয়া লইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে তাহা প্রচলিত ইংরেজী অক্ষরে লিখিতে লাগিলেন। এই ভদ্রলোকের বিষয়বুদ্ধি বেশ পাকা রকমের ছিল এবং ইনি জীবনে অনেক জিনিস দেখিয়া শুনিয়া প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বামীজিকে প্রথম দেখা অবধি ইনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, এবং সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি স্বামীজির একজন অতিশয় অনুরাগী ভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যায় রত থাকিতেন। স্বামীজির বক্তৃতাগুলির জন্য তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন। প্রথমে সাঙ্কেতিক অক্ষরে লেখা—তারপর সেই দিনই সেইগুলি টাইপ করিয়া প্রেসে পাঠান এবং পুনরায় পরদিনের বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হওয়া—এই ভাবে খাটিতে খাটিতে তিনি এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ পাইতেন না। স্বামীজি তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন ও তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতেন। তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত 'my faithful Goodwin' (আমার বিশ্বস্ত গুড্‌উইন)। বাস্তবিক স্বামীজি যেখানে যাইতেন গুড্‌উইন তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, একদিনের জন্যও তাঁহার কাছ-ছাড়া হইতেন না। এইরূপে ১৮৮৬ সালে ডেট্রয়েট ও বষ্টনে এবং পরে স্বামীজি ইংলণ্ডে যাইলে ইংলণ্ডে ও সেখান হইতে স্বামীজির সহিত ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত তিনি আগমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। গুড্-উইনের বিয়োগে স্বামীজি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আজ আমার যে ক্ষতি হইল তাহা বলিবার নহে—আমার ডান হাত খসিয়া গেল।" বাস্তবিক গুড্‌উইনের মৃত্যুতে জগতের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। স্বামীজি মুখে মুখে বক্তৃতা দিতেন বলিয়া লেখালেখির ধার ধারিতেন না। বস্তুতঃ 'রাজযোগের' কিয়দংশ ও অন্যান্য দুই-চারিটি রচনা ব্যতীত তিনি নিজে আর কোন দার্শনিক গ্রন্থ লেখেন নাই। সুতরাং গুড্‌উইন সাহেব না থাকিলে আমরা আজ স্বামীজির বক্তৃতার সামান্য যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, তাহাও দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ।

ধন্য প্রভুভক্ত গুড্‌উইন! তুমিই জগতে স্বামীজির জ্ঞানগরিমার বিমলরশ্মি চিরদিন প্রদীপ্ত রাখিয়াছ, নতুবা ইহা বহুদিন পূর্ব্বেই হয়ত অনন্ত কালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইত।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাষে স্বামীজি বষ্টনে গমন করিয়া মিসেস্ ওলী বুলের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ওখান হইতে পুনরায় নিউইয়র্কে ফিরিয়া ১৮৯৬ সালের ৫ই জানুয়ারী হইতে প্রতি রবিবার হার্ডম্যান হল নামক স্থানে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এসকল বক্তৃতার জন্য তিনি কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না। ব্রুকলিনের তত্ত্ববোধিনী সভা ও নিউইয়র্কের সাধারণ ধর্ম্মসমাজে তিনি যেসকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতেও বহু শ্রোতার সমাগম হইত এবং সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। প্রকাশ্য জনসভায় এই সকল বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নির্ব্বাচিত ছাত্রগণও সপ্তাহে দুইবার করিয়া একত্র মিলিত হইতেছিল এবং উহার আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। যাঁহারা প্রকাশ্য সভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে আবার এখানেও আসিয়া জুটিতে লাগিলেন এবং হার্ডম্যান হলে সময়ে সময়ে এত লোকের ভিড় হইত যে, দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত জায়গা থাকিত না। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল 'বিদ্যুৎ বক্তা,' কেহ বা বলিত 'ঝড়ো হিন্দু'। শীঘ্রই নিউইয়র্ক শহরময় তাঁহার বাগ্মিতার এরূপ খ্যাতি প্রচারিত হইল যে, ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হইলে এখানে লোকের জায়গা হইবে না বুঝিয়া ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন নামে একটি সুবৃহৎ হল ভাড়া লওয়া হইল। ঐ হলে দেড় হাজারেরও অধিক লোকের বসিবার স্থান ছিল। এখানে 'ভক্তিযোগ', 'মানবাত্মার স্বরূপ' ও 'মদীয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামক তিনটি বক্তৃতা হয়। এই মাসে তিনি হার্টফোর্ডে তত্ত্ববোধিনী সভার আহ্বানে উক্ত সোসাইটি-গৃহে 'জীবাত্মা ও

পরমাত্মা' সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে 'দি হার্টফোর্ড ডেলী টাইমস্' লিখিয়াছিলেন—

"ইঁহার কথাবার্ত্তা আজকালকার নাম-সর্ব্বস্ব খৃষ্টানদের মত নয়, বরং অনেকটা খৃষ্টেরই মত। তাঁহার উদার ভাব সকল ধর্ম্ম ও সকল জাতিকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত। আমরা তাঁহার গত রাত্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং তাঁহার লাল আলখাল্লা ও হলুদ রং-এর পাগড়ীতে তাঁহার সুন্দর মুখখানি ঠিক একখানি ছবির মত দেখাইতেছিল। আর তাহার উপর তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। তিনি চমৎকার ইংরেজী বলেন, আর উচ্চারণের ধরন এমনি যে তাহাতেই যেন কথাগুলি আরও মধুর বোধ হয়।"

এই ফেব্রুয়ারীতে তিনি ব্রুকলিন নৈতিক সভার সমক্ষেও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে সর্ব্বত্র প্রবল উৎসাহের স্রোত বহিয়াছিল। দিন দিন তাঁহার প্রভাব ও কৃতকার্য্যতা-দর্শনে ১৮৯৬ সালের জানুয়ারীর শেষে নিউইয়র্কের প্রধান সংবাদপত্র 'দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড' লিখিয়াছিলেন—

"আজকাল স্বামী বিবেকানন্দের নাম নিউইয়র্কে অনেক ধনী ও পণ্ডিত মহলে যেন যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। তাঁহার কার্য্য যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছে। তিনি নিজের অতীত জীবনের বিষয় বড় একটা বলেন না, তবে মাঝে মাঝে তাঁহার গুরুদেবের কথা বলিয়া থাকেন। সেই গুরুদেবের ভাবই তিনি এদেশে প্রচার করিতেছেন।

"তাঁহার চালচলন যে চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই এবং লোককে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিবার শক্তিও তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এদেশের নরনারী যেরূপ গম্ভীরভাবে ও প্রগাঢ়

মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে, কেবল উপদিষ্ট বিষয়ের মনোহারিত্বই তাহাদিগকে এতদূর মুগ্ধ করে নাই।”

নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সংবাদদাতা স্বামীজির এই প্রকার বিবরণ দিয়া লিখিতেছেন—“কিছুদিন পূর্ব্বে আমি স্বামীজির এক ক্লাসে গিয়াছিলাম। দেখিলাম অনেকগুলি লোক তথায় উপস্থিত—সকলেরই সুন্দর বেশ ও প্রতিভাব্যঞ্জক আকৃতি। তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসক, ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ, অন্যান্য শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়া মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। গৈরিকবসনাবৃত স্বামী বিবেকানন্দ সকলের মধ্যভাগে বসিয়াছিলেন—লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় একশত হইবে—তাঁহারা স্বামীজির উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে সমাসীন। বিষয় ছিল—‘কর্ম্মযোগ’। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে স্বামীজি সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার সহিত করমর্দ্দন বা তাঁহার বিশেষ পরিচয়লাভের জন্য যে প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতেই বুঝা গেল তাঁহাদের উপর স্বামীজির প্রভাব কতদূর! কিন্তু নিজের সম্বন্ধে স্বামীজি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই-একটি কথা ব্যতীত আর কিছু বলিলেন না।” ইত্যাদি

ব্রুকলিন হইতে হেলেন হান্টিংডন এই সময়ে স্বামীজি সম্বন্ধে মান্দ্রাজের ‘ব্রহ্মবাদিন্’ নামক ইংরেজী মাসিক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন—“কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমরা ভারতবর্ষ হইতে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা লাভ করিয়াছি। তাঁহার মহান গম্ভীর দার্শনিক উপদেশ ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে এদেশবাসীর নৈতিক জীবনের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই পূতচরিত্র ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী মহাপুরুষকে দেখিয়া আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের এক অতি উচ্চস্তর বিশ্বপ্রেমরূপ ধর্ম্ম, আত্মোৎসর্গ ও মানবের কল্পনায় যতদূর নির্ম্মল ও পবিত্র ভাব ধারণ করা সম্ভব তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম কোন মত বা বিশ্বাসের

ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। এই ধর্ম্ম মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়, মনুষ্যচরিত্রের মালিন্য নাশ করে এবং দুঃখের সময় অশেষ সান্ত্বনা দেয়—ইহা দোষ-সম্পর্কশূন্য এবং ভগবৎপ্রেম সর্ব্বাঙ্গীণ পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

"ভক্তগণ ব্যতীত আরও অনেকের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধুত্ব হইয়াছে। তিনি সমাজের উচ্চ নীচ সকল লোকের সহিত বন্ধু ও ভ্রাতৃভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এখানকার শহরগুলির মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ও চিন্তাশীলতায় অগ্রণী, তাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ ও বৈঠকে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে ইতোমধ্যেই এখানে ধর্ম্মজীবনের বিকাশ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। নিন্দা বা প্রশংসায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। কেহ তাঁহাকে অযথা বা অসঙ্গতভাবে আপ্যায়িত করিতে চাহিলে তিনি প্রকৃত ধর্ম্মযাজকের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তিকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করেন। যাহারা অসৎ চিন্তা বা অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত, তিনি শুধু তাহাদিগেরই নিন্দা করেন এবং পবিত্রতা ও সৎপথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। এক কথায়, এইরূপ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া রাজা মহারাজারাও পরিতৃপ্ত হন।"

এ সময়ে আমেরিকান সমাজের উপর স্বামীজির প্রভাব সম্বন্ধে স্বামী কৃপানন্দ ১৮৯৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"আমার গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে পত্র লিখিবার পর গুরুদেব আরও অনেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার বৈঠকে ছাত্রসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া ও রবিবারের বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের জনতা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার শিক্ষা এদেশে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে।

হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিকতা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি অসীম শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। তাঁহার অমানুষিক চেষ্টা যে দেখিবে, সে-ই চমৎকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। তাঁহাকে প্রত্যহ দুইবার বক্তৃতা দিতে হয়, বহুলোককে পত্রাদি লিখিতে হয়, অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, অনেককে পৃথক্‌ভাবে উপদেশ দিতে হয় এবং যাঁহারা তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিবার জন্য পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিরন্তর পরিশ্রম করিতে হয়। বিশ্বপ্রেমপ্রসূত অদম্য ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে এরূপ কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার ঐরূপ বলিষ্ঠ দেহও এতদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িত। ইচ্ছাশক্তির বলেই তিনি প্রফুল্লচিত্তে এই প্রকার দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তিনি এক দিকে যেমন পরম ভক্ত ও জ্ঞানী, অপর দিকে তেমনি কর্ম্মযোগের অবতার। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই তিনটির একাধারে সম্মিলন তাঁহার পূজনীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ ছিল। স্বামীজি তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য বটে।

"স্বামীজি-প্রদত্ত শিক্ষা ও উপদেশ পুস্তকাকারে পাইবার জন্য বহুলোক উদ্‌গ্রীব হওয়ায় তাঁহার রবিবাসরীয় বক্তৃতাসমূহের কয়েকটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং অতি সামান্য মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। পুস্তিকাগুলি খুব শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় হইতেছে এবং এইরূপে যেখানে বেদান্তদর্শনের কথা কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই, সেখানেও তাহার প্রচার হইতেছে। 'কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে স্বামীজির আটটি উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে। এই কার্য্যে স্বামীজির কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

"তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মভাবের প্রবল স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জনসাধারণের মন হইতে আজন্মপোষিত

ভ্রান্তি ও কুসংস্কাররাশি দূর হইয়া সত্যানুসন্ধান-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। এইরূপে তাঁহার উপদেশসমূহ শনৈঃ শনৈঃ সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার ও উহার আধ্যাত্মিক কল্যাণবিধান করিতেছে। বেদান্তদর্শনের পাঠার্থি-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং যাহাদের মুখে কেহ কখনও সংস্কৃত শব্দ বা বাক্য শুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই, সেই আমেরিকাবাসিগণ যখন-তখন ঐসকল শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। যেখানে যাও দেখিবে—আত্মা, পুরুষ, প্রকৃতি, মোক্ষ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতেছে এবং হাক্সলী ও স্পেন্সারের ন্যায় রামানুজ ও শঙ্করাচার্য্যের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরিতেছে। সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালয়গুলি ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইতেছে তাহাই ক্রয় করিতেছে। মোক্ষমূলর, কোলব্রুক, ডয়সন, বর্ণুফ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দু দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ইংরেজীতে যেসকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তৎসমুদয় বহুপরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। এমন কি, জার্ম্মান দার্শনিক শোপেনহয়ারের পুস্তকগুলি নীরস ও জটিল হইলেও বেদান্তদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লোকে আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতেছে।”

এই সময়ে স্বামীজি তাঁহার ক্লাসে 'ভক্তিযোগ' শিক্ষা দিতেছিলেন এবং 'জ্ঞানযোগ', সাংখ্য ও বেদান্ত সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে' তাঁহার শেষ বক্তৃতা হয়। ঐ বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মদীয় আচার্য্যদেব'। তাঁহার গুরুদেব সম্বন্ধে এইটি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান বক্তৃতা এবং ইহাতে তাঁহার বাগ্মিতা ও বর্ণনাচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে ঐ তারিখেই ভারতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের বাৎসরিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

ইতোমধ্যে ২০শে তারিখে (বৃহস্পতিবার) কয়েকজন যুবক ও যুবতী স্বামীজির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার

অর্থাৎ ১৩ই তারিখে ডাঃ স্ট্রিট স্বামীজির নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'যোগানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দীক্ষাগ্রহণ-ব্যাপার স্বামীজির অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের সম্মুখে সম্পন্ন হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে যে তিন জন উচ্চশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোক ভোগ-সুখমগ্ন পাশ্চাত্ত্য দেশে সকল ঐহিক বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য পণ করিয়া স্বামীজির পন্থানুসরণ করিলেন, ইহাতেই ওদেশে তাঁহার প্রভাব দিন দিন কিরূপ বদ্ধমূল হইতেছিল তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। সংবাদপত্রসমূহ এই ঘটনাকে 'তাঁহার সাধুতার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইহাতে তাঁহার কার্য্যেরও প্রসারতা খুব বাড়িল। লোকে দেখিল, সত্যই তাঁহার ক্ষমতা অদ্ভুত এবং বাস্তবিকই তিনি একজন সদ্‌গুরু ও আচার্য্য।

যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার অনুরাগী ভক্তমাত্র ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এক্ষণে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন কি আমেরিকার লোকেরা তাঁহাদের 'বিশ্বকোষ' বা Encyclopædiaতে তাঁহাকে একজন আমেরিকান বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাঁহার জীবনী পর্য্যন্ত লিখিতে উদ্যত হইলেন। এসম্বন্ধে স্বামী কৃপানন্দ রহস্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"... আর এক কথা। ভারতবর্ষ এখনই যেন স্বামীজির উপর তাহার স্বত্বদখল সাব্যস্ত করে। কারণ, মার্কিনদেশের জাতীয় 'বিশ্বকোষ' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে তাঁহার জীবনী লিখিত হইবে, এবং তাহা হইলে তো তিনি আমেরিকার লোক হইয়া যাইবেন। মহামতি হোমারের জন্মস্থান লইয়া যেমন প্রাচীনকালে সাতটি নগরী বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আমার মনে হয় ইঁহাকে লইয়াও আবার তদ্রূপ ঘটিবে। হয়তো ইহার পর সাতটি বিভিন্ন দেশের প্রত্যেকেই এই বলিয়া দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে যে, 'আমিই এই

সুসন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছি।' ফলে এই উজ্জ্বলরত্নের প্রসবিনী বলিয়া ভারতমাতা যে সম্মানের অধিকারিণী তাহা হইতেও তিনি বঞ্চিতা হইবেন।"

'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'ও লিখিয়াছিলেন—

"বহু গণ্যমান্য লোক যে স্বামীজির মতাবলম্বন করিতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক ধর্ম্মযাজক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। 'ডিক্‌সন্ সোসাইটি'তে বক্তৃতা দিবার জন্য ডাক্তার রাইট্ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্বামীজির ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন এ নগরে সুপরিচিত, যথা—এলা হুইলার উইলকক্‌স্, মিঃ ও মিসেস্ ফ্রান্সিস্ লেগেট্, ম্যাডাম এণ্টয়নেট্ ষ্টার্লিং, ডাঃ এলেন ডে, মিস্ এম্মা থার্সবি এবং প্রফেসর ওয়াইম্যান। মিসেস্ ওলী বুলও তাঁহার একজন ছাত্রী। 'হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের দর্শনালোচনা-সমিতি'তে বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজি এইমাত্র মিঃ জন. পি. ফক্‌স্-এর নিকট হইতে এক আমন্ত্রণ-পত্র পাইলেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া স্বামীজি এখানে সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার দিন দুইবার করিয়া বক্তৃতা দেন।"

মিসেস্ এলা হুইলার উইলকক্স আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং জগতের প্রতিভাশালিনী রমণীসমাজের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। তিনি স্বামীজি সম্বন্ধে ১৯০৭ সালের ২৬শে তারিখে 'নিউইয়র্ক আমেরিকান' নামক পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে পাঠকদিগকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যাকালে শুনিলাম যে, বিবেকানন্দ নামে এক ভারতীয় দার্শনিক বক্তৃতা দিবেন। কৌতূহলবশতঃ আমি ও আমার স্বামী উহা শুনিতে গেলাম। দশ মিনিট শুনিতে না শুনিতে বোধ হইল যেন আমাদের মন এক অভিনব সূক্ষ্ম ভাব-ভূমিতে আরোহণ করিতেছে। বক্তৃতার শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

"দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার উপযোগী নূতন সাহস, নূতন আশা, নূতন বল ও বিশ্বাস লইয়া গৃহে ফিরিলাম। আমার স্বামী বলিলেন, 'এতদিন যাহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম আজ সেই তত্ত্ব, ঈশ্বরের সেই ভাব, ধর্ম্মের সেই কথা শুনিলাম!' সেইদিন হইতে সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য, এবং দুর্লভ সত্যরত্ন, নব আশা ও শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য আমার স্বামী আমার সঙ্গে কয়েক মাস ধরিয়া মহাত্মা বিবেকানন্দের নিকট যাতায়াত করিলেন। সেবার বড় দুর্ব্বৎসর। কত শত ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া গেল, কত কলকারখানার লাভালাভ হাওয়ায় উড়িয়া গেল, কত ব্যবসায়ী সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথে বসিল—যেন মহাপ্রলয় সমুপস্থিত! মনঃকষ্টে ও দুর্ভাবনায় রাত্রিতে নিদ্রা না আসিলে কতদিন আমার পতি স্বামীজির উপদেশ শুনিতে গিয়াছেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় দারুণ শীতে, অন্ধকারময় পথে তিনি হাসিয়া বলিতেন, 'হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। কিসের জন্য দুঃখ করি?' আমিও আত্মোন্নতির সঙ্গে প্রসারিতদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দমনে কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম এবং আমোদপ্রমোদে যোগ দিতাম।

"যদি কোন দর্শনশাস্ত্র, কোনও ধর্ম্ম এরূপ ঘোর দুর্দ্দিনে মানবের এমন উপকার করিতে পারে—শুধু তাহাই নহে, যদি সেই ধর্ম্ম মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রীতি ও বিশ্বপ্রেম বর্দ্ধিত করিয়া পরজীবনের আলোচনায় মানুষকে আনন্দ প্রদান করিতে পারে, তবে সে ধর্ম্ম কত মহৎ ও সত্য!

"ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মাহাত্ম্য আমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক, এবং প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান-সহায়ে আমাদের মতগুলি উদার ও উন্নত করা কর্ত্তব্য। ... বিবেকানন্দ এক নূতন বার্ত্তা লইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদিগকে কোন নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আসি নাই। তোমরা স্ব স্ব ধর্ম্মেই থাক—তবে যে মেথডিষ্ট্ সম্প্রদায়ভুক্ত

তাহাকে আরও ভাল মেথডিষ্ট্ হইতে বলি, যে প্রেসবিটিরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাকে আরও ভাল প্রেসবিটিরিয়ান হইতে বলি এবং যে ইউনিটেরিয়ান তাহাকে আরও নিষ্ঠাবান্ ইউনিটেরিয়ান হইতে বলি। আমি চাই তোমরা সত্য উপলব্ধি কর এবং তোমাদের হৃদয়মন্দিরে জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হউক।"

এই রমণীকুল-শিরোমণি কেবল স্বামীজির দর্শনলাভ করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, তিনি স্বামীজি-প্রদর্শিত ধর্ম্মও ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিয়াছেন—"তাঁহার অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া কর্ম্মবদ্ধ সংসারী জীবের প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয়, চঞ্চলা রমণী স্থিরভাবে চিন্তা করিতে শিখে, কলাবিদ্যাবিদের মনে নূতন আশা ও উদ্যমের উন্মেষ হয় এবং পিতামাতা, পতিপত্নী সকলেই স্বীয় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

বাস্তবিক অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং নিউইয়র্ক সমাজের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্রগণ এসময়ে স্বামীজির গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা সাধারণ স্থানে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতেন এবং ফিরিবার সময় নূতন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি লইয়া ফিরিতেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বামীজি নিজে তাঁহার ভারতীয় বন্ধুদিগকে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমি আমেরিকান সভ্যতার মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছি।" কথাটি একটুও অতিরঞ্জিত নহে। ঐ সময়কার মার্কিন সংবাদপত্রাদি হইতে আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকার সহস্র সহস্র লোক তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়াছিল এবং শুধু তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রকাশ্যে আপনাদিগকে বেদান্তবাদী ও স্বামীজির শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। এইরূপে স্বামীজি যে উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হইল। আমেরিকার সাধারণ নরনারীর মধ্যে বেদান্তের ভাব শতধারে উৎসারিত

হইয়া পড়িল। ইতোমধ্যে 'রাজযোগ', 'কর্ম্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে তিনি ক্লাসে ছাত্রদিগের নিকট যেসব বক্তৃতা ও উপদেশ দিতেছিলেন তাহা গুড্‌উইন সাহেবের চেষ্টা ও পরিশ্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার উপযোগিভাবে ছাপাখানায় পাঠান হইল। এই প্রকারে নিউইয়র্কের কার্য্য শেষ হইলে স্বামীজি ডেট্রয়েটের অধিবাসীদিগের আহ্বানে দুই সপ্তাহের জন্য বক্তৃতা ও ক্লাস করিতে ডেট্রয়েটে গেলেন। এখানকার কার্য্য সম্বন্ধে মিসেস ফাঙ্কে লিখিয়াছেন—

"উক্ত সময়ে তিনি দুই সপ্তাহের জন্য ডেট্রয়েটে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সাঙ্কেতিকলেখক বিশ্বস্ত গুড্‌উইন। তাঁহারা 'রিশিলু'তে কয়েকখানি ঘর ভাড়া লইয়া ছিলেন। রিশিলু একটি ক্ষুদ্র 'ফ্যামিলি-হোটেল'—তথায় একাধিক লোক সপরিবারে বাস করিত। তত্রত্য বৃহৎ বৈঠকখানাটিকে তিনি ক্লাসের অধিবেশন ও বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করিতে পাইতেন। কিন্তু উহা এত বড় ছিল না যে উহাতে সেই বিপুল জনসঙ্ঘের সকলের স্থানসঙ্কুলান হয়, সুতরাং অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। বৈঠকখানা, দরদালান, সিঁড়ি এবং পুস্তকাগারে সত্য সত্যই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুর স্থান ছিল না—ভগবৎপ্রেমই তাঁহার ক্ষুধা, ভগবৎপ্রেমই তাঁহার তৃষ্ণা। তিনি যেন ঈশ্বরের ভাবে উন্মাদের ন্যায় হইয়াছিলেন এবং প্রাণারাধ্য জগজ্জননীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার মত হইয়াছিল।

"ডেট্রয়েটের জনসাধারণকে তিনি শেষ দর্শন দেন বেথেল মন্দিরে। স্বামীজির জনৈক অনুরাগী ভক্ত রব্বাই লুই গ্রসম্যান[১] এই মন্দিরের পূজারী

১ গ্রসম্যান অন্যভাবেও স্বামীজির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম সখ্য ও অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। পাদ্রীরা স্বামীজিকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলে ইনি তাঁহার পক্ষ

ছিল। সেদিন রবিবার, সন্ধ্যাকাল, এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইতেছিল পাছে লোকে বিহ্বল হইয়া কি একটা করিয়া বসে। রাস্তার উপরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত লোকের ভিড় এবং আরও শত শত লোক ফিরিয়া যাইতেছিল। বিবেকানন্দ সেই বৃহৎ শ্রোতৃসঙ্ঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—'পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রতি ভারতের বাণী' এবং 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ'। তাঁহার বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। সে রজনীতে গুরুদেবকে যেমনটি দেখিয়াছি, তেমনটি আর তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ পৃথিবীর নহে। মনে হইতেছিল যেন তাঁহার আত্মাপক্ষী দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই স্পষ্ট বুঝিলাম, তাঁহার দেহাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই; বহুবর্ষের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন, আর অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না।"

১৪।১৫ দিন এখানে অতিশয় কৃতকার্য্যতার সহিত প্রচার করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্যপরিচালনার ভার স্বামী কৃপানন্দের উপর ন্যস্ত করিয়া স্বামীজি বষ্টন যাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে ডেট্রয়েটে অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহার পর আমরা স্বামীজিকে দেখিতে পাই সুবিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক বিভাগের গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দের সমক্ষে। এই ছাত্রসমাজ জগতের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্যতম। ইঁহারা স্বামীজির ভাব ও দার্শনিক মতসমূহ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে মিঃ ফক্স

গ্রহণ করিয়া পাদ্রীদের মিথ্যা দোষারোপের সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং মন্দিরে স্বামীজির পরিচয় দিবার সময় হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মের খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামীজি তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ২৫শে মার্চ্চ তারিখে হার্ভার্ডের ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সমক্ষে 'বেদান্ত দর্শন' সম্বন্ধে এরূপ সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন যে, সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্যে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বক্তৃতার শেষে আরও অনেক প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল। সেদিনকার সেসকল কথাবার্ত্তা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ তাঁহাকে নিজেদের নিকটে রাখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী। চাকরী করিব কি করিয়া ?"

হার্ভার্ডের পণ্ডিতাগ্রণীগণের সমক্ষে দার্শনিক তত্ত্ববিশ্লেষণ ও বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কম সাহসের কর্ম্ম নহে। বস্তুতঃ সেটি স্বামীজির জীবনে একটি বিষম পরীক্ষার দিন বলিলেও হয়। কিন্তু সেই দিন স্বামীজির ব্যাখ্যা-সমূহ এত পরিষ্কার, হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল যে, শ্রোতারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই বক্তৃতা, স্বামীজিকে যেসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তাহার উত্তর ও স্বামীজিকর্তৃক আলোচিত অন্যান্য প্রসঙ্গসমূহের সহিত একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকার ভূমিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি. সি. এভারেট, ডি. ডি. এল. এলডি. মহোদয় যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহার পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, স্বামীজি ওদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে অদ্বৈতভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—

"...চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম্মমতজ্ঞাপনের প্রণালী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে। পরে ঐ

সম্বন্ধে তিনি এ দেশের নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন। বাস্তবিক ধর্ম্মপ্রচারই তাঁহার ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্রই অনেকে তাঁহার সহিত গভীর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সানন্দে শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ ভারতবর্ষ হইতে যেরূপ উৎসুকনেত্রে তাঁহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন ও তাঁহার কৃতকার্যতায় যেরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব প্রীতিকর। একখানি পুস্তিকায় দেখিলাম প্রাচ্যদেশের ভাবসমূহ পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রবেশ করায় কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভা করিয়া তথাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ সন্তোষের অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। তবে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, আমরা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইতেছি উহা সম্পূর্ণ ঠিক না হইলেও, এ কথা নিশ্চিত স্বীকার্য্য যে, বিবেকানন্দের চরিত্র ও আরব্ধ কার্য্য লোকের হৃদয়ে বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বস্তুতঃ পঠনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর মনোরম বোধ হয় আর কিছুই নাই। অনেকের ধারণা আছে, বেদান্তদর্শন একটা অলীক ও অসার কল্পনামাত্র—বাস্তব জগতের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বাস্তবিক যদি এমন কেহ সশরীরে বর্ত্তমান থাকেন, যিনি সত্যসত্যই উক্ত দর্শন-প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন ও অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহা হইলে তাঁহার মুখ হইতে উহা শ্রবণ করিতে করিতে যেরূপ আনন্দ বোধ হয় তাদৃশ আনন্দ জগতে দুর্ল্লভ। বেদান্ততত্ত্বকে স্বপ্নজালসম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা-প্রসূত বলিয়া বিবেচনা করা অনুচিত। হেগেল বলেন, স্পিনোজার মত হইতে প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের আরম্ভ, কিন্তু আমি বলি, ঐ কথা বেদান্তবাদ সম্বন্ধে আরও বেশী খাটে। কারণ, আমরা (পাশ্চাত্ত্যদেশের লোক) 'বহু' লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু যে 'একত্বের' উপর 'বহুত্ব' প্রতিষ্ঠিত, সেই

'একত্ব'-জ্ঞান না হইলে 'বহুত্বে'র উপলব্ধি হইবে কি প্রকারে? ফলতঃ 'এক ছাড়া দুই নাই'—এ সত্য প্রাচ্যদেশই আমাদিগকে শিখাইতে সমর্থ, এবং স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে ঐ শিক্ষা প্রদান করায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ।"

এই সময়ে 'বষ্টন ট্রান্সক্রিপ্ট্' নামক সংবাদপত্রে স্বামীজির হার্ভার্ড ও অন্যান্য স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ ও সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে দেখিতে পাই, স্বামীজি কয় দিবস 'এলেন জিম্ন্যাসিয়ামে' চারিটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেকটিতে চারি-পাঁচ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া কেম্ব্রিজে ওলী বুলের বাটীতে দুইটি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে একটি ও 'বিংশ শতাব্দী সভা'য় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র আরও বলিতেছেন—

"স্বামীজি প্রমাণ করিয়াছেন, ধর্ম্ম শুধু কথার কথা বা কতকগুলি চমৎকার ভাবমাত্র নহে। জীবনের প্রতি কার্য্যে সেই ভাব দেখাইতে পারিলে তবে ধর্ম্মলাভ হয়। বেদান্তধর্ম্মে এ জীবনেই মনুষ্যের এই দেবত্ব-লাভ সম্ভব।"

১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজি বক্তৃতা বন্ধ করিয়া স্থায়িভাবে বেদান্তপ্রচারের জন্য 'নিউইয়র্ক বেদান্তসভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। এই সভা কোন বিশেষ ধর্ম্মমত পোষণ না করিয়া সকল ধর্ম্মের মধ্যেই বেদান্তভাব উপলব্ধি করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে স্বামীজির 'রাজযোগ', 'কর্ম্মযোগ', ও 'ভক্তিযোগ' নামক পুস্তক কয়খানি প্রকাশিত হইল। আমেরিকান পত্রসমূহ পুস্তকগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া নিজ নিজ পত্রে উহাদের সমালোচনা বাহির করিলেন এবং 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শারীরস্থান' ও 'মনস্তত্ত্ব'-বিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিল।

এইরূপে আমেরিকায় বেদান্তের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামীজির শরীর ক্ষয় হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের কাহাকেও আনাইয়া আমেরিকার কার্য্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ও আমেরিকান শিষ্যদিগের মধ্যে দুই-এক জনকে ভারতে বিজ্ঞান, শিল্প, শ্রমসমবায়, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি প্রচারের জন্য পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে থাকিতেই তিনি সারদানন্দ স্বামীকে ওদেশে যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই পর্য্যন্ত তিনি বা আর কেহ স্বামীজির অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

১৮৯৬ সালের বসন্তকালে ইংলণ্ডীয় শিষ্যগণ স্বামীজিকে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিতে লাগিলেন। স্বামীজিরও মনে হইল, এসময়ে আর একবার ইংলণ্ডে গিয়া সেখানকার কার্য্যটি পাকা করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি দেখিলেন, লণ্ডন ও নিউইয়র্ক এই দুইটি নগর পাশ্চাত্ত্য জগতের দুইটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। নিউইয়র্কে তাঁহার কার্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন লণ্ডনে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই তিনি অবকাশ গ্রহণ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি ১৫ই এপ্রিল লণ্ডন যাত্রা করিলেন এবং যাইবার পূর্ব্বে সারদানন্দ স্বামীকে পুনরায় স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন যে, তিনি যেন শীঘ্র লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া ই. টি. ষ্টার্ডি সাহেবের গৃহে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন। ইংলণ্ডযাত্রার পূর্ব্বে তিনি আরও একটি কার্য্য করিলেন। মিস্ এস. ই. ওয়াল্ডো (ইনি পরে ভগিনী হরিদাসী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) ও অন্যান্য কতিপয় শিষ্যকে তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাতে তাঁহারা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন তদ্রূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনি মিস্ ওয়াল্ডোকে রাজযোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট

শিক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং তাঁহাকে রাজযোগ শিক্ষা দিবার অধিকার ও উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। আর স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ ও যোগানন্দ এবং আর কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে বেদান্তশাস্ত্রের ত্রিবিধ মতবাদ উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন ও তিনের মধ্যে যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নাই, তিনটিই আধ্যাত্মিক জীবনগঠনের পর পর সোপান, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়াছিলেন। মিঃ ফ্রান্সিস্ এইচ. লেগেট্‌কে তিনি বেদান্তসভার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচন করিলেন এবং অন্যান্য শিষ্যদিগের উপর অন্যান্য কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। যাঁহারা এসময়ে স্বামীজির কার্য্যবিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উপরোক্ত শিষ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য—মিস্ মেরী ফিলিপস্—ইনি রাজধানীর সর্ব্ববিধ মহিলা-চালিত শিক্ষা ও পরহিতকর অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপিণী ছিলেন, মিসেস্ আর্থার স্মিথ, মিঃ ও মিসেস্ ওয়াল্টার গুডইয়ার এবং সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা মিস্ এম্মা থার্সবি।

আমেরিকায় কার্য্যাবলী

স্বামীজি যদিও অহোরাত্র কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। বিশ্রাম ও অবকাশকালে তিনি একেবারে বালকের ন্যায় অবাধ স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ-স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন। তখন তিনি যে একজন বিশ্ববিখ্যাত লোকশিক্ষক এরূপ ভাবের লেশমাত্র মনে থাকিত না। যখন অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িত, তখন তিনি ঐরূপ চিত্তবিনোদন দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে পুনরায় কাজ করিবার শক্তি ফিরাইয়া আনিতেন। হয়ত 'পঞ্চ' বা ঐরূপ একটা হাস্যরসাত্মক পত্রিকা লইয়া পড়িতে বসিলেন ও আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিলেন। পড়িতে পড়িতে হাসির চোটে যতক্ষণ না চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত ততক্ষণ থামিতেন না। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার মন স্বভাবতঃ গম্ভীর বিষয়ে আসক্ত, কিন্তু অতিরিক্ত গুরুতর চিন্তা অনিষ্টজনক বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন খুঁজিতেন ও কোন একটা লঘু বিষয়ে মনটাকে লাগাইয়া রাখিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহারাও তাঁহাকে বালকের ন্যায় ক্রীড়ারত দেখিলে আন্তরিক আনন্দিত হইতেন। তিনি রঙ্গকৌতুকের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। ঐরূপ গল্প একবার শুনিলে কিছুতেই ভুলিতেন না এবং সুযোগমত অনুস্থানে উহার প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যেরা এইরূপ কতকগুলি গল্পের বিষয় বলিয়া থাকেন। ১৮৯৪ সালের আগষ্ট মাসে স্বামীজি যখন 'এনিসকোয়াম'এ মিসেস্ ব্যাগলীর বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেখানে মিসেস্ ব্যাগলীর একজন মহিলা-বন্ধুও তাঁহার অতিথিরূপে বাস করিতেছিলেন। সেই সূত্রে স্বামীজির

সহিত উক্ত রমণীর বিশেষ জানাশুনা হয় এবং তাঁহার স্বামী স্বামীজির একজন বন্ধু হইয়া উঠেন ও স্বমীজিকে প্রথম শ্লেজ গাড়ীতে চড়াইয়া ভ্রমণ করান। এই স্ত্রীলোকটি ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন—

"স্বামীজির সহিত আমার শীঘ্রই বন্ধুত্ব হইল। তিনি 'এমিস্‌কোয়াম'এ একবার মাত্র বক্তৃতা দিয়াছেন। সে সময়টা গ্রীষ্মাবকাশ। তিনি আমায় প্রায় বলিতেন, 'একটা গল্প বল দেখি।' আমার মনে আছে, একবার আমি এক চীনেম্যানের গল্প বলিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি বড় আমোদ পাইয়াছিলেন। গল্পটি এই—এক চীনেম্যান শূকরমাংস চুরি করার জন্য পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিল। জজ তাহাকে বলিলেন, 'আমি জানিতাম চীনারা শূকর খায় না!' তাহাতে চীনেম্যান বলিল, 'ওঃ আমি এখন মিলিকান লোক—অর্থাৎ আমেরিকান, আমি চুরি করি, শোর খাই—সব করি।' এই গল্প শুনার পর স্বামীজিকে কতবার অনুচ্চস্বরে বলিতে শুনিয়াছি, 'আমি মেলিকান।' অন্যের নিকট এসব জিনিস তুচ্ছ বোধ হইতে পারে, কিন্তু আপনার ন্যায় যাঁহারা স্বামীজিকে জানেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহার সম্বন্ধীয় কোন কথাই তুচ্ছ নহে।

"আমি কানাডার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তিন বৎসর ছিলাম। এই সকল আদিম অধিবাসীদের গল্প শুনিতে স্বামীজি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। আমার মনে আছে, একটি গল্প তাঁহার বড় ভাল লাগিত। একজন আদিম অধিবাসী তাহার পত্নী-বিয়োগ হওয়াতে শবাধারের জন্য কতকগুলি পেরেক চাহিতে আমাদের গৃহে (অর্থাৎ পুরোহিত-বাটী) উপস্থিত হয়। পেরেকের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই সে আমার রাঁধুনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, সে (রাঁধুনী) তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী আছে কি না। রাঁধুনী তো রাগিয়াই খুন! আর বাস্তবিক রাগিবারই কথা। কিন্তু তাহার অসম্মতিপূর্ণ প্রত্যাখ্যানের

উত্তরে আদিম অধিবাসীটি শুধু বলিল, 'আচ্ছা, রোসো।' পর রবিবার দিন দেখি, সে ব্যক্তি আমাদের ফটকে বসিয়া আছে। টুপিতে খুব বড় বড় পালক আঁটিয়াছে এবং এত তেল মাখিয়াছে যে তাহার গণ্ড বাহিয়া গড়াইতেছে। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে স্বামীজির একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত হইতেছিল। আমরা ছবিখানি কতদূর হইয়াছে দেখিবার জন্য ষ্টুডিওতে গিয়া দেখি অঙ্কিত মূর্তিটির গালের কাছে একটুখানি তেল ঝরিয়া পড়িয়াছে। দেখিবামাত্র স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন, 'রাঁধুনীকে বিয়ে কর্ত্তে চলেছে আর কি!' স্বামীজি কি রকম লোক ছিলেন, আপনি ত তাহা জানেন, সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছেন, তাঁহার কি সুন্দর রহস্যজ্ঞান ছিল।"

কিন্তু দুইটি গল্প তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সেই দুইটি তিনি যখনই শুনিতেন হাসিয়া অস্থির হইতেন। একটি হইতেছে এক নূতন খৃষ্টান মিশনরীর গল্প। এক খৃষ্টান পাদ্রী প্রথম এক দ্বীপে গিয়াছেন, সেখানে নরখাদকের বাস। তিনি সে স্থানের প্রধান ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমার আগে যিনি এখানে ছিলেন তাঁহাকে তোমাদের কেমন লাগিত?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "অতি উ-পা-দেয়।" আর একটি হইতেছে আফ্রিকার এক কালা পাদ্রীর গল্প। কালা পাদ্রী সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে— "দেখ, ঈশ্বর—কি বলে—এডামকে—মাটী থেকে তৈরী করলেন। তারপর —তাকে—কি বলে—একটা বেড়ার গায়ে—শুকুতে দিলেন। তারপর—" এমন সময়ে শ্রোতাদিগের মধ্য হইতে একজন জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল—"থামো গো কথক ঠাকুর, থামো—ও বেড়াটার ব্যাপার কি? ওটাকে কে তৈরী করলে?" প্রচারক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখ বাপু সাম জোন্স, একটু মন দিয়া শোন—ওরকম—কি বলে—বিশ্রী প্রশ্ন—ফট্

করে জিজ্ঞাসা করো না—তা হ'লে বলে দিচ্ছি—সব ধর্ম্মতত্ত্ব—কি বলে—একদম মাটি হয়ে যাবে—বলে দিচ্ছি হাঁ!"

স্বামীজির অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার বিশ্রাম ও চিত্তরঞ্জনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া স্ব স্ব গৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন। সেখানে তাঁহাকে যথেচ্ছভাবে আরাম উপভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া হইত। তিনি যদি গল্প করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা একান্তভাবে তাঁহার কথা শুনিতেন। যদি তিনি গান গাহিতে ইচ্ছা করিতেন, অনায়াসে এদেশীয় গান গাহিতে পারিতেন। যদি তাঁহারা দেখিতেন, স্বামীজি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বৃথা না বকাইয়া ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইতেন। তিনি তাঁহাদের অনেককে আদরের নামে ডাকিতেন। মিঃ ও মিসেস্ হেল্‌কে বলিতেন 'ফাদার পোপ' ও 'মাদার চার্চ্চ', কাহাকেও বলিতেন 'যুম্', কাহাকেও 'জোজো'। এইরূপ যদি তাঁহারা কোন নূতন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীজিকে আহার করিতে বলিতেন, অনেক সময় তিনি কাঁটা-চামচের পরিবর্ত্তে শুধু হাতে খাইবার ইচ্ছায় তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিতেন ও তাঁহারা ঐরূপ চাহনির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, হাতে করিয়া খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে—ও রকম করে খেলে বেশী তৃপ্তি হয়। প্রথম প্রথম ওদেশের লোকেরা তাঁহাকে শুধু হাতে খাইতে দেখিলে যেন স্তম্ভিত হইয়া যাইত—কারণ ওদেশে কাঁটা-চামচ ব্যবহার না করা ঘোর অসভ্যতার চিহ্ন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে এত ভালবাসিত ও তাঁহার কার্য্যের প্রতি তাহাদের এতদূর সহানুভূতি ছিল যে, শেষে তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না, বরং উহাতে তিনি স্বচ্ছন্দতা বোধ করিবেন ভাবিয়া আরও আনন্দিত হইত। একান্তে অবস্থানকালে তিনি কলার, বুট ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিয়া চটি পায়ে দিয়া বসিয়া থাকিতেন। এই

জিনিসগুলি তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তি উৎপাদন করিত ; বিশেষতঃ হাতের কাফ্‌গুলি তাঁহার দুচক্ষের বালাই ছিল। সন্ন্যাসীর অত নিয়মকানুন ও সভ্যতার কায়দা ভাল লাগিবে কেন? তাহার উপর টাকাকড়ি। টাকাকড়ির প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার খরচ-পত্রের জন্য কিছু দিলে তিনি উহা লইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেন না, আর ঝঞ্ঝাটের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। সে জন্য হয় সেগুলি তৎক্ষণাৎ গরীব দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত লোকদের বিলাইয়া দিতেন, না হয় শিষ্য ও বন্ধুমণ্ডলীর জন্য উপঢৌকনাদি ক্রয় করিতে খরচ করিয়া ফেলিতেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে কার্য্য শেষ হইলে শিষ্যদের প্রদত্ত একটা মোটা টাকা তিনি এইরূপে খরচ করিয়াছিলেন।

স্বামীজি অপরের ইচ্ছানুসরে চলিতে মোটেই পারিতেন না। সর্ব্ব বিষয়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতেন। জনৈক ধনবতী মহিলা তাঁহার কাজকর্ম্মের বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিজের অভিপ্রায় মত পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেন ; কিন্তু উহাতে সফলকাম হইতেন না। সে স্ত্রীলোকটির মধ্যে বেশ একটু 'হামবড়া' ভাব ছিল! তিনি সকলেরই উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু স্বামীজির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। শেষ মুহূর্ত্তে স্বামীজি যখন তাঁহার সব মতলব ফাঁসাইয়া দিতেন, তখন স্ত্রীলোকটি প্রথমতঃ খুব চটিয়া যাইতেন বটে, কিন্তু পরে মেজাজ ঠাণ্ডা হইলে হাসিয়া বলিতেন—"শেষ মুহূর্ত্তে উনি আমার সব মতলব উল্টে ফেলে দিয়ে নিজের খুশীমত কাজ করেন। ঠিক যেন চীনে বাসনের দোকানে পাগ্‌লা ষাঁড় ছেড়ে দেওয়া!"

অন্য লোকের উপকারার্থ স্বামীজি সব করিতে রাজী ছিলেন এবং যতদূর সম্ভব অপরের মতানুসারে চলিতে পারিতেন। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তিনি কাহারও বাধ্য হইতেন না। কাহারও কাহারও সহিত

ব্যবহারে তিনি বিরক্তি সত্ত্বেও অত্যন্ত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতেন ; কারণ বুঝিতেন যে তাঁহার কার্য্যসাধনের জন্য ঐসব লোক ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছেন। অপর কতকগুলি লোককে তিনি কিছুতেই আমল দিতেন না।

ডেট্রয়েট শহরের একজন শিষ্য তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি করিয়াছিলেন। একবার স্বামীজি তাঁহার কোন ভক্তের বাটীতে গিয়া কোন ভারতীয় ভোজ্যবস্তু পাক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মতি দিলে তিনি পকেট হইতে কতকগুলি মসলার মোড়ক বাহির করিলেন। ঐগুলি ভারতবর্ষ হইতে তাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন ঐ মোড়ক লইয়া যাইতেন। এক সময়ে তাঁহার জিনিসপত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিস ছিল মান্দ্রাজ হইতে কোন ভদ্রলোকপ্রেরিত এক বোতল চাটনি। তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যেরা তাঁহাকে নিজেদের রন্ধনশালায় রাঁধিতে দিতে পাইলে ভারী খুশী হইত। তাহারা নিজেরাও তাঁহাকে সাহায্য করিত এবং নানাপ্রকার নূতন রন্ধনের পরীক্ষা করিতে করিতে সময়টা খুব স্ফূর্ত্তিতে কাটিয়া যাইত। তিনি তরকারিতে এত ঝাল দিতেন যে, আর কেহ সহজে খাইতে পারিত না। তিনি নিজে ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়া যে বেশী দিতেন তাহা নহে, অনেক সময়ে দেখিতেন, ওদেশের জিহ্বায় কতট ঝালমসলা সহ্য হইতে পারে। তিনি বলিতেন যে, ঐসব ঝালমসলা তাঁহার লিভারের পক্ষে ভাল। বস্তুতঃ কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। তবে তাঁহার মুখে ভাল লাগিত বলিয়া তিনি ঝাল দিবার লোভসংবরণ করিতে পারিতেন না। সময়ে সময়ে রাঁধিতে খুব দেরী হইয়া যাইত, তখন শিষ্যদের হয়ত ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি অনেক সময়ে কৌতুক দেখিবার জন্যও ঐরূপ করিতেন, কারণ অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে তাহারা কটু তীক্ষ্ণ কিছুই গ্রাহ্য করিত না।

শীতের সময় অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া অতীত জীবনের চিত্রগুলি স্মরণ করিতে বা কোন সাময়িক পত্র পড়িতে তিনি যেরূপ ভালবাসিতেন আর কিছুই সেরূপ নহে। হাস্যরসাত্মক পত্রিকা পাইলে মলাট শুদ্ধ পড়িয়া ফেলিতেন, কিন্তু দৈনিক পত্রের মধ্যে সাধারণতঃ হেডিং-গুলিরই উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেন। উহাই ছিল তাঁহার বিশ্রাম। কিন্তু ঐ সময়েও যদি কেহ কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিত, অমনি তাঁহার হাস্যস্রোত বন্ধ হইয়া যাইত, মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিতেন এবং অতিশয় ধীরভাবে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। অনেকে সেই জন্য মনে করিত, যেন তাঁহার ভিতর দুটি পৃথক্ লোক রহিয়াছে। বাস্তবিক তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন শত ক্রীড়াচাপল্যের মধ্যেও তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আর একটি উচ্চতর ভাবের ধারা সর্ব্বদা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

আমেরিকার কার্য্য শেষ হইলে তিনি সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কারণ যদিও তাঁহার মস্তিষ্ক বরাবর পরিষ্কার ছিল, তথাপি অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী বিকল হইয়া গিয়াছিল। একদিন ট্রেনে যাতায়াত করিলে সাত দিন পর্য্যন্ত যেন তাঁহার মাথায় ট্রেনের ঘর্ঘর-শব্দ বাজিতে থাকিত। বন্ধুবর্গ সকলেই আশঙ্কা করিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য চিরকালের মত ভাঙ্গিতে বসিয়াছে।

তাঁহার নিজের অদ্ভুত প্রকৃতি ও উপদেশ অপরের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিত, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন। শুধু এক জনের উক্তি হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেই যথেষ্ট হইবে—"তাঁহার চিন্তা ও যুক্তিতর্কসমূহ এরূপ গভীর ছিল এবং মনোমধ্যে এরূপ প্রবল আন্দোলন উত্থাপিত করিত যে, শ্রোতাদিগের অনেকে শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, বুঝিতে পারিতেন তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে

উহাই যথেষ্ট হইয়াছে।" এই ব্যক্তি আরও বলেন, "আমি এক জনকে জানি—যিনি স্বামীজির সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ায় স্নায়ুতে এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে তাহার ফলে তিন দিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।"

আমেরিকায় কার্য্যকালে স্বামীজির মনে বিভিন্ন সময়ে নানারূপ শুভ সঙ্কল্প উঠিয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে সেগুলি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দুই-একটির বিষয় এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রথম হইতেই তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল যে, একবার ওদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই 'বিশ্ব-মন্দির' (Temple Universal) নামে একটি উপাসনালয় স্থাপন করিবেন—যেখানে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোক সকল দ্বন্দ্ব, কলহ, ঈর্ষ্যা ও মতদ্বৈধ ত্যাগ করিয়া এক ওঙ্কারের অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা করিবে। কিন্তু বেদান্তপ্রচারকার্য্যে লিপ্ত হইয়া তিনি আর এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার আর একটি সঙ্কল্প ছিল, ক্যাট্‌স্‌কিল পাহাড়ের উপর একশত আট একর জমি খরিদ করিয়া তাঁহার শিষ্যদের সাধন-ভজনের জন্য কতকগুলি কুটীর নির্ম্মাণ করিবেন। ইহার সমুদয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কারণ ক্ষমতাসত্ত্বে অপরের নিকট সাহায্যগ্রহণ তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল। অনেক সময়ে অনেক ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে চাহিতেন, কিন্তু তিনি ধন্যবাদের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেন, "যাহাদের অভাব ও প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহাদিগকে যেন ঐসব অর্থ দেওয়া হয়।"

নীচশ্রেণীর খৃষ্টান পাদ্রীদের ঈর্ষ্যাবিদ্বেষপ্রণোদিত তীব্র আক্রমণের কথা পুনঃ পুনঃ অবতারণা করা যদিও অত্যন্ত অপ্রীতিকর, তথাপি এখানে আর একবার তাহাদিগের প্রচারিত একটি কদর্য্য কুৎসার বিষয় উল্লেখ করিতে

বাধ্য হইতেছি। কারণ, তাহা না করিলে জীবনীলেখকের গুরুতর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। স্বামীজির প্রচারের ফলে ওদেশে ভারতবর্ষীয় মিশনরী ফণ্ডের চাঁদা এক বৎসরে দেড় কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে মিশনরীরা ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে জব্দ ও সকলের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার মানসে একটা মিথ্যা জনরব প্রচার করে যে, "বিবেকানন্দের অসংযত আচরণের জন্য মিচিগানের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার পত্নী মিসেস্ ব্যাগ্‌লী একটি দাসীকে কর্ম্মচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" সৌভাগ্যক্রমে উক্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লিখিত তিন তিন খানি পত্র এখনও বিদ্যমান আছে, যাহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারি যে, ঐ জনরব সর্ব্বৈব মিথ্যা।

১৮৯৪ সালের ২২শে জুন মিসেস্ ব্যাগ্‌লী এনিসকোয়াম, ম্যাসাচুসেটস্ হইতে তাঁহার এক মহিলা বন্ধুকে লিখিতেছেন—

"তুমি আমার প্রিয় বন্ধু বিবেকানন্দের কথা লিখিয়াছ। তাঁহার চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে আমি বড় খুশী হই, কারণ তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কেহ যে কোন কথা বলিবে তাহা আমার অসহ্য। আমেরিকায় তিনি জীবনের যেসকল উচ্চাদর্শ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। এই প্রাচীন ডেট্রয়েট শহরে বিস্তর গোঁড়া লোকের বাস। এখানকার প্রত্যেক সভা-সমিতিতে তাঁহার মত সম্মান কেহ কখনও পায় নাই। সুতরাং আমি বেশ বুঝিতে পারি যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যাহারা একটি কথা বলে, তাহারা শুধু তাঁহার মহত্ত্ব ও দিব্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃই ঐরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা কেন ঐরূপ করে? তাঁহার প্রতি এরূপ করিবার ত কোন সঙ্গত কারণ নাই। তিনি আমাদের (খৃষ্টানদের) নিকট সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ। ... তাঁহার সহায়তায়

আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মহৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার সমকক্ষ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তি আর কেহ আছেন কিনা জানি না, সুতরাং তাঁহাকে অসংযত বলা কতদূর অন্যায় ও মিথ্যা! যাঁহারা প্রতিদিন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাগ্রহে তাঁহার অতুলনীয় চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করেন, বিশেষতঃ ডেট্রয়েট শহরের লোকেরা—যাহারা সাধারণতঃ অপরের সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করে ও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। ... তিনি প্রায় মাসাবধি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার পুত্র ও জামাতাগণ এবং আমার পরিবারস্থ সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন, স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপ ভদ্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন, তাঁহার ব্যবহার কত সুন্দর ও তাঁহার সঙ্গ কত মধুর। তিনি আমাদের গৃহের চিরবাঞ্ছিত অতিথি। তাঁহার দর্শনলাভের জন্য আমি তাঁহাকে আমাদের এমিসকোয়ামের গ্রীষ্মাবাসে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। এই গৃহে তিনি চিরদিন আদর ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে আমার রাগ অপেক্ষা দুঃখই অধিক হয়, কারণ লোকে না জানিয়া শুনিয়া যাহা-তাহা বলে। তিনি চিকাগো শহরে যতদিন ছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ সময়ই মিষ্টার ও মিসেস্ হেলের বাটীতে যাপন করিয়াছেন—সেটা যেন তাঁহার নিজেরই বাটী। তাঁহারা প্রথমে অতিথির মত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। তাঁহারা প্রেস্বিটিরিয়ান মতের লোক, আর খুব শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত—তাঁহারাও বিবেকানন্দকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করেন ও ভালবাসেন। বাস্তবিক বিবেকানন্দ একজন মহান্ ও শক্তিশালী পুরুষ, সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিভোর, এবং শিশুর ন্যায় সরল ও নির্ভরশীল। আমি ডেট্রয়েটে একদিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাকে

অভ্যর্থনা করিয়া আনি, সেই সঙ্গে অনেক পুরুষ ও মহিলাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার এক পক্ষকাল পরে তিনি আমাদের বৈঠকখানা ঘরে 'প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ ও তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা ধরিয়া এক বক্তৃতা করেন। সেই সভায় ব্যবহারজীবী, বিচারক, ধর্ম্মযাজক, সামরিক কর্ম্মচারী, চিকিৎসক এবং অনেক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, তাঁহাদের পত্নী ও কন্যাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শেষ পর্য্যন্ত অতীব আগ্রহসহকারে ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বিবেকানন্দ যেখানেই কিছু বলিতেন, সেইখানেই সকলে তাঁহার কথা শুনিয়া সানন্দে বলিয়াছেন যে, 'আমরা আজ পর্য্যন্ত কোন লোকের মুখে এমন কথা শুনি নাই।' তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন না, অথচ সকলকেই উন্নত করিবার চেষ্টা করেন—লোকে দেখে মানুষের-তৈরী ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক মতামত অপেক্ষা আরও একটি বড় জিনিস আছে, এবং তাঁহার মত ও নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য অনুভব করে। তাঁহার সঙ্গে একত্রে একস্থানে বাস করিলে ও তাঁহার যথাযথ পরিচয় পাইলে উন্নত না হইয়া থাকা যায় না। আমি চাই—আমেরিকার প্রত্যেক লোক তাঁহাকে জানুক এবং ভারতে যদি এরূপ লোক আরও থাকেন তবে তাঁহারা এ দেশে আসুন।"

১৮৯৫ সালের ২০শে মার্চ্চ তিনি আবার লিখিয়াছেন—"আমার সর্ব্বপ্রথম কথা এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেসকল কথা রটিয়াছে তাহা আদ্যোপান্ত সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহা অপেক্ষা মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। তিনি যে দেড় মাস আমাদিগের নিকট ছিলেন তাহার প্রত্যেক দিনটি মহানন্দে কাটিয়াছে। ডেট্রয়েটে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সভা-সমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার সম্মানের জন্য ভোজ দেওয়া হইয়াছিল—উদ্দেশ্য যে আরও অধিক লোকে

তাঁহাকে দেখুক, তাঁহার সহিত আলাপ করুক এবং তাঁহার কথা শোনুক। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার যোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা কেহই তাঁহার সাধুতা, নির্ম্মল চরিত্র ও ধর্ম্মভাবের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমি বিগত গ্রীষ্মকালে পুনরায় আমাদের এমিস্‌কোয়ামের বাটীতে আসিবার জন্য তাঁহাকে লিখি। তিনি তখন বষ্টনে ছিলেন, সেখান হইতে আমাদের আহ্বান সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাদের নিকট আসিয়া তিন সপ্তাহ যাপন করেন। তাহাতে কেবল আমিই যে কৃতার্থ হইয়াছিলাম তাহা নহে, আমার প্রতিবেশিগণও অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। আমার গৃহের ভৃত্যেরা সকলেই পুরাতন এবং এখনও আমার অধীনে কর্ম্ম করে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন এমিস্‌কোয়ামে গিয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে বাটীতেই ছিল। অতএব দেখিতেই পাইতেছ যে, এসব গল্প সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তুমি ডেট্রয়েট নগরের যে স্ত্রীলোকটীর কথা বলিতেছ, সেটি যে কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু বলিতে পারি, তাহার একটা কথাও সত্য নহে, সবই মিথ্যা। ...আমরা সকলেই বিবেকানন্দকে জানি। কিন্তু যাহারা এত মিথ্যার সৃষ্টি করিতেছে, তাহারা কে?"

উঁহার কন্যা হেলেন ব্যাগ্‌লী এ সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিয়াছেন—"শুনিয়া সুখী হইলাম যে র—কর্ত্তৃক এই গল্প প্রচারিত হয় নাই। যদি সম্ভব হয় একবার শ্রীমতী স—র সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কিসের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল কথা রটান হইতেছে। ইহা লইয়া অবশ্য হৈ চৈ করিব না, তবে একবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এসব আজগুবি কথা কোথা হইতে বাহির হইতেছে। এসকল জিনিস শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে, আর যদি একটার উচ্ছেদ করা যায় তাহা হইলে হয়ত ঐ স্ত্রীলোকগুলি এত তাড়াতাড়ি

ঐরূপ গল্প চাউর করার আগে খানিকক্ষণ ওসম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিবে। তাহারা যদি শুধু একবার একটু খোঁজ করে, তাহা হইলেই তাহাদিগের কথার অসারত্ব বুঝিতে পারিবে।"

স্বামীজি স্বয়ং এসম্বন্ধে ১৮৯৫ সালের ২১শে মার্চ্চ মিসেস্ ওলী বুলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট আছে। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন, "র—র দলের লোকেরা আমার নামে যে-সব কলঙ্ক রটনা কচ্ছে তাতে আমি আশ্চর্য্য হলুম। তার মধ্যে একটা এই যে, আমার মন্দ স্বভাবের জন্য নাকি ডেট্রয়েটের ব্যাগ্‌লী-গৃহিণী তাঁর একটি দাসীকে জবাব দিতে বাধ্য হয়েছেন!!! দেখ্‌ছ মিসেস বুল, লোকে যেমন করেই চলুক না কেন, কতকগুলো লোক আছে, যারা তার বিরুদ্ধে রাশখানেক জঘন্য মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে বার করবেই করবে। চিকাগোয় আমার বিরুদ্ধে রোজ এইরকম করতো। এইসব স্ত্রীলোকেরাই আবার খৃষ্টানি ফলান!"

এই সময়ে স্বামীজি আরও যেসকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল নিন্দনীয় কুৎসাকারীদিগের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা নাকি এমন পর্য্যন্ত বলিয়াছিল, "আমরা বরং চিরজীবন নরকে পচিতে রাজী আছি, তথাপি এই দুর্ব্বৃত্ত (damned) হিঁদুটাকে আমাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না।" স্বামীজি প্রথম প্রথম বুঝিতে পারেন নাই তাহারা কেন তাঁহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছে, সুতরাং অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু তারপর শুনিলেন, ওদেশে ঐসব বর্ণজ্ঞানহীন, নীচাশয় লোকেদের কেহ চেনেও না এবং সমাজে উহাদের কোন প্রতিষ্ঠা বা মর্য্যাদা নাই। উহাদিগকে উচ্চশ্রেণীর উদারচেতা খৃষ্টানেরা নীলনাসিক (blue-nosed), কঠিনাবরণবিশিষ্ট (hard-shelled), কোমলাবরণ-বিশিষ্ট (soft-shelled) প্রভৃতি ঘৃণাসূচক সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া

থাকেন। বাস্তবিক তিনি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন 'অক্সফোর্ড মিশন' প্রভৃতি সুশিক্ষিত, ভদ্র ও দেশের প্রতিষ্ঠাভাজন পাদ্রীসম্প্রদায় এক দিনের জন্যও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ত করেনই নাই, বরং অনেকে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; আবার ইংলণ্ডের বরেণ্য ধর্ম্মযাজকগণ ও খৃষ্টধর্ম্মজগতের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত যতদূর সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা করিয়াছিলেন।

অবশ্য তাঁহার নিজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার চরিত্রকে আক্রমণ করিয়া কেহ তাঁহার কার্য্যের ক্ষতিসাধন বা অন্য কোনরূপ সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে না, কারণ সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবেই, মিথ্যা কখনও চিরদিন তাহাকে ভস্মাবৃত রাখিতে পারিবে না। যিনি জীবনে স্বপ্নেও কখন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইতে এক তিল স্খলিত হন নাই, তাঁহার আবার ভয় কিসের? আর বাস্তবিক তাঁহার অমানুষী পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠার অদ্ভুত প্রভাব সম্বন্ধে প্রমাণ ও সাক্ষ্যস্বরূপ আমেরিকার চতুর্দ্দিক হইতে শত শত পত্র তাঁহার হস্তগত হইত। সুতরাং তিনি শত্রুদিগের চাতুরীতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। একবার কিন্তু তিনি সত্যই বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কতকগুলি লোক পরমহংসদেবের একখানি ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া তাহা মধ্য-পশ্চিম শহরের একখানা বড় সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়াছিল। সেই সঙ্গে তাঁহার আকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া অতি নীচ রকমের কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল এবং সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম্ম ও যোগিগণকে আক্রমণ করিয়া কতকগুলি ছাইভস্ম লিখিয়াছিল। সেদিন তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ওঃ এ যে ঈশ্বরনিন্দা—দারুণ মহাপাতক!"

একদিকে যেমন এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতেছিল, অপর দিকে তেমনি সুখের বিষয়ও যথেষ্ট ছিল। আমেরিকার প্রকৃত জ্ঞানী ও মনস্বী

ব্যক্তিরা স্বামীজিকে বরাবরই সমাদর করিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি, ১৮৯৬ সালে প্রকাশ্যভাবে হার্ভার্ডের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সদস্য ও দর্শনশাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ গ্রাজুয়েট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার অল্প দিন পরেই তাঁহাকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

এই সময়ে মিসেস্ ওলী বুলের গৃহে একদিন আহারের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে হার্ভার্ডের বিশ্ববিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক প্রফেসর উইলিয়ম জেম্‌সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ভোজনান্তে একটি নিভৃত কক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনের আলাপ হইয়াছিল। নিশীথ রজনীতে তাঁহারা কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া উঠিলেন। জেম্‌স সাহেব চলিয়া গেলে ওলী বুল এই দুই মনস্বী ব্যক্তির আলাপের ফল কি হইল জানিবার জন্য স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজি, অধ্যাপক জেম্‌সকে আপনার কেমন বোধ হইল?" তিনি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "বেশ লোক, খাসা লোক।" বলিবার সময় 'বেশ' কথাটার উপর একটু জোর দিলেন। তিনি কি অর্থে ঐ কথাটির ব্যবহার করিয়াছিলেন কে জানে। যাহা হউক, পরদিন তিনি মিসেস্ ওলী বুলের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, "এটা পড়ে দেখ।" মিসেস্ বুল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, প্রফেসর জেম্‌স দুই-চারি দিন পরে স্বামীজিকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। স্বামীজির প্রতি অধ্যাপকের শ্রদ্ধা তাঁহার আরও অনেক লেখায় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কতবার তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত 'বৈদান্তিকশিরোমণি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'দি ভ্যারাইটিজ অব্ রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স' নামক

অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থে অদ্বৈততত্ত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজির কথা লিখিয়াছেন এবং তৎপ্রণীত 'দি এনার্জিস্ অব্ ম্যান'নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বিষয় বলিয়াছেন, যিনি স্নায়বিক পীড়া আরোগ্যের জন্য স্বামীজি-উপদিষ্ট রাজযোগ অভ্যাস করিয়া শুধু দৈহিক ও মানসিক উন্নতি নহে পরন্তু আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন, প্রবন্ধোক্ত এই অধ্যাপক আর কেহ নহেন—স্বয়ং মিঃ জেম্‌স।

স্বামীজি এ সময়ে নিজে ইচ্ছামাত্র পীড়া আরাম করিতে পারিতেন, তবে সচরাচর ঐ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন না। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের বিষয় জানা গিয়াছে, যাঁহার উপর দয়াপরবশ হইয়া তিনি 'হে ফিবার' নামক এক প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে ঐ স্ত্রীলোকটি স্বামীজির একজন শিষ্যকে এ সম্বন্ধে এক-খানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বন্ধুটির বাটীতে বাসকালে আমি জ্বরে পড়িলাম। সে বড় বিষম জ্বর। আমায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার অসুখ সারাইয়া দিব?' আমি বলিলাম, 'তা যদি পারেন তবে বড় সুখের বিষয় হয়।' এই কথা শুনিয়া তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন এবং আমার হাত দুখানি তাঁহার হাতের তালুর উপর রাখিতে বলিলেন। আমি ঐরূপ করিলে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার হাত দুটি শীতল হইয়া আসিল এবং বোধ হইল তিনি যেন কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছেন। কতক্ষণ পরে (অল্প কি অধিক বলিতে পারি না) তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন এবং উঠিয়া দ্রুতগতি গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে আমার জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে।"

এইরূপ আরোগ্য-বিধানের সূক্ষ্ম তত্ত্বটি স্বামীজি ১৮৯৫ সালের

২০শে মে তারিখে তাঁহার এক গুরুভাইকে একখানি পত্রে জানাইয়াছিলেন—

"এবার একটি আশ্চর্য্য বিষয় বলি শোন। যখন তোমাদের কাহারও কোন পীড়া হইবে, তখন সে নিজে বা আর কেহ তার মূর্ত্তিটাকে বেশ করিয়া মনে মনে ধ্যান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে 'সে নীরোগ, তার কোন অসুখ নাই।' দেখিবে সে নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে। যাহার পীড়া হইয়াছে তাহাকে না জানাইয়াও বা সে শত শত ক্রোশ দূরে থাকিলেও এই উপায়ে তাহাকে আরোগ্য করা যায়। কথাটা মনে রেখো।"

স্বামীজি যে কেবল ধর্ম্মতত্ত্ব-পিপাসু লোকদিগের সহিত মিশিতেন তাহা নহে, অন্যান্য বিভাগের অনেক বড় বড় লোকের সহিতও তাঁহার আলাপ ছিল। তাঁহারা সকলেই তাঁহার সাহিত্য বিজ্ঞানাদি বিষয়ক গভীর জ্ঞানদর্শনে চমৎকৃত হইতেন। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার চিকাগো মহাসভায় আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই তিনি বিখ্যাত তড়িৎযন্ত্রোদ্ভাবক প্রফেসর এলাইশা গ্রের 'হাইল্যাণ্ড পার্ক' নামক সুরম্য ভবনে একটি নিরামিষ ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভাটি প্রধানতঃ স্বামীজির সম্বর্দ্ধনার জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানাচার্য্যগণ সমবেত হইয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে তথায় 'ইলেকট্রিক্যাল কংগ্রেস'-এর অধিবেশন উপলক্ষে জগতের চতুর্দ্দিক হইতে বৈজ্ঞানিক বুধমণ্ডলীর সমাগম হয়। স্বামীজি এই দিন যেসকল মহৎ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন তাহার মধ্যে ছিলেন স্যার উইলিয়ম টমসন (যিনি পরে লর্ড কেলভিন নামে বিখ্যাত হন), প্রফেসর হেলম্‌হোলজ্ ও অ্যারিটন হপিট্যালিয়া। বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার তড়িৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন এবং বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনায় তাঁহার চমৎকার উত্তর-প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন;

স্বামীজির যেসকল বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত তিনি আমেরিকায় আরও বিস্তর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেগুলি এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। ১৮৯৩ সালে তিনি চিকাগো শহরে ও তাহার আশেপাশে অন্যান্য স্থানে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন এবং পর বৎসর সমস্ত দেশময় বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। ঐ সালে (১৮৯৪) তিনি কিয়ৎকাল গার্ণসী পরিবারের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারা তাঁহাকে গুরুবৎ মান্য করিতেন এবং তাঁহার জন্য অনেকগুলি ক্লাস ও কথোপকথন-সভার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি ডাঃ লাইম্যান্ এবট্-এর সহিত পরিচিত হন ও 'আউটলুক' পত্রের সম্পাদকদিগের সহিত আহারার্থ নিমন্ত্রিত হন। ১৮৯৫ সালে মিসেস্ বারবার নামক বষ্টনের একজন সমাজ-নেত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি 'বার্বার লেক্চাস' নামে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। নিয়মিত কার্য্য হইতে কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া এমিস্কোয়ামে তিনি দুইবার (১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সালে) মিসেস্ ব্যাগ্লীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তথায় তাঁহাকে একটি সাধারণ বক্তৃতা ও কতকগুলি কথোপকথন-ক্লাস করিতে হইয়াছিল। ১৮৯৫ সালের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার স্বকীয় নিউইয়র্কস্থ বাসভবনে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং তাহার পরের মাসে 'মোট্স্ মেমোরিয়েল বিল্ডিং' নামক স্থানে 'ধর্ম্মবিজ্ঞান ও যোগের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা' নামক দুইটি বক্তৃতা দিয়া তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতার উপসংহার করেন।

তাঁহার বক্তৃতাসমূহ সাধারণতঃ খুব সরস, হৃদয়গ্রাহী, প্রেমব্যঞ্জক ও কবিত্বপূর্ণ হইত, কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি ওদেশের সমাজের দোষ ও ত্রুটি দেখাইয়া তীব্র কশাঘাত করিতেন। তখন আর তাঁহার কোন খেয়াল থাকিত না। ঐসকল কথা সত্য হইলেও লোকের প্রীতিকর হইবে

কিনা ভাবিয়া দেখিতেন না। কারণ কাহারও মুখ চাহিয়া কথা বলা কোনও কালে তাঁহার অভ্যাস ছিল না। একবার তিনি বষ্টনের এক বৃহৎ সভায় 'আমার গুরুদেব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া দেখিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশই বিষয়ী নরনারী—তাহাদিগের মুখে প্রতারণা, নির্ম্মমতা, সৎ বিষয়ের প্রতি সহানুভূতির অভাব ও কপটতার চিহ্ন পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজিত। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, এরূপ হীনবুদ্ধি শ্রোতৃবর্গের নিকট ত্যাগিসম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহনীয় চরিত্র কীর্ত্তন করায় কোন ফল নাই, কারণ তাহাদিগের পক্ষে তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করা অসম্ভব। অমনি তিনি বক্তব্য বিষয় ছাড়িয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বাহ্য-বিষয়-তৃষ্ণা ও হেয় ইন্দ্রিয়-লালসার কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। সে মর্ম্মন্তুদ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া শত শত শ্রোতা রোষভরে সহসা সভা ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাহারা তাঁহার দেশের শিক্ষা ও সভ্যতাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসভ্য বলিয়া বরাবর গালি দিয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক দুর্ব্বলতা ও হীনতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া দেখাইতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্র-সমূহে এই বক্তৃতা লইয়া নানারূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইল। একদল তাঁহার নির্ভীকতা ও অকপটতার খুব সুখ্যাতি করিল, আর একদল তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। শত্রুপক্ষের কেহ কেহ রটাইল, তিনি আমেরিকার রমণীসমাজের উপর আক্রমণ করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামীজির কোন লেখায় বা বক্তৃতায় আমেরিকান রমণীগণের বিরুদ্ধে একটি কথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং প্রশংসার কথা অনেক আছে।

১৮৯৪ সালের শেষভাগে বষ্টনে ওলী বুলের গৃহে অবস্থানকালে তিনি তদনুরোধে কেম্ব্রিজবাসিনী রমণীগণের সমক্ষে 'হিন্দু রমণীর আদর্শ' নামে

একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি স্বদেশানুরাগব্যঞ্জক ও গভীরভাবপূর্ণ। ইহাতে তিনি ভারতীয় নারীজাতির চরিত্রবল ও মাতৃত্বের মহিমময় আদর্শের প্রভূত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, ওদেশে ভারতীয় নারীদিগের হীনাবস্থা সম্বন্ধে যেসকল গল্প প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ কল্পিত ও ভিত্তিহীন। স্বামীজির বক্তৃতাশ্রবণে সভার বিদুষী শ্রোতৃবৃন্দ এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী খৃষ্টমাসের সময় তাঁহার অজ্ঞাতসারে মেরী-অঙ্ক-সুশোভিত বালক খৃষ্টের একটি সুন্দর চিত্রের সহিত নিম্নলিখিত পত্রখানি তাঁহার জননীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন—

"স্বামী বিবেকানন্দের পূজনীয়া জননীর প্রতি

ঠাকুরাণি!

"আজ মেরীপুত্র ভগবান যীশুর জন্মদিন। সেই মহাপুরুষ জগতে যে অমূল্য রত্ন বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজ চতুর্দ্দিকে আনন্দের রোল উঠিতেছে। এই শুভক্ষণে আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, কারণ আপনার পুত্র এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

"কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি এখানে 'ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বলেন যে এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার কল্যাণার্থ তিনি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কেবল আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে। সেদিন যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করেন তাঁহার জননীকে অর্চ্চনা করিলে দিব্যশক্তি ও আত্মোন্নতি লাভ হয়।

"হে পুণ্যচরিতে, আপনার জীবনের কার্য্যসমূহ আপনার সন্তানের চরিত্রে প্রতিফলিত। সেই মহৎকার্য্যের মাহাত্ম্য সম্যক উপলব্ধি করিয়া

আমরা আপনার প্রতি আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করুন। আশা করি এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা-উপহার সকলকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে, জগতে ভ্রাতৃভাব, একপ্রাণতা ও ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অচিরে অবশ্যম্ভাবী।"

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে মিসেস্ ওলী বুল লিখিয়াছেন, "...তিনি বেদ, সংস্কৃতসাহিত্য ও নাটকাদি হইতে এই সকল আদর্শের উদাহরণ উদ্ধৃত করিলেন এবং বর্ত্তমান কালের যেসকল রীতি-পদ্ধতি ভারতীয় নারীজাতির উন্নতির অনুকূল ও সহায়ক, তাহা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বশেষে অতীব শ্রদ্ধাসহকারে স্বীয় জননীর উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। বলিলেন যে, জননীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও পূত চরিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়াতেই তিনি সন্ন্যাসজীবনের অধিকারী হইয়াছেন এবং তিনি জীবনে যে কিছু সৎকার্য্য করিয়াছেন, সমস্তই সেই জননীর কৃপাপ্রভাবে।"

স্বামীজির এই একটা বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যেখানেই যাইতেন, আবশ্যক হইলে, মুক্তকণ্ঠে স্বীয় গর্ভধারিণীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার একজন মহিলা-বন্ধু কয়েক সপ্তাহ তাঁহাদের উভয়েরই পরিচিত এক বন্ধুগৃহে তাঁহার সহিত একত্র যাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "স্বামীজি প্রায় তাঁহার মাতার কথা বলিতেন। আমার মনে আছে, তিনি তাঁহার জননীর অদ্ভুত আত্মসংযমের কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, আর কোন রমণীকে তিনি কখনও তাঁহার মাতার ন্যায় দীর্ঘকাল উপবাস করিতে দেখেন নাই। তিনি নাকি একবার উপর্য্যুপরি চৌদ্দ দিন উপবাস করিয়াছিলেন।"

স্বামীজির ভক্তেরা তাঁহার মুখে কতবার শুনিয়াছেন—"মা-ই আমাকে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর চরিত্র আমার জীবনে ও যাবতীয় কার্য্যে নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছে।"

দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডভ্রমণ

ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, স্বামীজি তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আহ্বান করিতেছিলেন। এই আহ্বানানুসারে তিনি ১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ইংলণ্ডে পৌছিয়া মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডির বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্বামীজি ইংলণ্ডে তাঁহাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন; কারণ গত কয় বৎসরের মধ্যে তিনি গুরুভ্রাতাগণের কাহাকেও দেখেন নাই। এক্ষণে সারদানন্দ স্বামীর নিকট আলমবাজার মঠের কথা, অন্যান্য গুরুভ্রাতাদিগের কথা ও ভারতবর্ষের আরও অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে অনেক প্রথিতনামা ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নশীল পণ্ডিত প্রত্যহ স্বামীজিকে দেখিতে আসিতেন এবং তিনি তাঁহাদিগের সহিত ভারতীয় দর্শন, বর্ত্তমান জগতের সহিত উহার সম্বন্ধ ও নানাবিধ যোগপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। ক্রমে এখানে অনেক লোক আসিতে লাগিল এবং এই নবালোক-সাহায্যে মনুষ্য-জীবনের সমস্যা-পূরণ-সম্বন্ধে নূতনতর চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল।

মে মাসের প্রথমে স্বামীজি রীতিমত ক্লাস খুলিয়া 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আত্মভাবে অনুপ্রাণিত উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানের অসাধারণ গভীরতা স্বীকার করিল, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্র তাহাদিগের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবের উন্মেষ করিয়া দিল।

মে মাসের শেষে তিনি পিকাডিলি নামক স্থানে 'রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অব্‌ পেণ্টার্স ইন্‌ ওয়াটার কালার্স'-এর একটি গ্যালারীতে রবিবাসরীয় উপদেশের ব্যবস্থা করিলেন এবং 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা', 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম' এবং 'মনুষ্যের প্রকৃত ও আভাসিক স্বরূপ' বা 'বাহিরের মানুষ ও ভিতরের মানুষ' এই তিনটি বক্তৃতা দিলেন। জুন মাসের শেষ হইতে জুলাই-এর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে প্রিন্সেস হল নামক স্থানে 'ভক্তিযোগ', 'ত্যাগ' এবং 'অপরোক্ষানুভূতি' নামক তিনটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি ক্লাস ও প্রতি শুক্রবারে একটি প্রশ্নোত্তর-ক্লাস খুলিয়া উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। 'জ্ঞানযোগ' ব্যতীত স্বামীজি 'রাজযোগ' ও পরে 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধেও অনেক উপদেশ দেন। এই বক্তৃতাগুলি গুডউইন সাহেব কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক লোক তাঁহার আবাসস্থানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিতেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তৎসমূহ নিজ নিজ পত্রে প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা চমৎকৃত হইল।

কিন্তু এইখানেই তাঁহার কার্য্য শেষ হইল না। উপরোক্ত কার্য্য ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক কার্য্য ছিল। অনেক সময়ে লোকের বাটীতে ও অনেক সুপ্রসিদ্ধ সভাসমিতিতে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইত। এই সময়ে স্বামীজি শ্রীমতী আনি বেশান্তের আহ্বানে তাঁহার এভেনিউ রোডস্থ ভবনে 'ভক্তি' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন (এই সভায় কর্ণেল অল্‌কট্‌ও উপস্থিত ছিলেন) এবং ১৭ নং হাইড্‌ পার্ক গেটে মিসেস মার্টিনের আবাসে 'আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ধারণা' নামক একটি বক্তৃতা দেন। এই সভায় অনেক আমেরিকান ও প্রচ্ছন্নভাবে রাজ-পরিবারের কেহ কেহ

উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর স্বামীজি মিসেস্ হণ্টের নটিংহিল গেটস্থ ভবনে, উইম্‌বিল্‌ডন্ নামক স্থানে একটি বৃহৎ সভায় এবং ঐরূপ আরও অনেকগুলি বড় বড় সভায় বক্তৃতা দেন। সিসেম ক্লাব নামক মহিলাদিগের একটি ক্লাবে তিনি 'শিক্ষা'নামক একটি বক্তৃতায় ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করিয়া বলেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করা নহে, মানব-চরিত্র গঠন করাই উহার প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য। ক্যানন্ হাউইস্ নামক অ্যাংলিকান্ চার্চ্চের একজন নেতা এই সময় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং তাঁহার সহিত আলাপে বড় প্রীত হন। ইনিও চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় একজন প্রতিনিধি লইয়া গিয়াছিলেন এবং স্বামীজিকে দেখিয়া অবধি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখানে তিনি স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়া এত মুগ্ধ হন যে, স্বয়ং সেণ্ট্ জেমস্ চ্যাপেল-এ তৎসম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দেন। ক্যানন উইলবারফোর্স ও তাঁহাকে মহাসমাদরে নিজ আলয়ে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার সম্মানার্থ অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে আহ্বান করিয়া একটি সভা করেন।

মিঃ এরিক হ্যামণ্ড লিখিয়াছেন—"ক্লাব, সোসাইটি প্রভৃতি তাঁহার নিকট উন্মুক্ত ছিল। শিক্ষার্থিগণ এতদঞ্চলে দলবদ্ধ হইয়া নির্দ্ধারিত অবকাশে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত—তাহারা যতই শ্রবণ করিত ততই তাহাদের শ্রবণাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত।"

এইরূপ একটি সভায় তাঁহার বক্তৃতান্তে জনৈক প্রাচীন পলিতকেশ দার্শনিক পণ্ডিত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি বড় সুন্দর বলিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আপনি নূতন ত কিছু বলেন নাই।" স্বামীজি মধুরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "বন্ধু, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আর কিছুই নহে—সত্য। এই সত্য হিমাদ্রির ন্যায় প্রাচীন, মনুষ্যজাতির ন্যায় প্রাচীন, সৃষ্টির ন্যায় প্রাচীন এবং স্বয়ং

পরমেশ্বরের ন্যায় প্রাচীন। যদি আমি উহা আপনাকে এমন কথায় বলিয়া থাকি, যাহা আপনার মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করিয়া দিতে সমর্থ হইয়া থাকে এবং আপনি সেই চিন্তানুযায়ী জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে কি আমি উহা বলিয়া ভাল করি নাই?" অমনি চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি ও করতালি-নিনাদ শ্রুত হইল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, শ্রোতৃবর্গ তাঁহার কথায় কতদূর আস্থা স্থাপন করিতেন। একজন মহিলা সেই সময়ে ও পরে আরও অনেকবার বলিয়াছিলেন—"আমি সারা জীবন গির্জ্জায় প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সে-সমস্ত এত বৈচিত্র্যহীন ও প্রাণশূন্য যে, আমার নিকট আদৌ তৃপ্তিকর বা ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয় নাই। আমি সেগুলি শুনিতে যাইতাম শুধু আর সকলে যাইত বলিয়া। কিন্তু স্বামীজির উপদেশশ্রবণাবধি আমার ধর্ম্মজীবনে নূতন আলোক-স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন ইহা সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার একটি নূতন আনন্দজনক অর্থ উপলব্ধি হইতেছে। বলিতে কি, আমার পূর্ব্বজীবন যেন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।"

অনতিকাল মধ্যে গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ডস্থিত ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ স্বামীজিকে আপনাদিগের নেতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং ১৮ই জুলাই একটি সামাজিক মিলনসভা করিয়া তাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করিলে তিনি এখানে 'হিন্দুদিগের প্রয়োজন কি?' নামক একটি বক্তৃতা দেন।

এই সময়ে স্বামীজি অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এমন কি, এত কার্য্যের মধ্যেও তিনি ষ্টার্ডি সাহেবের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তৎকৃত 'নারদ-ভক্তিসূত্রে'র ইংরেজী অনুবাদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই পুস্তক স্বামীজিকৃত বিশদ ব্যাখ্যাসহ এই সময়ে প্রকাশিত হইলে সাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হয়।

লণ্ডনে অবস্থানকালে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলরের সহিত স্বামীজির সাক্ষাৎ। ১৮৯৬ সালের ২৮শে মে তারিখে মোক্ষমূলরের বিশেষ আমন্ত্রণে স্বামীজি তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হন। ৺কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের শেষভাগে ধর্ম্মমতের এত পরিবর্ত্তনের কারণ কি অনুসন্ধান করিতে গিয়া মোক্ষমূলর প্রথম পরমহংসদেবের কথা জানিতে পারেন এবং তদবধি তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং তাঁহার জীবনী ও উপদেশাবলীর পক্ষপাতী হন। এক্ষণে স্বামীজি তাঁহাকে বলিলেন, "অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোক রামকৃষ্ণদেবের পূজা করিতেছে।" অধ্যাপক উত্তর দিলেন, "ইঁহার মত লোককে যদি পূজা না করিবে ত কাহাকে আর করিবে?" পণ্ডিত মোক্ষমূলর মহা বেদান্তী ছিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামীজিকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অক্স-ফোর্ডের অনেক কলেজ ও বডলীয়ান লাইব্রেরী দেখাইয়াছিলেন এবং বিদায়কালে রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইহার কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যের সহিত ত আর প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় না।" পাঠকগণ স্বামীজির লিখিত 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজে প্রকাশিত ৬ই জুন (১৮৯৬) তারিখের পত্র পাঠ করিলে এই সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ ও মোক্ষমূলর সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে পারিবেন।* উক্ত পত্রখানি 'ঊনবিংশ শতাব্দী' নামক সাময়িক পত্রে মোক্ষমূলর-লিখিত 'একজন প্রকৃত মহাত্মা'শীর্ষক পরমহংসদেববিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরে লিখিত হয়। মোক্ষমূলর স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেন,

---

* উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ' পুস্তিকায় মোক্ষমূলর সম্বন্ধে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রে লিখিত বিবরণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

"আপনারা তাঁহাকে (পরমহংসদেবকে) জগতের নিকট পরিচিত করিবার কি চেষ্টা করিতেছেন ?" তিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বিস্তৃত বিবরণ পাইলে তিনি তাঁহার একখানি বড় জীবনী লিখিতে পারেন। স্বামীজি ইহা শ্রবণ করিয়া সারদানন্দ স্বামীকে পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবন সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উপকরণ সংগ্রহ করিবার ভার প্রদান করেন। এইগুলি অবিলম্বে সংগৃহীত হইয়া মোক্ষমূলরকে দেওয়া হয় এবং তিনি তদবলম্বনে 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশাবলী' নামক একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন।

এই সময়ে স্বামীজির মন নিরন্তর আধ্যাত্মিকভাবে বিভোর থাকিত। তিনি ৬ই জুনের পত্রে আমেরিকায় লেগেট সাহেবকে লিখিয়াছিলেন—"তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বোপরি সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, উদ্ধতস্বভাব এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি; যেন ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান বলে যদি কেউ থাকে তাকে পর্য্যন্ত ভালবাসতে পারবো।

"বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলুম যে, কারও সঙ্গে সহানুভূতি করতে পারতুম না—আমরা ভাবের বিরুদ্ধ হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতুম না—কলকাতায় যে ফুটপাতে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে পর্য্যন্ত চলতুম না। এখন তেত্রিশ বছর বয়স—এখন বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়ীতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবার মনেও হবে না। এটা কি অবনতি ?—না হৃদয় ক্রমশঃ উদার ও প্রশস্ত হয়ে অনন্ত প্রেমরূপী শ্রীভগবানের দিকে আমায় নিয়ে চলেছে ?"

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ ও জনসাধারণ পুরাতন পন্থার বড় ভক্ত, কোন নূতন মত সহজে গ্রহণ করিতে চাহেন না। কিন্তু ইহারাও মুক্তকণ্ঠে স্বামীজির ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রশংসা করিয়াছিলেন—'দি লণ্ডন ডেলী ক্রণিকল্' নামক পত্র ১৮৯৬ সালের ১০ই জুন লিখিয়াছিল, "স্বামীজি একজন বিখ্যাত বেদান্তবাদী। তাঁহার আচরণ, অনন্যসাধারণ আকৃতি, গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যাপ্রণালী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিলে বুঝা যায়, কেন আমেরিকাবাসিগণ তাঁহাকে এত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি নাম, যশঃ ও পার্থিব সুখভোগের বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহাকে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায় না, কারণ তিনি স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সকল ধর্ম্ম হইতেই কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়াছেন।"

'কান্ট্রি হাউস ম্যাগাজিন'ও লিখিয়াছিল—"লণ্ডন নগরে কত প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয়, যে দার্শনিক যুবক চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর দর্শনযোগ্য আর কোন ব্যক্তি বর্ত্তমানে এস্থানে উপস্থিত নাই। বেদান্তদর্শনবিষয়ক বক্তৃতাসম্বলিত তাঁহার দুই-তিন খানি পুস্তক সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে যে গূঢ়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, একবার মাত্র পড়িয়া তৎসম্বন্ধে মতামত-প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। প্রবন্ধগুলির ভাষা প্রাঞ্জল ও সংযত এবং ভাব হৃদয়গ্রাহী। যুবক 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে আপনার পরিচয় দেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, তিনি জগৎকে নূতন কথা শুনাইবার জন্য আসিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের স্থূলমর্ম্ম 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম'।"

আর একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক লিখিতেছেন—"এখানকার মনীষী ও চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি অদ্ভুতযুক্তিপূর্ণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন

কি, তন্মধ্যে কেহ কেহ বহু ক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

এই সময়ে স্বামীজি ইংলণ্ডে যে অত্যদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার সম্যক বিবরণ-প্রদান এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব, তবে তিনি সমুদয় ইংরেজজাতির মধ্যে যে একটি আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক, অনেকানেক বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক তাঁহার ধর্ম্মসিদ্ধান্তের নূতনত্বে ও সার্ব্বভৌমত্বে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় সমাজের উচ্চচিন্তাশীল নরনারীর হৃদয়ে তৎপ্রচারিত ধর্ম্মভাব দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সকলেই বুঝিয়াছিল যে, চিন্তাজগতে এক নব ভাবের অভ্যুদয় হইতেছে এবং অনেকে মনে করিয়াছিল, বুঝি তাঁহার নামে একটি নবসম্প্রদায় সৃষ্ট হইবে। কিন্তু তিনি বলিতেন, "আমি দল গড়িতে আসি নাই, আমি শুধু প্রচারক ও সন্ন্যাসী মাত্র।" এই-ভাবেই এখনও ইংলণ্ডে অদ্বৈতপ্রচার-কার্য্য চলিতেছে। কে জানে হয়ত এমন দিন আসিবে, যেদিন ইংলণ্ডের সমুদয় ধর্ম্মচিন্তা ভারত-নির্দ্দিষ্ট পথেই প্রবাহিত হইতে থাকিবে এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সফল হইবে।

এই সময়ে মিস্ এইচ্. মূলার, মিস্ মার্গারেট নোবল, মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডি এবং মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার স্বামীজির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন। ইহার মধ্যে প্রথম তিন জনের সহিত তাঁহার প্রথমবার ইংলণ্ডে ভ্রমণকালে পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কেবল সেভিয়ার-দম্পতি এইবারে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহারা দুজনেই স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়া একই সময়ে মনে করিয়াছিলেন, 'ইনিই সেই ব্যক্তি এবং এই সেই ধর্ম্ম যাহা আমরা যাবজ্জীবন খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।' বাস্তবিক তাঁহারা

স্বামীজির চরিত্র-সৌন্দর্য্যে ও তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈত-তত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া জগৎসংসার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। স্বামীজি প্রথম দর্শন হইতেই মিঃ সেভিয়ারকে 'পিতাজী' ও মিসেস্ সেভিয়ারকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। মঠের সকলেও মিসেস্ সেভিয়ারকে সেই মধুর সম্ভাষণে সম্বোধন করিতেন।

ইউরোপভ্রমণ

এইরূপে জুলাই মাস পর্য্যন্ত স্বামীজি ইংলণ্ডে বক্তৃতাদি দিতে লাগিলেন। তার পরই ছুটি আরম্ভ হইল এবং ছাত্র ও ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই রাজধানী ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীর বা শৈলাবাসে গমন করিতে লাগিলেন। স্বামীজিও অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং সেভিয়ার-দম্পতি ও শ্রীমতী মূলারের আগ্রহাতিশয্যে ইউরোপভ্রমণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং নিজেই সুইজারল্যাণ্ড-দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তুষারাবৃত গিরিবর্ত্মে ভ্রমণ করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বড়ই বলবতী হইয়াছিল। আবার সেই প্রব্রজ্যার দিনগুলি স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে জেনেভাযাত্রা নির্দ্ধারিত হইল। জেনেভা প্রকৃতির লীলাভূমি ও প্রোটেষ্ট্যান্ট রিফরমেশনের একটি প্রধান কেন্দ্র এবং সেই সময়ে সেখানে সুইজারল্যাণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যজাতের একটি প্রদর্শনী হইতেছিল। অদূরে বিখ্যাত চিলন দুর্গ, চতুষ্পার্শ্ব হ্রদগিরিসুশোভিত। স্বামীজি বলিলেন, "আমি মব্লাঁ পর্ব্বত (Mont Blanc) ও সৌন্দর্য্যের চিরনিকেতন চামুনীজ গ্রাম দেখিব। আর একটি হিমনদী অতিক্রম করিতেই হইবে।"

এইরূপ স্থির হইলে জুলাই মাসের শষাশেষি একদিন স্বামীজি শিষ্যত্রয়-সমভিব্যাহারে লণ্ডন ত্যাগ করিলেন। ক্যালে হইয়া তাঁহারা প্যারি নগরীতে পৌঁছিলেন এবং তথায় একরাত্রি যাপন করিয়া পরদিন জেনেভাতে উপস্থিত হইলেন। এখানে একটি মনোহরহ্রদোপ্রবিস্থ হোটেলে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বামীজি এস্থানের সুনীল জলরাশি, শীতল বায়ু, উন্মুক্ত আকাশ ও চিত্রাঙ্কিতবৎ গৃহাদি ও ক্ষেত্রশোভা সন্দর্শন করিয়া

অতিশয় পুলকিত হইলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়াই তিনি প্রদর্শনী দেখিতে গেলেন এবং দিবসের অধিকাংশ ভাগ তথায় যাপন করিলেন। প্রদর্শনীতে স্থানীয় শিল্পকলা, বিশেষতঃ কাষ্ঠের কারুকার্য্য-দর্শনে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি সেভিয়ারদম্পতিকে সঙ্গে লইয়া ব্যোমযানে আরোহণ করেন। উর্দ্ধে অনন্ত আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে সূর্য্যদেবের অস্তগমনকালীন শোভা দর্শন করিয়া তিনি বড়ই প্রীতি অনুভব করিলেন। নিম্নে জেনেভানগরী একখানি মানচিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। স্বামীজির আরও উর্দ্ধে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠিল না।

জেনেভাতে তাঁহারা তিন দিন ছিলেন। এখানকার স্নানশালায় স্নানাদি সমাপন করিয়া ও চিলনতুর্গ দেখিয়া তাঁহারা চামুনীজের নিভৃত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে গমন করিলেন। চামুনীজ জেনেভা হইতে ৪০ মাইল। এই স্থানের নিকটে আসিতে আসিতে সুবিখ্যাত আল্পস্ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মর্ঁ ব্লাঁর অতুলনীয় শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "এমন কি হিমালয়েও এমন সৌন্দর্য্য নাই।" অভ্রভেদী হিমালয়ের তুলনায় আল্পস্ একটি ক্ষুদ্র গিরিখণ্ড বলিলেও চলে। কিন্তু হিমালয়ের নীহারমণ্ডল বহুদূরে অবস্থিত—অহরহ ক্রমাগত চলিলেও তাহার নিকটে পৌঁছান যায় না। কিন্তু এ স্থানটি চতুর্দ্দিকেই হিমানীবেষ্টিত। মনে হয় যেন হিমপুঞ্জের মধ্যে বসিয়া আছি। মর্ঁ ব্লাঁ-শিখরের উপর আরোহণ করিতে তিনি বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, কিন্তু হোটেলে আসিয়া পথ-প্রদর্শকদিগের নিকট শুনিলেন যে, নিপুণ পর্ব্বতবাসী ব্যতীত কেহই ওখানে উঠিতে পারে না। স্বামীজি ইহাতে বড়ই নিরাশ হইলেন। কিন্তু দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে ঐ স্থানের দুরারোহ শৈলসংস্থান দেখিয়া তিনি স্বীকার করিলেন যে, ঐ স্থানে গমন বিপৎসঙ্কুল ও দুঃসাধ্য বটে। যাহা হউক,

তিনি এক্ষণে যেরূপেই হউক, একটি হিমনদী অতিক্রম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, কারণ তাঁহার মনে হইল ইহা না হইলে তাঁহার সুইজারল্যাণ্ড-ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত 'মার্দেগ্লেস' নামক হিমনদী নিকটেই ছিল। সুতরাং স্বামীজি কয়েক দিন পরে সদলে সেখানে যাত্রা করিলেন। তবে যাত্রাটি প্রথমে তিনি যেরূপ সুখসাধ্য কল্পনা করিয়াছিলেন সেরূপ হইল না। মধ্যে মধ্যে পদস্খলন হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি গভীর খড়সমূহ ও পর্ব্বতগাত্রের শ্যামলশ্রী তাঁহার প্রাণে প্রচুর আনন্দ ঢালিয়া দিল। হিমনদীটি অতিক্রম করিয়াই একটি প্রকাণ্ড চড়াই আছে। তাহাতে আরোহণ করিলে তবে উপরিস্থ গ্রামে পৌঁছান যায়। এই চড়াইয়ে উঠিতে উঠিতে স্বামীজির মাথা ঘুরিতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কখনও এরূপ দুর্ব্বলতা অনুভব করেন নাই। এই অবস্থায় কয়েকবার তাঁহার পদস্খলন হইল, কিন্তু অবশেষে কোনরূপে শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন ও একপাত্র উষ্ণ কফি পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন।

তারপর হিমালয়ের কথা এবং পুরাতন দিনের স্মৃতিসকল ধীরে ধীরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল; তিনি সহচরগণের নিকট সেই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন। এখানেই তিনি প্রথম চিরপ্রিয় হিমালয়-ক্রোড়ে একটি অদ্বৈত-আশ্রম-স্থাপনের কল্পনা পরিব্যক্ত করেন। স্বপ্নের মত এই কল্পনা সেভিয়ার সাহেবের মনে স্থান পাইল। তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "যদি ইহা কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে কি সুন্দর হয়! আপনি ঠিক বলিয়াছেন, এইরূপ একটি আশ্রম চাই-ই চাই।" পাঠক দেখিবেন, এই শুভচিন্তা কালে কি ফল প্রসব করিয়াছিল।

চামুনীজ হইতে যাত্রীরা সেণ্ট বার্ণার্ড নামক গ্রামে গমন করিলেন। ঊর্দ্ধে সুবিখ্যাত সেণ্ট বার্ণার্ড পাশ নামক গিরিসঙ্কট, যাহার শিখরোপরি

প্রসিদ্ধ আগষ্টনীয় সন্ন্যাসীদিগের পান্থশালা। ইউরোপের মানব-অধ্যুষিত স্থলের মধ্যে এই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ।

অতঃপর শ্রীমতী মূলারের অনুরোধে যাত্রিগণ কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একটি নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিলেন। এস্থানের চারি পার্শ্বেই তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং মূর্ত্তিমতী শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজিত। এখানে উহারা দুই সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন এবং স্বামীজির সহচরেরা তাঁহার মৌন ধ্যানভাব লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইলেন। এইস্থানেই একদিন স্বামীজি পর্ব্বতপথে ভ্রমণ করিতে করিতে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। তিনি উপনিষদ্-মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে-ছিলেন, কিন্তু ক্রমে সঙ্গীদিগের কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ পর্ব্বতের এক অত্যুন্নত প্রদেশে তাঁহার যষ্টি প্রোথিত হইয়া যাওয়ায় তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং দৈববলে রক্ষা না পাইলে পার্শ্বস্থ গভীর খাতে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইতেন। বন্ধুরা এই ঘটনা শ্রবণাবধি আর কখনও তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাইতেন না।

এইস্থানে এক মন্দিরে একদিন তিনি সেভিয়ার-গৃহিণীকে কুমারী মেরীর পদে তাঁহার হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে বলেন, কারণ তিনি বলিলেন, "ইনিও ত মা!" তিনি স্বয়ংই পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে বিধর্ম্মী বলিয়া মন্দিরস্বামী আপত্তি করেন, এই ভাবিয়া নিরস্ত হন।

এই সময়ে তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক লোকবিশ্রুত জার্ম্মান পণ্ডিত পল ডয়সন একখানি বিশেষ অনুরোধ-লিপি দ্বারা তাঁহাকে নিজ কিলস্থ বাসভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেই পত্রখানি লণ্ডনের ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল, পরে সেখান হইতে এই লোকলোচনের অন্তরালবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামে প্রতিপ্রেরিত হইয়া আসিয়াছে।

স্বামীজি ও তাঁহার শিষ্যগণের ইউরোপের আরও অনেক স্থানে ভ্রমণের সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু এই পত্র পাওয়ায় সেসকল আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইল। পল ডয়সন কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে স্বামীজির বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহাকে একজন মৌলিকচিন্তাশীল ও প্রথমশ্রেণীর আধ্যাত্মিক-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি নিজে বেদান্তের পণ্ডিত এবং সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বামীজির ন্যায় একজন উপযুক্ত উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দর্শনাদি শাস্ত্র-আলোচনার বড়ই অভিলাষী হইয়াছিলেন। স্বামীজিও অধ্যাপকের পত্র পাইয়া শীঘ্র কিল যাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু স্থির হইল, সুইজারল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান ও জার্ম্মানির দুই-একটি প্রধান স্থান দেখিয়া পরে কিল যাইবেন। সুতরাং অতঃপর তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী লুসার্ণে গমন করিলেন। লুসার্ণে তাঁহারা দর্শনীয় সমুদয় বস্তু দেখিলেন এবং সেভিয়ার সাহেব ব্যতীত সকলে রেলগাড়ী করিয়া গিরিপর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন। এস্থান হইতে জগতের মধ্যে একটি অতুলনীয় তুষার-বীথিকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে এখানে তাঁহারা সুইস্ গার্ডদিগের সমাধিস্থান ও তদুপরিস্থ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত এক অপরূপ নিদ্রিত সিংহমূর্ত্তি দর্শন করেন। এখান হইতে তাঁহারা রিউস নদীর উপরিস্থ দুইটি চিত্রশোভিত আচ্ছাদিত সেতু অতিক্রম করেন। ইহারই একটি চিত্রে 'মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য' অঙ্কিত আছে। পরে তাঁহারা লুসার্ণের মিউজিয়ম ও যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মমন্দিরে সুবিখ্যাত Vox Humana (মানবকণ্ঠ) নামক অর্গানযন্ত্র আছে তাহা দর্শন করেন। এই যন্ত্রমধ্য হইতে অবিকল মনুষ্যকণ্ঠোচ্চারিত শব্দশ্রবণে স্বামীজি আমোদ বোধ করিলেন। অতঃপর তিনি ষ্টীমারে চড়িয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যবেষ্টিত লুসার্ণ হ্রদের উপর ভ্রমণ করিলেন। এইখানে উইলহেল্‌ম্ টেলের নামে উৎসর্গীকৃত

একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া সেই স্বদেশপ্রেমিকের জীবনকাহিনী তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। লুসার্ণ হ্রদের ধারে তিনি এক দিন খুব ঝাল লঙ্কা দেখিতে পাইলেন, পাশ্চাত্যদেশে গিয়া অবধি এরূপ লঙ্কা দেখেন নাই। তাঁহাকে কতকগুলি কাঁচা লঙ্কা চিবাইতে দেখিয়া বিক্রেতা অবাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু তিনি মহা পরিতৃপ্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এর চেয়ে আর ঝাল লঙ্কা আছে ?"

লুসার্ণ হইতে মিস্ মূলার কার্য্যানুরোধে অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া স্বামীজি ও সেভিয়ার-দম্পতি জেমট্ নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এটি সুইজারল্যাণ্ড দেশের মধ্যে একটি অতি রম্য স্থান। এই স্থানে কর্ণারগ্রাট শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া মাটারহর্ণের দৃশ্য দেখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেখানকার বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্মত্বনিবন্ধন এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। অতঃপর সকলে সফহজেন নামক স্থানে রাইন-নদের জলপ্রপাত দেখিবার জন্য গমন করিলেন। এখানেও শিষ্যেরা তাঁহার মৌনভাব ও ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তি লক্ষ্য করেন। বোধ হয় নির্জ্জন পর্ব্বতবাসে তাঁহার হৃদয়ে লোকাতীত শান্তি উপস্থিত হইয়াছিল।

এখান হইতে তাঁহারা জার্ম্মানীর হাইডেল বার্গ শহরে গমন করেন। এখানে একটি প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্বামীজি তাহা দর্শন করিয়া জার্ম্মানজাতির বিপুল বিদ্যাশিক্ষাপ্রণালী ও বিদ্যার্থিগণের বিদ্যার্জ্জনের সুযোগ দেখিয়া বিস্ময়াপ্লুত হইলেন। এখানে দু'দিন থাকিয়া কবলেন্জ-এ এক রাত্রি যাপন করিলেন এবং তৎপর দিবস ষ্টীমারযোগে রাইননদবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে ২।৩ দিন পরে কলোন নগর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কলোনে তিনি কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া তথাকার সুবৃহৎ ভজনালয়, তন্মধ্যস্থ ধনাগার ও সন্ন্যাসিনীগণের হস্তনির্ম্মিত অতুলনীয় রত্ন-মণ্ডিত ক্রুশ ও আরও বহুবিধ দর্শনীয় বস্তু দেখিলেন।

তদনন্তর তাঁহার ইচ্ছাক্রমে বার্লিনযাত্রা করা হইল। যতই তাঁহারা জার্ম্মানীর ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন ততই তিনি জার্ম্মানজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি জার্ম্মানজাতির সমৃদ্ধি ও বর্ত্তমান রীত্যনুযায়ী গঠিত শত শত নগর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অবশেষে বার্লিনে পৌঁছিয়া সেই মহানগরীর সুবিস্তৃত রাজপথ, মনোহর উদ্যাননিচয় ও রমণীয় প্রাসাদাবলীদর্শনে স্বতঃই প্যারি নগরীর সহিত তাহার তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বুঝিলেন, কেন জার্ম্মানজাতি এত উন্নতিশীল। জার্ম্মান সৈন্য দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'কি সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি!'

সেভিয়ার সাহেব এখান হইতে তাঁহাকে ড্রেসদেন্ শহর দেখাইতে লইয়া যাইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজি বলিলেন, আর বিলম্ব করা উচিত নহে, কারণ অধ্যাপক ডয়সন হয়ত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুতরাং এখান হইতে তাঁহারা একেবারে বাল্টিকতীরস্থ কিল শহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অধ্যাপক তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া একখানি পত্রে তাঁহাদিগকে পরদিন প্রাতঃকালে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পরদিন ১০টার সময়ে তাঁহারা অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অধ্যাপক ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহাসমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। অধ্যাপক তাঁহার পুস্তকাগারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সামাজিক সদালাপের পর ক্রমশঃ কথাপ্রসঙ্গে পুস্তকের কথা উঠিল। অমনি বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপকবর উপনিষদ্ হইতে ২।৩টি মধুবর্ষী শ্লোক পাঠ করিলেন। বলিলেন যে, বেদচর্চ্চাজনিত আনন্দ একটি পরম লোভনীয় বস্তু, এবং সেই উচ্চভূমিতে আরোহণ করিলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আশ্চর্য্যরূপে প্রশস্ত হয় এবং প্রাণে অনির্ব্বচনীয় সুখের সঞ্চার হয়। তিনি আরও বলিলেন যে, বেদান্তশাস্ত্র অর্থাৎ উপনিষদ্ ও শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যসমেত

বেদান্তসূত্র সত্যান্বেষণপ্রয়াসী মানবপ্রতিভার বিরাট ও বহুমূল্য ফল। অধ্যাপক পুনরায় কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, বর্ত্তমানে অন্তর্দিক হইতে ফিরিয়া আধ্যাত্মিকতার মূল প্রস্রবণের দিকে একটা গতি আরম্ভ হইয়াছে, ইহার ফলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই সমস্ত জগতের ধর্ম্মগুরু হইয়া দাঁড়াইবে।

অনন্তর স্বামীজি অধ্যাপকের কতকগুলি অনুবাদ দেখিলেন এবং দুরূহ অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা-নির্ণয়প্রসঙ্গে বলিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে পারিভাষিক সংজ্ঞাসমূহের অর্থটি যথাসম্ভব পরিস্ফুট করা উচিত—ভাষার লালিত্য তাহার পরে। অধ্যাপকও শেষে স্বামীজির যুক্তিতর্কের অনুমোদন করিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষ ও প্রাচীন প্রাচ্যসভ্যতা সম্বন্ধে কথোপকথন হইল। অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী ভারতবর্ষের প্রতি বড় সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন যে, জার্ম্মান-ভ্রমণকারীদিগের প্রতি ভারতবর্ষীয়েরা বড়ই সদয় ও শিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপে নানা কথায় অধ্যাপক ও তাহার পত্নী অতিথিগণের সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। সেদিন তাঁহাদের কন্যা এরিকার চতুর্থ জন্মদিবস উপলক্ষে গৃহে একটি ক্ষুদ্র উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং সে দিনটি বেশ আনন্দেই কাটিল। ঐ সময় ঐ স্থানে একটি প্রদর্শনী হইতেছিল। চা-পানের পর অধ্যাপক তাঁহার অতিথিগণকে উহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে বহুবিধ শিল্পকলা দেখিয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া স্বামীজি হোটেলে ফিরিলেন। পরদিন অধ্যাপক সশিষ্য স্বামীজিকে লইয়া শহরের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান সুপ্রসিদ্ধ কিল বন্দর। জার্ম্মান-সম্রাট কৈশর উইলিয়ম কয়েক দিবস পূর্ব্বে স্বয়ং এই বন্দরটি খুলিয়াছিলেন। স্বামীজি অধ্যাপকের মধুর ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইলেন। অধ্যাপক মনে করিয়াছিলেন, স্বামীজি আরও কিছু দিন থাকিয়া যাইবেন এবং তিনি মনের সাধে নির্জ্জনে নিজ

বৃহৎ পুস্তকালয়ে বসিয়া দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিবেন। কিন্তু স্বামীজি বলিলেন যে, ইংলণ্ডের কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রায় দেড় মাস হইল তাহা বন্ধ হইয়াছে, আর অধিক বিলম্বে কার্য্যহানি হইবে। অগত্যা অধ্যাপক দুঃখিতচিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু বলিলেন তিনি শীঘ্রই হামবার্গে স্বামীজির সহিত মিলিত হইবেন এবং তথা হইতে হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া একত্র লণ্ডন যাইবেন। তাহাই হইল। স্বামীজি সশিষ্য হামবার্গে গিয়া তিন দিন রহিলেন। তিন দিন পরে ডয়সন তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। পরে সকলে একত্রে হল্যাণ্ডের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজধানী আমষ্টারডাম শহরে গেলেন। তথায় তিন দিন থাকিয়া চিত্রশালা, মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখিয়া লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

লণ্ডনে শেষ কয় দিন

ইতোমধ্যে স্বামীজি নিজ আদর্শে গঠিত স্বামী সারদানন্দকে নিউইয়র্কে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ সেখানে বেদান্তপ্রচারকার্য্য তাঁহার অভাবে কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল। নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া স্বামী সারদানন্দ প্রথমে 'গ্রিনএকার কন্‌ফারেন্স অব্ কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান' নামক সভার আহ্বানে সেখানকার একজন শিক্ষকরূপে বেদান্ত সম্বন্ধে এবং স্বয়ং ক্লাস খুলিয়া যোগসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে তিনি বষ্টন, ব্রুকলিন ও নিউইয়র্ক শহরে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইলেন। স্বামীজি ইউরোপভ্রমণকালে পত্রাদিতে তাঁহার গুরুভ্রাতার এবংবিধ কার্য্যকুশলতা শ্রবণ করিয়া আন্তরিক প্রীত হইয়াছিলেন।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া সেভিয়ার সাহেবের হ্যাম্পষ্টীডস্থ ভবনে কয়েক দিবস বিশ্রামগ্রহণের পর স্বামীজি পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে শ্রীমতী মূলারের বৈঠকখানায় দুইটি বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল—'সভ্যতায় বেদান্তের কার্য্যকারিতা'। সোয়াম্ (Schwam) সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মহিলা শ্রোতাই অধিক ছিলেন। শীঘ্রই ক্লাস খোলা হইল এবং শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে স্বামীজি 'রাজযোগ' ও 'ধ্যানযোগ' সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার ইংলণ্ডে বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল 'জ্ঞানযোগ'। তিনি যেন এই সময়ে জ্ঞানের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়া এই কঠিন বিষয়টি সকলকে বুঝাইতেছিলেন। লোকের সুবিধার জন্য ষ্টার্ডি সাহেব ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে একটি হলঘর ঠিক করিলেন। এইখানেই বক্তৃতাদি হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে স্বামীজির গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ

ভারতবর্ষ হইতে ওখানে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে সেভিয়ার-পরিবারে বাস করিতেছিলেন। কারণ, স্বামীজি এই বৎসরের শেষভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে এমন একজন প্রতিনিধি রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে সুন্দররূপে কার্য্য চালাইতে সমর্থ হইবেন। তদনুসারে এক্ষণে তিনি অভেদানন্দ স্বামীকে উপদেশাদি দ্বারা গঠিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এত কার্য্যের মধ্যেও তিনি ভারতে পত্রাদি লিখিয়া বিলাতে তাঁহার প্রচার-বিবরণ জানাইতেছিলেন। তাঁহার মনে এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বলিতেন 'কুড়িটি কর্ত্তব্যপরায়ণ কার্য্যক্ষম প্রচারক পাইলে বিশ বৎসরের মধ্যে আমি সমুদয় পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডকে বেদান্তের ভাবে ভাবিত করিতে পারি।' আর এ কার্য্যের অত্যাবশ্যকতাও তিনি বিশেষ-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্ত্য জাতিদিগের মধ্যে বেদান্ত প্রচারিত হইলে ভারতে তাহার যে শুভফল হইবে, এই কার্য্য কেবল ভারতের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হইবে না; তাই লিখিয়াছিলেন—"ভারতের বাহিরে প্রদত্ত একটি আঘাত ভিতরে প্রদত্ত সহস্র আঘাতের সমান।"

অধ্যাপক ডয়সন প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিয়া বেদান্তশাস্ত্রের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে আরও উজ্জ্বল ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজির সহিত যতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে লাগিলেন, ততই অনুভব করিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিশক্তি লইয়া ভারতীয় দর্শন সম্পূর্ণ বুঝা যায় না। ইহা বুঝিতে গেলে একেবারে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গণ্ডির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, পাশ্চাত্ত্য রাজনীতি-শিক্ষাদীক্ষার পর্দ্দা কাটিয়া বাহির হইতে হইবে। এই সময়ে তিনি দুই

সপ্তাহ দিবারাত্র স্বামীজির সন্নিধানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ওদিকে অধ্যাপক মোক্ষমূলারও পত্রাদি দ্বারা স্বামীজির সহিত ভাবের আদানপ্রদান চালাইতেছিলেন। এইরূপে তিনটি মহামনস্বী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—একমাত্র বেদান্তই এই অপরূপ মিলনের প্রধান বন্ধন-সূত্র।

স্বামীজির পূর্ব্বতন ছাত্রেরা তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুনরায় দলে দলে আসিতে লাগিল এবং তাহাদের অনুরোধে ৮ই অক্টোবর তারিখে একটি ক্লাস খোলা হইল। এই অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে তিনি বেদান্তের মতবাদ এবং কর্ম্মজীবনে উহার উপযোগিতা বেশ করিয়া বুঝাইলেন, বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য মায়াবাদটিকে উত্তমরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। যাহারা তাঁহার 'মায়া ও ভ্রান্তি', 'মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ', 'মায়া ও মুক্তি', 'ব্রহ্ম ও জগৎ' মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিবেন, তিনি এ বিষয়ে কতটা সফলকাম হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকত্ব', 'অপরোক্ষানুভূতি', 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব', 'আত্মার স্বাধীনতা' এবং 'কার্য্যক্ষেত্রে বেদান্তের উপযোগিতা' শীর্ষক পাঁচটি বক্তৃতায় তিনি অদ্বৈততত্ত্বটি অতি সরলভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলেই ইউরোপ মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে। আত্মতত্ত্ব, ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম ও মনুষ্যের দেবত্ব সম্বন্ধে তিনি ইউরোপবাসীর চিন্তাপ্রবাহ সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মায়াবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে একদিন এমনি হইয়াছিল যে তাঁহার শ্রোতাদিগের সকলেরই দেহবোধ চলিয়া গিয়াছিল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহারা যেন আত্মভাবে অবস্থান করিতেছেন মনে করিয়াছিলেন। সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এইরূপ শিক্ষকই শিষ্যকে প্রকৃত অনুভূতির পথে লইয়া যাইতে সমর্থ। বলা বাহুল্য, স্বামীজির

সকল বক্তৃতার ন্যায় এই বক্তৃতাগুলিও পূর্ব্বে কিছুমাত্র প্রস্তুত না করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপে সমুদয় অক্টোবর ও নভেম্বর মাস লণ্ডন ও অক্সফোর্ডের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে দিতে অতিবাহিত হইল। এই সময়ে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ মনীষিবৃন্দ স্বামীজির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন—বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ গ্রন্থকার মিঃ ফ্রেড্রিক এচ্ মায়ার্স, রেভারেণ্ড জন পেজ হপ্স্, পজিটিভিষ্ট ও শান্তিপক্ষাবলম্বী মিঃ এম ডি কনওয়ে, ডাঃ ষ্টান্টন কয়েট, থিষ্টিকদলের নেতা রেঃ চার্লস ভয়সী এবং 'টুওয়ার্ডস ডেমোক্রেসি' নামক গ্রন্থপ্রণেতা মিঃ এড্ওয়ার্ড কার্পেণ্টার। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজকীয় ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যেও অনেকে স্বামীজির ভাব গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ উপদেশাদিতে তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বামীজি ত্রিবিধ বেদান্তবাদ-সমর্থনোপযোগী শ্লোকসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বেদগ্রন্থ হইতে আহরণ করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, নিজ দার্শনিক মত সম্বন্ধে একখানি সুবিস্তৃত পুস্তক রচনা করিয়া যাইবেন, কিন্তু নিরন্তর কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। দিনরাত কত লোক দেখা করিতে আসিত। তাহাদের সহিত কথা বলা, ক্লাসে শিক্ষা দেওয়া, সাধারণ্যে বক্তৃতা দেওয়া, ব্যক্তিবিশেষের আহ্বানে তাঁহাদের বাটীতে বা ক্লাবে গমন করিয়া উপদেশ দেওয়া, চিঠিপত্র লেখা, ভারতীয় ও আমেরিকার কার্য্যের ব্যবস্থা করা এবং গুরুভ্রাতাদিগকে উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্যে তাঁহাকে অহোরাত্র ব্যাপৃত থাকিতে হইত।

২৭শে অক্টোবর তারিখে স্বামীজি অভেদানন্দকে ব্লুমস্বেরী স্কোয়ারে তাঁহার স্থানে বক্তৃতা দিতে বলিলেন। বিলাতে অভেদানন্দ স্বামীর এই প্রথম বক্তৃতা। কিন্তু তাহা শ্রবণ করিয়া স্বামীজি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বুঝিলেন যে, এই নবীন উপদেশকের দ্বারা তাঁহার কার্য্য অক্ষুণ্ণভাবে

চলিবে। এই সময়ে আমেরিকা হইতে স্বামী সারদানন্দেরও প্রচারকার্য্যের সংবাদ পাইলেন। বুঝিলেন, কর্ম্মের প্রসার ক্রমে বাড়িতেছে। তাঁহার অভাবে আমেরিকার কার্য্য যে অচল হইবে না, বরং উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবে ইহা দেখিয়া তিনি শান্তি অনুভব করিলেন, কারণ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছিল। কোন কার্য্যেই তাঁহার আর প্রবৃত্তি ছিল না। লুসার্ণ হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার কাজ শেষ হইয়াছে। আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি, আর সকলে তাহা চালাইতে থাকুক। আমি লোহার শিকল (অর্থাৎ সংসারবন্ধন) কাটিয়া আসিয়াছি। আর সোনার শিকলে বাঁধা পড়িতে চাহি না। আমি স্বাধীন এবং চিরদিন স্বাধীনই থাকিব, আর আমি চাহি সকলেই স্বাধীন হউক।"

অক্টোবর মাসের শেষে তাঁহার মন ক্রমশঃ ভারতের প্রতি ধাবিত হইল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন ক্লাসের কার্য্য শেষ করিয়া তিনি সেভিয়ার-গৃহিনীকে নেপ্‌ল্‌সের টিকিট কিনিতে বলিলেন এবং ভারতযাত্রার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার যাইবার কথা সকলেই জানিত, কিন্তু হঠাৎ একথা শুনিয়া সেভিয়ার-গৃহিণী চমকিত হইলেন। তিনি এবং তাঁহার পতিও যে স্বামীজির সহিত ভারতে যাইবেন এবং তথায় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন! স্থির হইল, যাইবার পথে তাঁহারা কয়েকটি প্রধান প্রধান শহর দেখিয়া যাইবেন।

স্বামীজি মান্দ্রাজের ভক্তগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, আর লিখিলেন যে তিনি ভারতবর্ষে গিয়া কলিকাতা ও মান্দ্রাজে দুইটি কেন্দ্র স্থাপন করিবেন এবং সেভিয়ার-দম্পতি হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে যেরূপভাবে কার্য্য করিবেন তৎসম্বন্ধীয় চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রথমে এই তিনটি কেন্দ্রে কার্য্য আরম্ভ হইবে, তারপর বোম্বাই এবং এলাহাবাদেও দুটি কেন্দ্র

হইবে, তারপর ভগবানের ইচ্ছা হইলে সমুদয় ভারতে, এমন কি, জগতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিব।"

সেভিয়ার-দম্পতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন; সাংসারিক সমুদয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অলঙ্কার, পুস্তক, চিত্র প্রভৃতি সমুদয় গৃহ-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ উপযুক্ত শিষ্যের ন্যায় গুরুহস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা এক্ষণে বাসভবন ছাড়িয়া অন্যত্র ঘর লইয়া রহিলেন, উদ্দেশ্য—স্বামীজি যেদিন বলিবেন তাঁহার সঙ্গে রওনা হইবেন। গুড্‌উইন সাহেবও এই সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল এবং কিছুদিন পরে স্বামীজির শিষ্যদিগের মধ্যে মিস্ মুলার এবং মার্গারেট নোব্‌ল্‌ও ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করিবেন কথা হইল।

ক্রমে স্বামীজির ছাত্রেরা সকলেই শুনিল যে, তিনি ডিসেম্বরের মধ্যভাগে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। সকলেই এ সংবাদে বিষণ্ণ হইল। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মানসহকারে বিদায়দান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। ষ্টার্ডি সাহেব স্বয়ং ইহার প্রধান উদ্যোগী হইলেন এবং স্বামীজির সমস্ত বন্ধুবান্ধব, ভক্ত ও ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

অবশেষে ১৩ই ডিসেম্বর অর্থাৎ স্বামীজির ইংলণ্ডত্যাগের পূর্ব্ব রবিবার পিকাডিলিস্থ 'রয়েল সোসাইটি অব্ পেণ্টারস্ ইন্ ওয়াটার কালারস্' নামক সমিতি-ভবনে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। লণ্ডন শহরের সর্ব্বত্র, এমন কি, দূর নগরোপকণ্ঠ হইতেও শত শত লোক এই বিদায়-উৎসবে যোগ দিতে আসিল। শেষে এমন হইল যে, দাঁড়াইবার জায়গা পর্য্যন্ত রহিল না। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল, সুতরাং সকলেরই এই বিদায় উপলক্ষে আন্তরিক কষ্ট হইতেছিল। তিনি যে তাহাদের

অনেকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন! চিত্রশালাস্থ সমুদয় চিত্রাবলীতে গৃহখানি সুশোভিত হইয়াছিল, যে মঞ্চের উপর হইতে স্বামীজি ইংরেজ জাতির নিকট তাঁহার শেষবাণী উচ্চারণ করিবেন, তাহার চতুর্দ্দিক পত্রপুষ্পলতায় বেষ্টিত হইয়াছিল। পার্শ্বে সঙ্গীতলহরী গৃহদ্বার মুখরিত করিয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘের হৃদয়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছিল। সকলেরই প্রাণে হর্ষশোকবিজড়িত এক অপূর্ব্ব ভাব উঠিতেছিল। সকলেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য, এমন কি সুবিধা হইলে আর একবার তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সমুৎসুক হইয়াছিল।

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীজি সভায় প্রবেশ করিলেন। তখন জন কয়েক ভক্ত নরনারী আপনাপন হৃদয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ব্যক্ত করিয়া বক্তৃতা করিলেন। অনেকেই মনোবেদনায় মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। অনেকের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বরমূর্ত্তি স্বামীজি তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বলিলেন, "হ্যাঁ, আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়।"

তারপর সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করা হইল এবং স্বামীজি অতি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

১৬ই ডিসেম্বর স্বামীজি সেভিয়ার-দম্পতিকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন ত্যাগ করিলেন। বিলাতে তিনি প্রচারকার্য্যে কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিতে গেলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবরবৃদ্ধি হইয়া পড়ে। সুতরাং বাহুল্যভয়ে সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল ১৮৯৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে লিখিত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহোদয়ের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কেহ কেহ মনে করেন, স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে যেসকল বক্তৃতা

দিয়াছিলেন তাহাতে তাদৃশ ফল হয় নাই, তাঁহার বন্ধু ও ভক্তবৃন্দ তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতেছেন মাত্র। কিন্তু আমি এস্থানে আসিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহার অতিশয় প্রভাব অবলোকন করিতেছি। ইংলণ্ডের অনেক স্থানে এমন অনেক লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহারা বিবেকানন্দের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সত্য বটে, আমি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত নহি এবং তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমার মতভেদ আছে, কিন্তু আমি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি এখানকার বহু ব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলন ও হৃদয়ের সম্প্রসারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার শিক্ষাপ্রভাবেই এখানকার অনেক লোক এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রনিহিত অদ্ভুত অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী হইয়াছেন। তিনি যে শুধু এই ভাব আনয়ন করিয়াছেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক অমূল্য প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মিঃ হাউইস-প্রণীত 'খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের অবসান'-নামক পুস্তকের 'বিবেকানন্দের মতবাদ'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আমি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্দৃষ্টে আপনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, বিবেকানন্দের ধর্ম্মমতের বিস্তৃতিবশতঃ শত শত ব্যক্তি এখানে খৃষ্টধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বাস্তবিক, তাঁহার কার্য্য এদেশে কিরূপ গভীরভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়।

"গতকল্য সন্ধ্যার সময় আমি লণ্ডনের দক্ষিণভাগে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু পথ গোলমাল হওয়ায় এক মোড়ে দাঁড়াইয়া কোন্ দিকে যাইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একজন ভদ্রমহিলা একটি বালকসঙ্গে আমাকে পথ দেখাইয়া দিবার মানসে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, 'মহাশয়, বোধ হয় পথ খুঁজিতেছেন? আমি কি আপনার সাহায্য করিব?' ... এই বলিয়া তিনি আমায় পথ

দেখাইয়া দিলেন ও শেষে বলিলেন, 'আপনাকে দেখিয়াই আমি আমার ছেলেকে বলিতেছিলাম—ঐ দেখ, স্বামী বিবেকানন্দ।' তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরিতে হইবে বলিয়া আমি আর তাঁহাকে বলিবার সময় পাইলাম না যে, আমি স্বামী বিবেকানন্দ নহি, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে না দেখিয়াই তাঁহার প্রতি সেই স্ত্রীলোকটির গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি প্রকৃতই বিস্মিত হইলাম। ঘটনাটি আমার বড় মধুর লাগিল এবং আমার মস্তকস্থ গেরুয়া পাগড়িই এই সম্মানের কারণ ভাবিয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলাম। উল্লিখিত ঘটনা ব্যতীত আমি এখানে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক দেখিয়াছি, যাঁহারা ভারতবর্ষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় কোন ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা পাইলেই সাগ্রহে ও গাঢ় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন।"

বাস্তবিক স্বামীজি ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের প্রচারকার্য্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাসিগণের মনপ্রাণের একতাসাধন সম্বন্ধে যতটা সহায়তা করিয়াছে, বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন কার্য্য দ্বারা তাহা হয় নাই।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে

লণ্ডনপরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজির অন্তঃকরণ উদ্বেগশূন্য হইল। অভেদানন্দ স্বামী দ্বারা তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে ভাবিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার বিশ্বাস ছিল ভগবৎশক্তির উপর। এই সময়ে তাঁহার একজন ইংরেজ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামীজি, এখন আপনার ভারতবর্ষ কেমন লাগিবে ?" স্বদেশপ্রেমিক বীর উত্তর দিলেন, "এখানে আসিবার আগে ত আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এখন ভারতের বায়ু, এমন কি সেখানকার প্রতি ধূলিকণা আমার নিকট পবিত্র। ভারতভূমি পবিত্র ভূমি। হিন্দুস্থান আমার তীর্থস্থান।"

ডোভার, ক্যালে এবং মণ্টসেনিস অতিক্রম করিয়া স্বামীজি সশিষ্য প্রথমে মিলান নগরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণ অহোরাত্র ভারতচিন্তায় মগ্ন। মিলানে তুষার-দৃশ্য দেখিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। এই তাঁহার প্রথম ইটালীর নগরসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা। এখান হইতে তাঁহারা পাইসা শহরের সুবিখ্যাত 'লিনিং টাওয়ার' দেখিতে গেলেন। ইহা ১৮৩ ফুট উচ্চ। ইহা সাধারণ গৃহাদির ন্যায় তলদেশ হইতে সরল-ভাবে নির্ম্মিত না হইয়া পার্শ্বের দিকে হেলান এবং ইহাতে আরোহণ এত সহজ যে, এমন কি অশ্বাদি পশুও অক্লেশে উপরে উঠিতে পারে। এখান হইতে দূরে আপেনাইন শৈলমালার একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাইসা ও মিলান উভয় স্থানেই স্বামীজি শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরের বিচিত্রকারুকার্য্যশোভিত অট্টালিকাসমূহ দেখিয়া প্রশংসা করিয়া-ছিলেন। পাইসা হইতে ফ্লরেন্স চিত্রশিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট বড়ই

প্রিয়। তাহার উপর ইহা আবার নানা ঐতিহাসিক ঘটনার রঙ্গভূমি। সুতরাং সহজেই স্বামীজির চিত্তাকর্ষণ করিল। এখানে তিনি হঠাৎ একদিন পূর্ব্বপরিচিত আমেরিকান বন্ধু মিঃ ও মিসেস্ হেল্‌কে দেখিতে পাইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

তার পর রোম। ছাত্রজীবন হইতেই তাঁহার এই মহানগরী দেখিবার বাসনা মনে মনে ছিল। তখন হইতেই রোমের প্রাচীন মনীষিবৃন্দের লীলাস্থলসমূহ তাঁহার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইত। ভাবিতেন দিল্লী যেমন প্রাচ্য ভূখণ্ডের একটি মহাকেন্দ্র, প্রতীচ্য জগতে রোমও সেইরূপ। এতদিনে তাঁহার সেই কল্পনার দৃশ্য স্থূল চক্ষে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। এখানে তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন। প্রতিদিন নূতন নূতন স্থান দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মন প্রাচীন রোমকজাতির কীর্ত্তিকলাপ, রোমসম্রাটদিগের ইতিহাস, রোমের ধ্বংস প্রভৃতি নানা বিষয়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সঙ্গীদিগের নিকট সেই সম্বন্ধে গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও ঐতিহাসিক জ্ঞানদর্শনে অবাক হইয়া বলিয়াছিলেন, "আশ্চর্য্য, স্বামীজি! আপনি দেখিতেছি রোমের প্রত্যেক পাথরটির কথা জানেন!" কয়েক দিবসের মধ্যে রোমান ফোরাম্, এপ্পিয়ান্ ওয়ে, কলোসিয়াম্, সীজার-দিগের প্রাসাদ, সেণ্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল, পোপের প্রাসাদ ভ্যাটিকান্, ট্রোজান স্তম্ভ, টাইটাস্-এর বিজয়তোরণ ও আরও নানা স্থান দেখা হইল। ক্যাথলিকদিগের সঙ্ঘগঠনের ক্ষমতা ও প্রচার-কার্য্যে আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার মনে নানা চিন্তার উদয় হইল এবং তাঁহাদিগের উপাসনাপদ্ধতির সহিত তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের পূজাপদ্ধতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলেন। তিনি যখন সেণ্টপিটার্স ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তরভাগের স্থাপত্যকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তখন একজন রোমক-রমণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজি, ইহারা যে সাজসজ্জাতে এত অর্থব্যয় করিয়াছে এসম্বন্ধে আপনি

কি বলেন? কোটী কোটী লোক অনাহারে মরিতেছে, আর বাহ্যাড়ম্বরে এত টাকা ব্যয়!” স্বামীজি বলিলেন, “কি রকম! ভগবানকে যতই ঐশ্বর্য্য নিবেদন করা যাক, সে কি কখনও বেশী হতে পারে? এত জাঁক-জমকের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টচরিত্রের মাহাত্ম্যই ত লোককে বুঝাবার চেষ্টা হচ্ছে। দেখান হচ্ছে যে যিনি নিজে কর্পদ্দকশূন্য ছিলেন, তাঁহার চরিত্র-গৌরবই আজ সমস্ত মানবজাতির শিল্পে এত সৌন্দর্য্য-অভিব্যক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, বাহিরের দিক্‌টার দাম ততক্ষণ, যতক্ষণ তাতে অন্তরশুদ্ধি হবে। যেদিন বহিরাচারে প্রাণের স্ফুরণ নেই দেখবে, সেদিন নির্ম্মমভাবে তাকে চুরমার করে ফেলবে।”

কিন্তু খ্রীষ্ট্‌মাসের দিন সেণ্টপিটাসে´ ‘হাই মাস্’-এর বিরাট অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি অস্থিরভাবে সেভিয়ার-দম্পতির কানে কানে বলিলেন, “এত প্রকাণ্ড কাণ্ড কিসের জন্য? যারা এত বেশভূষা চাকচিক্য নিয়ে রয়েছে, তারা কি বাস্তবিক সন্ন্যাসী ঈশার—যাঁর নিজের মাথা গুঁজিবার জায়গা ছিল না—ভক্ত হতে পারে?”

ক্যাথলিকদিগের এই বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তা হইতে বেদান্তবাদীর সন্ন্যাস যে কত মহত্তর তাহা তিনি এ সময়ে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন।

শীতের সময়ে বিশেষতঃ খ্রীষ্ট্‌মাসের সময় রোম বড় চমৎকার স্থান। তাহার উপর আবার তখন সেখানকার বাতাস খ্রীষ্টভাবে পরিপূর্ণ। স্বামীজি বালক খ্রীষ্টের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাহিনীর সহিত তাঁহার তুলনা করিতে লাগিলেন।

রোম হইতে তিনি নেপল্‌সে গমন করিলেন। এখান হইতে জাহাজে উঠিবার কথা। কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে দেরী আছে বলিয়া তিনি নগর-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন বিষুবিয়স পর্ব্বত দেখিতে গেলেন। এইখানে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ গিরিমধ্য হইতে রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড

ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখিলেন। তারপর আর একদিন ভূপ্রোথিত পম্পে নগরী দেখিতে গেলেন। সেখানে খনিত গৃহদ্বার, উৎস ও ভাস্কর্য্যাদি দেখিয়া তিনি বড় প্রীত হইলেন এবং তত্রত্য অনেক ধর্ম্মপ্রতীকের সহিত ৺পুরীর মন্দিরগাত্রে খোদিত মূর্ত্তিসমূহের সাদৃশ্য দেখিলেন।

অবশেষে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে নেপল্‌স হইতে জাহাজ ছাড়িল। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী এই জাহাজের কলম্বো পৌঁছিবার কথা ছিল।

ভূমধ্যসাগরে নেপ্‌ল্‌স ও পোর্টসৈয়দের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্বামীজি একটি অপরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে শয়নের পর তিনি দেখিলেন, যেন একজন ঋষিতুল্য পকশ্মশ্রু বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "তুমি এক্ষণে ক্রীট দ্বীপের সন্নিকটে আসিয়াছ। এই স্থান হইতেই প্রথম খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।" স্বামীজি আরও শুনিলেন, "এখানে থেরাপুটি বলিয়া যে একটি সম্প্রদায় বাস করিত আমি তাহাদেরই একজন" —তিনি আরও একটি কি কথা বলিয়াছিলেন তাহা পরে স্বামীজির বিশেষ স্মরণ ছিল না। তবে বোধ হয় কথাটি 'এসেনী'। শুনা যায় যীশুখ্রীষ্ট নাকি এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকটা সন্ন্যাসীর মত ছিলেন, উদার ধর্ম্মমত পোষণ করিতেন এবং তাঁহাদিগের দর্শন সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতভাবের অনুযায়ী ছিল। 'থেরাপুত্ত' শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহ 'থেরার শিষ্য বা অপত্য'। থেরা বলিতে বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে বুঝাইত আর পুত্ত সংস্কৃত 'পুত্র' শব্দেরই অপভ্রংশ। সেই ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি শেষে বলিলেন, "আমাদিগেরই প্রচারিত সত্যজ্ঞান ও ধর্ম্মাদর্শ খ্রীষ্টানেরা যীশু-উপদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছে। কিন্তু জানিও প্রকৃতপক্ষে যীশু বলিয়া কোন ব্যক্তি অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই।" বৃদ্ধ ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আরও বলিলেন, "এই স্থানের ভূগর্ভ খনন

করিলে আমার কথার যথার্থতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে।" স্বামীজির নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি তাড়াতাড়ি ডেকে ছুটিয়া গেলেন। জাহাজের একজন কর্ম্মচারীর সহিত দেখা হওয়াতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি কত?" "বারটা।" "আমরা কোন্ স্থানে আসিয়াছি?" "ক্রীট দ্বীপ হইতে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে।"

স্বামীজি স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির উক্তির সহিত এই অত্যাশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যীশুখ্রীষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ইতঃপূর্ব্বে কখনও সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার মনে হইল যে, খ্রীষ্ট অপেক্ষা খ্রীষ্টশিষ্য দলেরই ঐতিহাসিক সত্যতা অকাট্য। 'সুসমাচার' অপেক্ষা 'প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণ' আরও প্রাচীন গ্রন্থ, এ কথার অর্থ কি তাহাও তিনি এক্ষণে বুঝিলেন এবং তাঁহার মনে হইল যে, থেরাপিউটি ও ন্যাজারৎ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের মিশ্রণ হইতেই খ্রীষ্টধর্ম্মের দার্শনিক ভাগ ও 'খ্রীষ্ট' বলিয়া ব্যক্তিটি উদ্ভুত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন দৃঢ় প্রমাণ না পাওয়াতে তিনি এ-সকল গবেষণা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তবে প্রাচীনকালে আলেকজান্দ্রিয়া যে ভারতীয় ও মিশরীয় ভাবের মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহার প্রভাব যে বহুল পরিমাণে খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। স্বামীজি বিলাতে তাঁহার এক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইংরেজ বন্ধুর নিকট এই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং ইহাতে কোন সত্য নিহিত আছে কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। স্বামীজির দেহত্যাগের কিছু পরে কলিকাতার 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় একটি টেলিগ্রাম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত হইয়াছিল যে ক্রীট দ্বীপ খনন করিতে করিতে কয়েক জন ইংরেজ খ্রীষ্টধর্ম্মের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক বোধ হয় জানেন যে ক্রীট

দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতা আসীরীয় ও বাবিলনীয় সভ্যতার সমকালবর্ত্তী বলিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে (Vide Harmsworth's History of the World, Vol. III)।

ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। স্বামীজি বেশ প্রফুল্ল ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সতরঞ্চ খেলায় দিন কাটাইতেন। এই খেলায় তিনি বাল্যাবধি সিদ্ধ ছিলেন, সুতরাং এই অবসরে তাহা বেশ চলিল। এডেন হইতে কলম্বোর মধ্যে কেবল একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। দু'জন বিদেশী যুবক তাঁহার সহিত কথা-প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভেদ সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করে। তিনি এইরূপ কথোপকথনে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাহারা নিজেরাই তাঁহাকে জোর করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত করায়। তিনি জানিতেন না যে, তাহারা দুজনেই খ্রীষ্টীয় মিশনরি। ক্রমে তাহাদের গোঁড়ামি ও গায়ের জোরে তর্কের দৌড় দেখিয়া তিনি প্রত্যুত্তরচ্ছলে তাহাদিগকে কতকগুলি সামান্য সামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা সদুত্তর-দানে অসমর্থ হইয়া এবং প্রতিপদে পরাজিত হইয়া আপনাদিগের হাস্যাস্পদ অবস্থা বুঝিতে পারিল; ক্রমশঃ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা খুশী বলিতে আরম্ভ করিল এবং হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মকে যৎপরোনাস্তি গালি প্রদান করিল। অবশেষে স্বামীজি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সহসা উঠিয়া তাহাদের একজনের কাছে গেলেন এবং সিংহবিক্রমে তাহার কণ্ঠদেশ ধরিয়া রহস্যপূর্ণ ভীতিজনক স্বরে বলিলেন, "যদি পুনরায় আমার ধর্ম্মের নিন্দা বা গ্লানি কর, তবে জাহাজ হইতে জলে ফেলিয়া দিব।" স্বামীজির সেই স্থির অচঞ্চল মূর্ত্তি ও বজ্রবৎ দৃঢ়মুষ্টি দেখিয়া পাদ্রীপুঙ্গব নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া মেষশিশুবৎ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "মহাশয়, এবার ছাড়িয়া দিন, আর কখনও ওরূপ করিব না।" ইহার পর হইতে সে

ব্যক্তি স্বামীজির সহিত অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত বাক্যালাপ করিত এবং নানাপ্রকারে তাঁহার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিত।

স্বামীজি স্বদেশ, স্বজাতি বা স্বধর্ম্মের অযথা নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেন না। কলিকাতায় তিনি একবার প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা সিংহ, যদি কেউ তোমার মাকে অপমান করে তাহলে তুমি কি কর?" সিংহ মহাশয় বলিলেন, "তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিই।" স্বামীজি বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ কথা। যদি তোমার ধর্ম্মের প্রতি ঠিক সেই রকম অচলা ভক্তি থাকে, তাহলে তুমি কখনও একটি হিন্দুর ছেলেকে খৃষ্টান হতে দেখতে পারতে না। কিন্তু দেখ, রোজ এ ঘটনা ঘটছে। অথচ তোমরা নীরব রয়েছ। বাপু, তোমাদের বিশ্বাস কই? দেশের প্রতি মমতা কই? মুখের উপর প্রত্যহ পাদরীরা তোমাদের ধর্ম্মকে অসংখ্য গাল দিচ্ছে। কিন্তু কয়জন লোকের রক্ত যথার্থ অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে গরম হচ্ছে?"

এডেনে আর একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে আমরা স্বামীজির বালসুলভ সরলতা ও নিরহঙ্কারিতার পরিচয় পাই। স্বদেশ ও স্বধর্ম্মকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহা বলিয়া পৃথিবীর অপর সকলকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। সকলকেই তিনি আপনার মনে করিতেন, তবে অন্যায় দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সে যেই হউক না কেন। বিদেশীয়ের নিকট তিনি ভারতের গুণ ব্যাখ্যা করিতেন, কারণ তিনি দেখিতেন যে তাহারা কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করে, গুণ দেখিতে পায় না। তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখে ভারতের প্রকৃত মহত্ত্ব যেখানে সেই স্থানটি তিনি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেন। স্বজাতির নিকট তিনি তাহাদিগের দোষ দেখাইতেন, কারণ তাহারা আপনাদের গুণ-কীর্ত্তনে সহস্রমুখ অথচ দোষ কোন্‌খানে তাহা খুঁজিয়া পায় না। ইহা

জাতীয় উন্নতির পথে বিষম অন্তরায়। সেইজন্ম তিনি ভারতবাসীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বারংবার তাহাদিগের ভ্রম দেখাইয়া গিয়াছেন। এই কথাটি বেশ করিয়া বুঝা আবশ্যক, নতুবা স্বামীজির অদ্ভুত চরিত্র সকলের বোধগম্য হইবে না। পাদ্রীদিগের বিদ্বেষ তিনি সহ্য করেন নাই, কিন্তু সামান্য পানওয়ালার সহিত একত্র বসিতে তাঁহার কোন দ্বিধাবোধ হয় নাই। কারণ তাঁহার মনে অভিমান ছিল না। এডেনের এই ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য। এডেনে নামিয়া তিনি এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে সমুদ্রকূল হইতে তিন মাইল দূরবর্তী কতকগুলি বৃহৎ সরোবর বা জলাশয় দেখিতে গেলেন। সেখানে একজন ভারতবাসীকে দেখিতে পাইয়া তিনি ইংরেজদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতপদে তাহার নিকট গমন করিলেন এবং মহানন্দে গল্প জুড়িয়া দিলেন। লোকটি একটি হিন্দুস্থানী পানওয়ালা। ইতোমধ্যে তাঁহার ইংরেজ বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে একটা সামান্য লোকের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া মনে করিলেন এ লোকটা কে? কিন্তু যখন দেখিলেন, স্বামীজি সেই অপরিচিত ব্যক্তির নিকট ঠিক বালকের মত 'ভেইয়া তোমরা ছিলমঠো দো' বলিয়া কলিকা লইয়া টানিতে টানিতে মহা স্ফূর্ত্তিভরে ধূম ত্যাগ করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলেন এ আর কিছু নহে, তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততার একটি নিদর্শন মাত্র। সেভিয়ার সাহেব ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ওঃ বুঝেছি, এ জন্যই বুঝি আপনি আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন?" পানওয়ালা এক্ষণে নিজ অতিথির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল এবং চরণধূলি গ্রহণ করিল।

পথে আর বিশেষ কিছু ঘটে নাই। কেবল একটি জাহাজের খাদ্য ও জল নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতে তাহার অধ্যক্ষ সাহায্য-প্রার্থনা-উদ্দেশে বিপদ্-নিশান উড্ডীন করিয়াছিল। একটি নৌকাযোগে সেখানে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রেরিত হইল।

১৫ই জানুয়ারী ‘তমালতালীবনরাজিনীলা’ সিংহলের তীরভূমি দূর হইতে নেত্রপথে পতিত হইল। চতুর্দ্দিক নবোদিত সূর্য্যের রক্তকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে, এমন সময়ে জাহাজ ধীরে ধীরে কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করিল। স্বামীজি হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ‘এই আমার ভারতবর্ষ! এই সেই জননীর স্নেহক্রোড়—যাহা ছাড়িয়া এতদিন দেশে দেশে ঘুরিতেছি’— এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়নযুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। তখন জানিতেন না, সমগ্র ভারতের লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য এবং প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একজন গুরুভাই সিংহলে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আরও অনেকেই পথে আসিতেছিলেন এবং মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল।

সিংহলে

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। তিন বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল যাবৎ ভারতবাসী পশ্চিম জগতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আসিতেছিল এবং ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এতদিন তাহারা উদাসীন ছিল, এখন তাহা নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মের প্রচারককেও আদর করিতে শিখিল। বস্তুতঃ, দেশের সেই দুর্দ্দিনে স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে সনাতনধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ না করিলে দেশের দুর্দ্দশা আরও যে কত ভীষণাকার ধারণ করিত তাহা স্মরণ করিতেও চিত্ত কণ্টকিত হইয়া উঠে। তিনিই এই নবযুগের প্রবর্ত্তক অরুণোদয়ের শুকতারা। তিনি মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্মে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন এবং দিগভ্রষ্ট ভারতসন্তানকে প্রকৃত লক্ষ্যাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছেন। অন্ধ পরানুকরণপ্রিয় ভারতবাসী প্রাচীন আদর্শ হারাইয়া ক্রমশঃ বিজাতীয় রীতি-নীতির অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল এবং আপনাদিগের সর্ব্ববিধ সৎ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান পদদলিত করিতেছিল। কিন্তু নিরর্থক অনাদরের পেষণে চূর্ণ হইয়া এই সকল চিরন্তন সুপ্রথা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ভারতের ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া বিবেকানন্দের বিবেক-বাণীতে তাহাদের চেতনা-সম্পাদন ও চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখাইলেন, তাহাদের শ্রেয়ঃ কি। লোকে তাঁহার কথা শুনিল ও যন্ত্রচালিতবৎ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই ভগবান একদিন কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ হইতে এক চির অমর আত্মার শুভ্র নির্ম্মল প্রেম-পরিমলে ভারতগগন সুরভিত করিয়াছিলেন, আবার এই ভগবানই আর একদিন জ্ঞানের

খরস্রোতে উজান বহাইয়া তুঙ্গভদ্রার তীর হইতে আসমুদ্র হিমাচল প্লাবিত করিয়া বৌদ্ধ ভারতের বিষাক্ত বায়ু পরিশোধিত এবং তন্ত্রমন্ত্রের পঙ্কিল আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেদিনও তাই তিনি পাশ্চাত্যের মোহস্বপ্নে অভিভূত ভারতবাসীকে বিবেকানন্দের ভৈরব রুদ্র-নাদে জাগাইয়া তুলিলেন। যে এই বীরকণ্ঠের নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়াছে সেই মজিয়াছে। সেই বুঝিয়াছে, এ কণ্ঠ যাঁহারই হউক তিনি যে আমাদের পরম আত্মীয় ও শুভাকাঙ্ক্ষী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বড় আদরের ও যত্নের ধন। তিনি দুঃখিনী ভারত-মাতার একনিষ্ঠ বীরসন্তান এবং চিরলাঞ্ছিত আর্য্যজাতির কুলতিলক। তিনি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুদ্দীপ্তি, নিরাশায় আশা, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের হাস্যরেখা, দরিদ্রের 'সাগরছেঁচা' মানিক। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি তাঁহার নিকট চিরঋণী, কারণ তিনি এই নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখাকে পুনঃ প্রদীপ্ত করিয়া যুগব্যাপী অমানিশা দূরীভূত করিয়াছেন এবং বেদান্তবিদ্যাকে কুটীর-বাসীর জীর্ণকন্থার আবরণ হইতে বিমুক্ত করিয়া বিজ্ঞানবলদর্পিত পাশ্চাত্ত্য সভ্যসমাজের রাজসিংহাসনে ভারতীয় সভ্যতার মুকুটমণি বলিয়া সগৌরবে স্থান দান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তি নহে। তিনি নব্য ভারতের ঋষি ও আচার্য্য, স্বদেশপ্রেম-মন্ত্রের সাধক ও উপদেষ্টা; তিনি জটিল ভারতসমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদিগের ইষ্ট ও ইষ্টলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এ কথা তখনই লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই জন্য তিনি সিংহলে পদার্পণ করিবামাত্র সমস্ত ভারতবাসী তাঁহাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতিসহযোগে পূজা করিবার জন্য সমুৎসুক হইল।

কলিকাতা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের এবং সিংহলের নানাস্থানে তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য বিরাট আয়োজন হইতেছিল। স্বামীজি অবশ্য

এসকল কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি নর্থ জার্ম্মান লয়েড লাইনের 'প্রিন্স রিজেন্ট লিওপোল্ড' নামক জাহাজে স্থিতধী যোগীর ন্যায় বসিয়াছিলেন এবং কি করিয়া ভারতের কল্যাণ ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইতে পারে, এই চিন্তায় অহোরাত্র নিমগ্ন ছিলেন। আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় ভারত যে অধঃপতনের কোন্ নিম্নতম স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, সুতরাং এই দেশ ও ইহার অধিবাসিগণকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা এক্ষণে দৃঢ়ভাবে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। এই চিন্তার প্রথম উৎপত্তি হয় আমেরিকাতে। ডেট্রয়েটে কয়েকজন শিষ্যের নিকট তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমাদের দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে আমায় প্রাণপাতী পরিশ্রম করিতে হইতেছে। আমার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ এইখানেই কাটিল। অথচ যে দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম এত প্রবল সেখানে কত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে হইতেছে— দেখিতেছ। কিন্তু এ দেশের লোকের নিকট আমার কার্য্যের মূল্য কতটুকু, আর ইহার কতটুকুই বা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্য্যের প্রকৃত আদর হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের লোক আমার নিজের দেশের লোক। তাহারা বুঝিবে যে কি রত্ন আমি শরীরের রক্ত জল করিয়া এখানে ছড়াইয়া যাইতেছি! এই রত্নের— এই অপরূপ বেদান্তবিদ্যার সম্পূর্ণ সমাদর শুধু সেই দেশেই সম্ভব। আর হইবেও তাহাই। কিছু দিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের মূলগ্রন্থি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিবে, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলিয়া লইবে।"

এখন তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে চলিল। উপরোক্ত কথাগুলি কেহ যেন আত্মাভিমান-প্রসূত বলিয়া মনে না করেন, কারণ তিনি কখনও

নিজের জন্য বিন্দুমাত্র সম্মান চাহিতেন না বা একটা গুরুতর কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মূঢ়ের ন্যায় স্পর্দ্ধাও করিতেন না। ঐ কথাগুলি কেবল বেদধর্ম্ম ও বেদান্তের প্রতি অবিচলা শ্রদ্ধা সূচনা করিতেছে। তিনি জানিতেন বটে, ইহা জগতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতেন যে, ভারত ব্যতীত আর কোথাও ইহার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা ও মর্ম্ম পরিগ্রহ করিবার উপযুক্ত লোক নাই। তাঁহার আরও বিশ্বাস ছিল, এই বেদান্তপ্রচারের জন্যই তাঁহার জন্মধারণ।

সুতরাং ১৫ই জানুয়ারী (১৮৯৭) কলম্বোতে জাহাজ পৌঁছিবামাত্র ঘাটে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিশাল জন-সমবায় দেখিয়া তিনি বড় বেশী আশ্চর্য্য হইলেন না। কলম্বোর হিন্দুসমাজ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইজন সভ্য—নিরঞ্জনানন্দ নামে স্বামীজির একজন গুরুভাই ও হ্যারিসন নামক কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাহেব জাহাজে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৈরিকবসনধারী ভাস্বরলোচন স্বামী বিবেকানন্দ অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে চতুর্দ্দিকের আনন্দকোলাহল ও উচ্চ করতালিধ্বনিতে সাগরগর্জ্জনও অস্ফুট হইয়া গেল। তাঁহাকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই একখানি ষ্টিমলঞ্চ প্রস্তুত ছিল। যখন ষ্টিমলঞ্চে করিয়া স্বামীজি কিনারায় পৌঁছিলেন, তখন দেখা গেল সহস্র সহস্র হিন্দুর ভিড়—সকলেই স্বামীজির দর্শনলাভ ও অভ্যর্থনার্থ সমবেত। সে বিশাল জনস্রোত রোধ করে কাহার সাধ্য! লোকে আহ্লাদের আবেগে টুপি, ছাতা, লাঠি, রুমাল প্রভৃতি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় পি. কুমারস্বামী মহোদয় ও তাঁহার ভ্রাতা অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং একটি সুন্দর যূথিকামাল্য দ্বারা তাঁহার গলদেশ সুশোভিত করিলেন।

তাহার পর তথা হইতে তাঁহাকে একখানি প্রকাণ্ড জুড়িতে করিয়া বার্ণেস ষ্ট্রীট নামক রাস্তায় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাংলায় লইয়া যাওয়া হইল। এই রাস্তাটি কলম্বোর প্রান্তভাগে অবস্থিত, কলম্বোর যে বিখ্যাত দারুচিনিবাগান আছে তথা হইতে সিকি মাইল। এই দারুচিনিবাগানের মধ্যেই স্বামীজির থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বার্ণেস ষ্ট্রীটের আরম্ভস্থলে নারিকেলশাখা ও পত্রপুষ্প-শোভিত একটি অতি সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তদুপরি মঙ্গলাভ্যর্থনাসূচক পদাবলী শোভা পাইতেছিল। ঐ রাস্তা হইতে বাংলো পর্য্যন্ত কুসুমমালিকাবেষ্টিত তালপত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। স্বামীজির পশ্চাৎ পশ্চাৎ শহরে যত গাড়ী ছিল সবগুলিতে এবং পরিশেষে পদব্রজে বহুসংখ্যক লোক সভাস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। বাংলার প্রবেশমুখে তাল ও চিরহরিৎ পত্রদ্বারা আর একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তোরণ অতি মনোহরভাবে সাজান হইয়াছিল। স্বামীজি যান হইতে অবতরণ করিবামাত্র ধ্বজ, ছত্র, চামর ও পুষ্পাদিতে পরিবৃত হইয়া শ্বেতবস্ত্রাস্তীর্ণ পথের উপর দিয়া বাংলার সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন কনসার্টে প্রাণ উদাস করিয়া একটি ভারতীয় গৎ বাজিতেছিল।

স্বামীজি মঞ্চোপরি পদার্পণ করিবামাত্র শিল্পিকৌশলরচিত একটি সুন্দর কমলের দল সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া তন্মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী নির্গত হইয়া ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। অনন্তর তিনি আসনপরিগ্রহ করিলে চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার মস্তকোপরি অজস্র পুষ্পবর্ষণ আরম্ভ হইল। অনেকে তাঁহাকে দেখিবার আগ্রহে অনেক স্থানের সাজসজ্জা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিঞ্চিৎ পরে জনতা একটু স্থির হইলে জনৈক গায়ক বেহালাসহযোগে দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন 'তেবরম্'-এর কয়েকটি স্তোত্র গাহিলেন। পরে একটি সংস্কৃত স্তোত্রও আবৃত্তি করা হইল। অনন্তর মাননীয় পি. কুমার-

স্বামী মহাশয় স্বামীজির সম্মুখে আসিয়া এদেশীয় প্রথায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ইংরেজীতে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। এই অভিনন্দনপত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, সিংহলবাসীরা যে স্বামীজির ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের পর সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন এবং পাশ্চাত্ত্যদেশবাসীর সমক্ষে তাঁহার সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের ভাবপ্রচারকার্য্যে পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামীজি অভিনন্দনপত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে পারিলেন না। সংক্ষেপে বলিলেন—"আপনাদের অভিনন্দনে আমি পরম আনন্দিত। একটি ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে যেভাবে আজ সম্বর্দ্ধনা করা হইল ইহাতে ভারতের লোক কিরূপ ধর্ম্মপ্রিয় তাহা স্পষ্টই বুঝাইতেছে। আমি রাজা নহি, অতিশয় ধনবান নহি বা যুদ্ধজয়ী সেনাপতিও নহি, তথাপি আজ আপনাদের মধ্যে অনেক পার্থিবসম্পদশালী ব্যক্তি আমায় সমাদর করিলেন। ইহাই ধর্ম্মপ্রাণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কারণ এ সম্মান আমার নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি নীতির প্রতি সম্মান। নীতিটি এই—ধর্ম্মের জন্য যিনি পরিশ্রম করেন তিনি পূজার্হ। আর বাস্তবিকই যদি হিন্দুজাতিকে বাঁচিতে হয় তবে এই ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিতে হইবে। ধর্ম্মই তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ।"

পরদিন শনিবার। ঐ বাংলায় স্বামীজিকে দর্শন করিবার জন্য ধনী দরিদ্র নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তিনিও ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ ও সকলের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। একটি দরিদ্রা রমণীর স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফলমূল-উপহার হস্তে স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বামীজিকে ঈশ্বরলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে ভগবদ্গীতা পাঠ এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য যথোচিত পালন করিতে উপদেশ দিলেন। রমণী

বলিলেন, "গীতা না হয় পড়িলাম, কিন্তু যদি সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলাম তবে কি হইল?" উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত জনৈক দরিদ্র ভক্ত একদিন স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইলেন। কিন্তু স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্বামীজির সম্মুখে আসনপরিগ্রহ করিলেন না; স্বামীজি যতক্ষণ রহিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামীজির পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণ দরিদ্র হিন্দুগণেরও ঈশ্বরোপলব্ধি করিবার প্রবল আগ্রহ ও সাধুভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। স্বামীজির সম্মানার্থ এই বাংলার নাম 'বিবেকানন্দ-মন্দির' রাখা হইল।

ঐ দিন অপরাহ্লে 'ফ্লোরাল হল' নামক স্থানে একটি বৃহৎ জনমণ্ডলীর সম্মুখে স্বামীজি ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দেন। বিষয়—'পুণ্যভূমি ভারত'। এত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে হলে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার আরম্ভভাগ এইরূপ—

"যে সামান্য কার্য্য আমাদ্বারা হইয়াছে তাহা আমার নিজের কোন অন্তর্নিহিত শক্তিবলে হয় নাই, পাশ্চাত্ত্যদেশে পর্য্যটনকালে এই পরম পবিত্র আমার প্রিয়তম মাতৃভূমি হইতে যে উৎসাহবাক্য, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্ব্বাণী লাভ করিয়াছি, উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্য কিছু কাজ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্ত্যদেশ-ভ্রমণে বিশেষ উপকার হইয়াছে আমার। কারণ পূর্ব্বে যাহা হয়ত হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম, এখন সে বিষয় আমার পক্ষে প্রামাণসিদ্ধ সত্য বলিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম ভারত পুণ্যভূমি— কর্ম্ম-ভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু আজ আমি এই সভার সমক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি— ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে

যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, যদি এমন কোন স্থান থাকে যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্ম্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে, যদি এমন কোন স্থান থাকে যেখানে ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে, যদি এমন কোন স্থান থাকে যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তি, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে, যদি এমন দেশ থাকে যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে—তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতনধর্ম্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্ব্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপরদেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্ব্বাণ করিতে যে অমৃতসলিলের প্রয়োজন তাহা এখানেই বর্ত্তমান। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।"

পরদিনও বহু লোক স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনিও সকলকে মধুর উপদেশদানে তৃপ্ত করিলেন। সন্ধ্যার সময়ে স্বামীজি দেবদর্শনার্থ এক স্থানীয় শিব-মন্দিরে গমন করিলেন। সেখানেও অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগমন করিল, আর ক্রমাগত পথের মধ্যে গাড়ী থামাইয়া তাঁহাকে নানাবিধ ফলপুষ্পাদি উপহার এবং গলায় মালা ও অঙ্গে গোলাপজল ছিটাইয়া দিতে লাগিল। স্থানীয় প্রথানুসারে তাঁহার সম্মানার্থ প্রতি হিন্দু গৃহস্থের দ্বারদেশ, বিশেষতঃ কলম্বোর তামিলপল্লীর মধ্যভাগে অবস্থিত চেকু ষ্ট্রীটের প্রত্যেক গৃহদ্বার দীপসজ্জা ও নারিকেল কদলী প্রভৃতি মাঙ্গলিক

ফলরাশি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। তিনি মন্দিরদ্বারে উপনীত হইবামাত্র সমাগত জনগণ 'জয় মহাদেব' ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। বিগ্রহদর্শন ও মন্দিরের পুরোহিতদিগের সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্বামীজি পুনরায় নিজ বাংলায় ফিরিলেন। সেখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি আড়াইটা বাজিয়া গেল।

পরদিন অর্থাৎ সোমবার তিনি মিঃ চিলিয়ার বাটীতে নীত হইলেন। সেখানে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার দর্শনপ্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল এবং তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা ফুলের উপর ফুল ও মালার উপর মালা দিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। তাঁহার বসিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র গঙ্গাজল-পরিশুদ্ধ আসন ছিল। তিনি সকলকে বিভূতি বিতরণ করিতে লাগিলেন, তারপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন ও ভক্তিভরে করযোড়ে তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে সঙ্গীত ও জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

ঐ দিবস কলম্বোর পাব্লিক হল বা সাধারণ সভাগৃহে স্বামীজি তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন। এই দিন তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বলেন এবং বেদাদিসম্মত এই ধর্ম্মভাবই একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে গ্রাহ্য হইবার যোগ্য বলিয়া নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। বক্তৃতাকালে সভাস্থলে কয়েকজন সিংহলবাসীর ইউরোপীয় পরিচ্ছদদর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি বলিলেন যে, এরূপ অন্ধ অনুকরণ অতীব হেয়, বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতের পক্ষে অচল। কালা চেহারায় ওসব মোটে মানায় না। তিনি কোন পরিচ্ছদ-বিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই, কেবল বিদেশীয়ের অনুকরণপ্রবৃত্তির প্রতি অনুযোগ করিয়াছিলেন।

কলম্বো হইতে স্বামীজির জাহাজে করিয়া মাদ্রাজে যাইবার সংকল্প ছিল। কিন্তু সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন শহর হইতে ক্রমাগত তার আসিতে লাগিল—'আপনি একবার মাত্র এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।' সকলের অনুরোধে স্বামীজি তাঁহার পূর্ব্ব অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্থলপথে ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং ১৯শে মঙ্গলবার প্রাতঃকালে স্পেশাল সেলুনে কাণ্ডি যাত্রা করিলেন।

কাণ্ডি সিংহলের প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। রেলওয়ে ষ্টেশনে বহুসংখ্যক ব্যক্তি স্বামীজির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি পৌঁছিবা-মাত্র তাঁহারা মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও দেবমন্দিরচিহ্নিত পতাকা, জয়ধ্বনি ও বাদ্যনাদসহকারে তাঁহাকে একটি বাংলায় লইয়া গিয়া এক মনোহর অভিনন্দন প্রদান করিলেন। অভিনন্দনের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও শহরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শনের পর স্বামীজি কাণ্ডি পরিত্যাগ করিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যার সময়ে মাতালে নামক স্থানে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রায় দুইশত মাইল দূরবর্ত্তী জাফনাভিমুখে যাত্রা করা হইল। বড় মজার যাত্রা!—২০০ মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে! এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভুবন-মনোহর। পথের উভয় পার্শ্ব শস্যশ্যামোজ্জ্বল শোভা বিস্তার করিয়া পথিকগণের প্রাণ ভুলাইতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ডাম্বুল নামক স্থানের কয়েক মাইল পরেই পাহাড় হইতে নামিবার সময় গাড়ীর সম্মুখভাগের একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রাস্তায় তিন ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইল। অনেকক্ষণ পরে অতি কষ্টে এক দূর গ্রাম হইতে একটি গোযান সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সেভিয়ারপত্নীর স্থান করা হইল এবং মালপত্র চালান গেল। স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গীরা কয়েক মাইল হাঁটিয়া চলিলেন। তারপর আবার গরুর গাড়ীর যোগাড় হইল এবং রাত্রিটা

তাহাতেই কাটাইয়া কানাহাড়ি ও তিনপানি হইয়া ৮ ঘণ্টা পরে সকলে ধীরে ধীরে অনুরাধাপুরে পৌঁছিলেন।

অনুরাধাপুর পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি প্রাচান এবং বৃহত্তম ভূপ্রোথিত নগর। ইহার মধ্যে এত অসংখ্য মন্দির ও মঠের ধ্বংসাবশেষ আছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহার অবস্থা ভাল ছিল তখন পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্প শহরই সমৃদ্ধিতে ইহার সমকক্ষ ছিল। এখানে বৌদ্ধযুগের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান, যথা—বোধগয়াস্থিত মহাবোধিতরুর শাখাসঞ্জাত একটি পবিত্র অশ্বত্থবৃক্ষ (জনরব এইরূপ যে ২৪৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইহা রোপিত হয়), সেই সুদূর অতীত যুগের স্থাপত্যবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ এক প্রাচীন সরোবর এবং 'দাগোবা' নামে বিখ্যাত কতকগুলি প্রাচীন স্তূপ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধানফলে যেসকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে তামিলগণ কর্ত্তৃক সিংহল-আক্রমণের পর হইতে এই সকল দাগোবার মধ্যে পূর্ব্বকালীন বৌদ্ধমন্দিরনিহিত রাশি রাশি মণি মুক্তা হীরা জহরৎ গুপ্তভাবে রক্ষিত রহিয়াছে। স্বামীজি এবং তাঁহার সহচরগণের অবস্থানের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্নিকটে এক সহস্র ছয় শত গ্রাণাইট প্রস্তরের স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি ২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ নবতল পিত্তল-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। এক সময়ে এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে শুধু পুরোহিতদিগের জন্যই এক সহস্র শয়নপ্রকোষ্ঠ ছিল, তাহা ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে আরও বহু কক্ষ ছিল। ইহার ছাদ ছিল পিত্তলের এবং বৃহৎ সভাগৃহটি সিংহশিরোপরি অবস্থিত অনেকগুলি সুবর্ণ স্তম্ভে সুসজ্জিত ছিল। তাহার মধ্যভাগে একটি দ্বিরদ-রদনির্ম্মিত সিংহাসন ও একপার্শ্বে একটি কনকখচিত সূর্য্য ও অপর পার্শ্বে একটি রজতময় চন্দ্রমা বিরাজিত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থবৃক্ষতলে স্বামীজি দুই-তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'উপাসনা' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। তিনি ইংরেজিতে বলিতে লাগিলেন আর দ্বিভাষিগণ সঙ্গে সঙ্গে তাহা তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে অসার পূজাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বেদবিহিত মার্গের প্রতি মনোযোগী হইতে উপদেশ দিলেন। এই পর্য্যন্ত বলিবার পর দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহস্থ সেখানে সমবেত হইয়া ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি বাজাইয়া এমন বীভৎস শব্দ আরম্ভ করিল যে স্বামীজি থামিতে বাধ্য হইলেন। তিনি না থাকিলে এবং হিন্দুদিগকে ধৈর্য্যসহকারে সহ্য করিবার উপদেশ না দিলে সেদিন ওখানে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব হইত। কিন্তু তিনি ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমত্ব বুঝাইয়া দিয়া এই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান স্থানে বলিলেন, "ধর্ম্মের গোঁড়ামি এবং তাহা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করা নিতান্ত অজ্ঞানতার পরিচায়ক। ভগবানকে শিব বিষ্ণু বা বুদ্ধ যে নামেই পূজা কর না কেন, তিনি এক ব্যতীত দুই নহেন, সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি থাকা অত্যাবশ্যক।"

অনুরাধাপুর হইতে জাফনা ১২০ মাইল। কিন্তু রাস্তা ও ঘোড়া উভয়েরই অবস্থা শোচনীয় বলিয়া অতি কষ্টে যাইতে হইল। কেবল পথের মনোলোভা শোভায় এই কষ্ট তত গায়ে লাগিল না। যাহা হউক, পথে দুই রাত্রি কাহারও নিদ্রা হয় নাই। মধ্যে ভাভোনিয়া নামক স্থানের হিন্দু অধিবাসিগণ স্বামীজিকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। ইঁহারা স্বামীজির দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিয়াছিলেন। স্বামীজির মধুর স্বভাব, উদার ভাব ও নিঃস্বার্থতা দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বামীজি সংক্ষেপে এই অভিনন্দনের উত্তর দিয়া সিংহলের সুন্দর বনময় প্রদেশ দিয়া জাফনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে সিংহল ও জাফনাদ্বীপের সংযোগসেতু 'হস্তিগিরিবত্মে' স্বামীজিকে এক অভ্যর্থনা প্রদত্ত হইল। জাফনা শহর হইতে ১২ মাইল অগ্রে উক্ত শহরের সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য এক শত হিন্দু ভদ্রলোক যানাদি সহিত স্বামীজির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশিষ্ট পথ তাঁহারা স্বামীজিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। শহরের প্রত্যেক পথ ও গৃহ তাঁহার আগমনোপলক্ষে নানারূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সায়ংকালে যখন সারবন্দী মশালের আলো জ্বলিয়া স্বামীজিকে হিন্দুকলেজের প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সে দৃশ্য অতি হৃদয়গ্রাহী হইল। এই স্থানে এক বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করা হইল— সমবেত লোকসংখ্যা অন্যূন দশ হইতে পনর সহস্র হইবে। সেদিন রবিবার ২৪শে জানুয়ারী। স্বামীজি শকট হইতে অবতরণ করিয়া শিবান ও কাথিরসান মন্দিরে পূজা করিলেন এবং মন্দিরস্বামী কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যভূষিত হইলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। মণ্ডপে প্রবেশকালে ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস্ চলপ্পপিলে স্বামীজিকে মঞ্চোপরি লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কণ্ঠে পুষ্পমাল্য প্রদান করিলেন। অতঃপর অভিনন্দন পঠিত হইল এবং স্বামীজি তদুত্তরে একঘণ্টাকালব্যাপী একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিলেন। এই অভিনন্দন-পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—

"শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

জাফনাশহরাধিবাসী আমরা হিন্দুগণ সিংহলে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র-স্বরূপ এই স্থানে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। লঙ্কাদ্বীপের এই অংশে পদার্পণ করিবার জন্য আপনাকে যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম আপনি তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকার করাতে আমরা ধন্য হইয়াছি।

আপনি বেদে প্রকাশিত সত্যের আলোক শিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচার করিয়াছেন, সমগ্র পাশ্চাত্ত্যদেশবাসীকে হিন্দুধর্ম্মের সত্যসমূহ জানাইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা পাশ্চাত্ত্যদেশকে প্রাচ্যভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা এই সুযোগে আপনাকে আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আরও এই জড়বাদসর্ব্বস্ব যুগে যখন সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার হ্রাস ও আধ্যাত্মিক সত্যান্বেষণে লোকের অরুচি, এই ঘোর দুর্দ্দিনে আপনি যে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমাদের বহুতর ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ইত্যাদি…"

পরদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় তিনি হিন্দু কলেজে প্রায় চারি হাজার ব্যক্তির সমক্ষে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতাশ্রবণে সভাস্থ সমুদয় লোকের অন্তঃকরণে তড়িৎপ্রবাহ বহিয়াছিল। স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হইলে সেভিয়ার সাহেব সমবেত জনমণ্ডলীর অনুরোধে তাঁহার হিন্দুধর্ম্মগ্রহণের কারণ ও স্বামীজির সহিত ভারতবর্ষে আসার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন।

জাফনাতেই স্বামীজির সিংহলভ্রমণ শেষ হইল। কলম্বো হইতে জাফনা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সিংহলবাসীরা তাঁহার প্রতি এত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিল এবং এরূপ উৎসাহসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। সিংহলদেশে পূর্ব্বে কেহই স্বামীজির পরিচয় জানিত না, তারপর বড় বড় শহর হইতে দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের এমন সুবিধা নাই যাহাতে স্বামীজির আগমনবার্ত্তা সহজে সর্ব্বসাধারণের গোচর হওয়া সম্ভব। সুতরাং তাঁহার এই অভ্যর্থনা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিতে হইবে। এই অল্প কয় দিনেই সিংহলবাসীরা তাঁহাকে

চিনিতে পারিয়াছিল এবং রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ প্রচার করিবার জন্য তাঁহাকে এ দেশে লোক পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। আরও অনেক শহর ও সভাসমিতির পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণপত্র ও টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল, কিন্তু সময়াভাবে স্বামীজি সকলের অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। বিশেষতঃ এ কয় দিন অনবরত লোকসমাগমে তিনি কিছু ক্লান্ত ও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার একজন সঙ্গী লিখিয়াছেন—"তিনি যদি আর কিছু দিন সিংহলে থাকিতেন তাহা হইলে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগের চোটে মারা যাইতেন।"

দক্ষিণ ভারতে

অতঃপর স্বামীজির ইচ্ছানুসারে সিংহল হইতে ভারতবর্ষ যাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। জাফনা হইতে জলপথে ভারতবর্ষ পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী। একখানি দেশী জাহাজ ভাড়া করিয়া ২৫শে জানুয়ারী রাত্রি বারটার সময় স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণ রওনা হইলেন এবং বায়ু অনুকূল থাকাতে বড়ই আনন্দের সহিত সকলে ভারতাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই জাহাজ পাম্বানে পৌঁছিল। পাম্বান ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এখান হইতে রামনাদের রাজার অনুরোধরক্ষার্থ রামেশ্বর যাইবার কথা ছিল। কিন্তু স্বয়ং রামনাদাধিপতিই সদলবলে স্বামীজির অভ্যর্থনার্থ এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অপরাহ্ণে ষ্টিমার হইতে স্বামীজিকে নিজ রাজতরণীতে লইয়া গেলেন এবং পাত্রমিত্রসভাসদ্-গণের সহিত সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামীজি রাজার হাত ধরিয়া উঠাইলেন ও আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন। সন্ন্যাসী গুরু ও রাজশিষ্যের সে মিলন অতি প্রাণস্পর্শী দৃশ্য সৃজন করিল। স্বামীজির পাশ্চাত্ত্যদেশে গমনে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন রামনাদাধিপতি তাঁহাদের অন্যতম। সুতরাং এক্ষণে ভারতে পুনঃ পদার্পণের প্রথম সূত্র-পাতেই রামনাদরাজের সহিত সাক্ষাতে তিনি অতিশয় সুখী হইলেন। নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইবার পর পাম্বানবাসীরা স্বামীজিকে অতি সাদরে অভ্যর্থনা করিল। জেটির নিম্নেই এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ নানাবিধ পুষ্পপত্রে অতি সুন্দররূপে শোভিত হইয়াছিল। এই চন্দ্রাতপের নিম্নে পাম্বানবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নাগলিঙ্গম্ পিলে মহাশয় এক অভিনন্দন পাঠ করিলেন। অভিনন্দনে তাঁহারা স্বামীজিকে তাঁহাদের ধর্ম্মাচার্য্যরূপে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাশ্চাত্ত্যদেশে আপনার হিন্দুধর্ম্মপ্রচারে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে, এক্ষণে এই নিদ্রিত ভারতকে তাহার বহু দিনের অকালনিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হউন।" রাজাও হৃদয়াবেগে ব্যক্তিগতভাবে একটি স্বতন্ত্র অভিভাষণ দ্বারা স্বামীজির নিকট স্বকীয় মনোভাব নিবেদন করিলেন। স্বামীজিও যথাযোগ্য উত্তরপ্রদানে সকলকে প্রীত করিলেন। এইখানে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "ভারতের জাতীয় জীবন একমাত্র ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত—রাজনীতিচর্চ্চায়, যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিতায়, বাণিজ্যের উৎকর্ষে বা শিল্পসমৃদ্ধিতে নহে। ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন এবং জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। আর ইহাই পৃথিবীর নিকট আমাদের একমাত্র দেয়।"

সভার কার্য্য শেষ হইলে স্বামীজিকে রাজশকটে আরোহণ করাইয়া রাজা ও অমাত্যবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে রাজকীয় বাংলার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রাজার অভিপ্রায়ানুসারে শকটবাহী অশ্বদিগকে মুক্তি দিয়া সকলে মিলিয়া গাড়ী টানিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজাও তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। পাম্বানে স্বামীজি তিন দিন বড়ই আনন্দে কাটাইলেন। ঐ স্থানের এবং ইহার নিকটবর্ত্তী রামেশ্বরের অনেক অধিবাসী এই সময়ে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিবস স্বামীজি রামেশ্বরের মন্দিরদর্শনে যাত্রা করিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যে দিন শেষ এই রামেশ্বরে আসিয়াছিলেন, সে দিনের কথা আজ মনে পড়িল; সে দিন এ মহোৎসব কোথায় ছিল, যে দিন তিনি জীর্ণ-মলিন ভিক্ষুকের বেশে ক্ষীণ শ্রান্ত চরণে এই মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন! যাহা হউক, স্বামীজির গাড়ী যখন মন্দিরসন্নিধানে পৌঁছিল তখন এক বৃহতী জনতা হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা, দেশী সঙ্গীত এবং অন্যান্য

সম্মানের চিহ্ন লইয়া উপস্থিত হইল। মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর স্বামীজি ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিমাণিক্য ও হীরা জহরত প্রভৃতি রত্নাদি দেখান হইল। স্বামীজি সমস্ত মন্দিরটি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—তাঁহাকে মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্য ও স্থাপত্যকৌশলাদি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সহস্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনীটিও স্বামীজি দেখিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হইল। তখন সেই প্রাচীন শিবমন্দিরের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণতলে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি 'তীর্থমাহাত্ম্য ও উপাসনা' সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, শিবের অর্চ্চনা শুধু মন্দিরস্থ বিগ্রহের অর্চ্চনা নহে, কিন্তু দীন দরিদ্র আতুরের মধ্যে যে জীবরূপী শিব আছেন তাঁহারই অর্চ্চনা। শ্রীযুক্ত নাগলিঙ্গম্ মহাশয় তামিল ভাষায় সকলকে বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। রামনাদাধিপতি ভাবে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। পরদিন স্বামীজির উপদেশের সার্থকতাসম্পাদনের জন্য তিনি শত সহস্র দুঃখী ব্যক্তিকে আহার্য্য ও বস্ত্র বিতরণ করিলেন এবং এই ঘটনার স্মরণার্থ সেই স্থানে প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টি ক্ষোদিত করাইলেন—

'সত্যমেব জয়তে'

"পশ্চিম প্রদেশে বেদান্তধর্ম্মপ্রচারে অশ্রুতপূর্ব্ব সফলতা লাভ করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় ইংরেজ শিষ্যগণের সহিত ভারতভূমির যে স্থলে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন সেই পবিত্র স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য রামনাদাধিপতি ভাস্কর সেতুপতি কর্ত্তৃক এই স্মারকস্তম্ভ প্রোথিত হইল। সন ১৮৯৭, ২৭শে জানুয়ারী।"

পাম্বান হইতে আবার জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিতে হইল।

ভারতে পৌঁছিয়া রামনাদের রাজার ছত্রে স্বামীজি প্রাতর্ভোজন সমাপন করিলেন। তারপর তিরুপিলানি নামক স্থানে পৌঁছিলে তথাকার অধিবাসিগণ স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রামনাদ দেখা গেল। সমুদ্রতীর হইতে স্বামীজি বরাবর গোশকটে যাইতেছিলেন, কিন্তু রামনাদের নিকটে পৌঁছিলে তাঁহাকে একখানি সুদৃশ্য নৌকায় তুলিয়া একটি বৃহৎ হ্রদের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দাক্ষিণাত্যে এরূপ অনেক বড় বড় হ্রদ আছে। সুতরাং রামনাদে উক্ত বিশাল হ্রদোপকূলে স্বামীজির অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। হ্রদতীরে অভ্যর্থনা হওয়ার দরুন সভাও বেশ জমিয়াছিল। গুড্‌উইন সাহেবের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, স্বামীজি রামনাদে অতি উচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন। তিনি তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র তোপধ্বনি হইতে লাগিল এবং নভস্তলে তারকাকারে বিচিত্রবর্ণের আতশবাজি উঠিতে লাগিল। রামনাদের রাজা অবশ্য অভ্যর্থনাকারীদের অগ্রণী। তিনি স্বয়ং স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া রামনাদের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। অনন্তর স্বামীজি রাজার গাড়ীতে চড়িয়া রাজভ্রাতা-পরিচালিত রাজার শরীররক্ষকগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া চলিতে লাগিলেন এবং রাজা নিজে সমবেত জনতার নেতৃস্বরূপ হইয়া স্বামীজির অনুধাবন করিতে লাগিলেন। রাস্তার দুই ধারে শত শত মশাল জ্বলিতেছিল এবং দেশী ও বিলাতি দুই প্রকার বাদ্যধ্বনিতে চতুর্দ্দিক গমগম করিতেছিল। স্বামীজি জাহাজ হইতে নামিবার পর নগরপ্রবেশ পর্য্যন্ত বিলাতী ব্যাণ্ডে 'হের ঐ আসিছে বিজয়ী বীর' এই সুরটি বাজান হইতেছিল। অর্দ্ধেক পথ এইরূপে আসা হইলে স্বামীজি রাজার অনুরোধে একটি সুচারু রাজশিবিকায় আরোহণ করিয়া 'শঙ্কর ভিলা' নামক প্রাসাদে উপনীত হইলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর বৃহৎ সভাগৃহে স্বামীজিকে

বসান হইল। ইতোমধ্যে তথায় লোকের ভিড় হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজিকে দেখিবামাত্র চারিদিকে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি ও উৎসবকোলাহলের ধুম পড়িয়া গেল। রাজা প্রথমে স্বামীজির বহু প্রশংসা করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজা দিনকর সেতুপতিকে রামনাদ-বাসীর পক্ষ হইতে স্বামীজিকে প্রদত্ত নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতে বলিলেন। পাঠ শেষ হইলে পত্রখানি বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত একটি সুবর্ণমণ্ডিত পেটিকায় করিয়া স্বামীজির হস্তে উপহারস্বরূপ প্রদান করা হইল।

রামনাদ অভিনন্দন

শ্রীপরমহংস যতিরাজ দিগ্বিজয় কোলাহল সর্ব্বমতসম্প্রতিপন্ন পরম-যোগেশ্বর শ্রীমদ্ভগবচ্ছ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসকরকমলসঞ্জাত রাজাধিরাজসেবিত শ্রীবিবেকানন্দস্বামি পূজ্যপাদেষু—

স্বামিন্!

এই প্রাচীন ঐতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধন রামেশ্বর বা রামনাথপুরম্ বা রামনাদের অধিবাসী আমরা আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। যে স্থান সেই মহাধর্ম্মবীর আমাদের পরমভক্তিভাজন প্রভু শ্রীভগবান রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হইয়াছে, সেইস্থানে ভারতে প্রথম পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা আপনাদিগকে মহাসৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি।

আমাদের মহান্ সনাতনধর্ম্মের প্রকৃত মহত্ত্ব পাশ্চাত্ত্যদেশের মনীষিগণের চিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য আপনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ এবং ঐ চেষ্টায় যে অভূতপূর্ব্ব সুফল ফলিয়াছে,

তাহাতে আমরা অকপট আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিয়াছি। আপনি অপূর্ব্ব বাগ্মিতাসহকারে ও অভ্রান্ত স্পষ্ট ভাষায় ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মই আদর্শ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম, আর উহা সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীরই প্রকৃতির উপযোগী। আপনি মহানিঃস্বার্থ ভাবের প্রেরণায় মহোচ্চ উদ্দেশ্য প্রাণে লইয়া ও মহা স্বার্থত্যাগ করিয়া বহু দেশ, নদ নদী, সমুদ্র ও মহাসমুদ্র পার হইয়া অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী ইউরোপ ও আমেরিকায় সত্য ও শান্তির সংবাদ বহন করিয়াছেন এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার জয়পতাকা উড়াইয়াছেন। আপনি উপদেশ ও জীবন উভয়তঃ সার্ব্বভৌম ভ্রাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যে পরিণতির সম্ভাবনীয়তা দেখাইয়াছেন। সর্ব্বোপরি, আপনার পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে প্রচারের ফলে গৌণভাবে ভারতের উদাসীন পুত্রকন্যাগণের প্রাণেও অনেক পরিমাণে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের ভাব জাগরিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরম প্রিয় অমূল্য ধর্ম্মের চর্চ্চা ও অনুষ্ঠানে একটা আন্তরিক আগ্রহ জন্মিয়াছে।

এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় প্রদেশের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি বাক্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। আপনার অন্যতম অনুরক্ত শিষ্য, আমাদের রাজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, একথা উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দনপত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করার জন্য তিনি আপনাকে যেরূপ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, তাহা তিনি ভাষায় প্রকাশে অসমর্থ।

উপসংহারে আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি যে,

তিনি যেন, আপনি যে কল্যাণকর কার্য্য এত সুন্দররূপে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পরিচালন করিতে আপনাকে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান করেন। আপনার পরমভক্ত আজ্ঞাবহ শিষ্য ও সেবকগণের শ্রদ্ধা ও প্রেমসহকৃত এই অভিনন্দন।

রামনাদ ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৯৭

প্রত্যুত্তরে স্বামীজি ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধনের প্রয়োজন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া একটি সুমধুর ও ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন, ভারত আবার জাগিয়াছে। বড় সুন্দর ভাষায় তিনি কথাটি বলিয়াছিলেন। যথা—

"সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্য্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গম্ভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্য্যন্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে আমাদের এই মাতৃভূমি তাঁহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রতা হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইবেন না— কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে

আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না; কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে রাজা প্রস্তাব করলেন, স্বামীজির রামনাদে শুভ পদার্পণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইয়া মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিত হউক।

রামনাদে অবস্থানকালে বহু ব্যক্তি স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। একদিন তিনি এখানকার খৃষ্টান স্কুলগৃহে একটি বক্তৃতা দেন এবং আর একদিন তাঁহার সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে এক দরবার হয়। এখানে স্বামীজিকে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। তিনিও একটি সুন্দর ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। তাহাতে বলেন, রামনাদাধিপ যদিও সাংসারিক পদমর্য্যাদায় খুব উচ্চ তথাপি তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরে যুক্ত এবং এই কারণে তিনি রামনাদপতিকে 'রাজর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। অতঃপর রাজার একান্ত অনুরোধে স্বামীজি 'ভারতে শক্তি-উপাসনা' সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। ইহা ফনোগ্রাফে তোলা হয়। রবিবার সন্ধ্যাকালে এই দরবার হয়। ঐ দিনই মধ্যরাত্রে তিনি রামনাদ হইতে মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন।

রামনাদ-পরিত্যাগের পর স্বামীজি প্রথমে পরমকুডিতে আসিলেন। তৎস্থানবাসিগণ পরম সমারোহসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজিকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। এই অভিনন্দনপত্রে তাঁহারা স্বামীজির পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, "আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণ রহিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্ত্যেরা আপনার ধর্ম্মোপদেশ শুধু শুনিয়া ও উহাতে সায় দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—উহা তাহাদের জীবনকে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে।

আপনার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আমাদের সেই প্রাচীন ঋষিদিগের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, যাঁহারা তপস্যা ও আত্মসংযম দ্বারা পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া মানবজাতির প্রকৃত আচার্য্য ও নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

পরমকুড়ি হইতে স্বামীজি মনমদুরায় উপস্থিত হইলেন। মনমদুরা ও তৎসমীপবর্ত্তী শিবগঙ্গার জমিদার ও অন্যান্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। প্রথমে এইস্থানে স্বামীজি আসিতে পারিবেন না এই মর্ম্মে তার করা হয়। ইহাতে তাঁহারা অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে স্বামীজির আগমনে সকলেই পরম পুলকিত হইলেন এবং আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। অভিনন্দনপত্রের এক স্থলে তাঁহারা বলিলেন, "পাশ্চাত্য উদরসর্ব্বস্ব জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্ম্ম-ভাবসমূহের উপর তীব্র আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময়ে আপনার ন্যায় একজন শক্তিশালী আচার্য্যের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস— আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য সুবর্ণের উপর যে ধূলারাশি কিছুকালের জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভারূপ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রারূপে জগতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবে। আপনি যেরূপ উদারভাবে শিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় সমবেত অসংখ্য বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর সমক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস—আমাদের পূজনীয় মহারাণীর রাজ্যে যেমন সূর্য্য অস্ত যায় না, তেমনি আপনারও ধর্ম্মরাজ্য জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে।"

মনমদুরা অভিনন্দনের উত্তর দান করিয়া স্বামীজি অবশেষে মদুরায় পৌঁছিলেন। মদুরা একটি প্রাচীন বিদ্যাচর্চ্চার স্থান এবং আজও পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন রাজ্যসমূহের স্মৃতি ও অনেক উত্তমোত্তম মন্দিরাদি বক্ষে ধারণ

করিয়া আছে। এখানে রামনাদরাজের একটি সুন্দর বাংলা আছে। স্বামীজি সেইখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে একটি মখমলের খাপে করিয়া তাঁহাকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল।

"পরম পূজ্যপাদ স্বামীজি,

মত্রাবাসী আমরা হিন্দুসাধারণ আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সহিত পরমশ্রদ্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবন্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনি সংসারের সমুদয় বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহান্ পরহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি নিজ জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত বাহ্য অনুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, কেবল উন্নত দার্শনিক ধর্ম্মই ত্রিতাপ-তাপিত জীবকে শান্তিদানে সমর্থ।

"আপনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডবাসীকে সেই ধর্ম্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছেন, যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহার নিজের অধিকার ও অবস্থা অনুযায়ী উপায়ে উন্নতিপথে আরোহণে সাহায্য করে। যদিও গত চার বৎসর আপনি পাশ্চাত্ত্যদেশবাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেইসকল বক্তৃতা ও উপদেশ কম আগ্রহসহকারে পঠিত হয় নাই এবং উহা বিদেশাগত উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সঙ্কুচিত করিতে কম সাহায্য করে নাই!

"ভারত যে আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে তাহার কারণ, তাহাকে জগতে আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ মহাব্রত সাধন করিতে হইবে। কলিযুগের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই উপযুগের শেষভাগে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছি, শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

"আপনি ভারতীয় দর্শনের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেজন্য আনন্দ-প্রকাশ এবং সহস্র মনুষ্যজাতির যে অমূল্য উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার—এই দুই বিষয়ে প্রাচীন বিদ্যার লীলাভূমি, সুন্দরেশ্বর-দেবের প্রিয়, যোগিগণের পবিত্র দ্বাদশান্তক্ষেত্র এই মদুরা ভারতের অন্য কোন নগরী অপেক্ষা পশ্চাদ্‌গামী নহে জানিবেন।

"আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন, উদ্যম ও বল প্রদান করুন এবং জগতের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত রাখুন।"

তিন সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া স্বামীজির শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি শেষের কয়েক স্থানে তাঁহার আর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার মত অবস্থা ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি নিজ স্বচ্ছন্দতা বা শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হইলেন এবং মদুরা অভিনন্দনের উত্তরে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে তিনি একদিন তত্রত্য সুবিখ্যাত মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। এই মন্দির ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহের অন্যতম এবং উহার স্থাপত্যকার্য্য অতি সুন্দর। স্বামীজি ও তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণ মন্দিরস্থ ধনরত্নাদি দর্শন করিলেন। ইহার মধ্যে একটি দুষ্প্রাপ্য গজমতি ছিল। সন্ধ্যার ট্রেনে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলযোগে স্বামীজি মদুরা হইতে কুম্ভকোণম্ যাত্রা করিলেন। প্রত্যেক ষ্টেশনে শত শত লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। অতি নগণ্য গ্রাম হইতেও লোক আসিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যপ্রদান ও সাদর সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিল। তিনি সকলকেই মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে লাগিলেন এবং সহাস্য বদনে তাহাদের প্রদত্ত উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দুই-এক দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু সময়সংক্ষেপ বলিয়া ও শরীরের ক্লান্তিনিবন্ধন তিনি

সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাত্রি চারিটার সময় গাড়ী যখন ত্রিচিনপল্লীতে পৌছিল তখন দেখা গেল সহস্রাধিক লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র তাহারা তাঁহাকে একটি অভিনন্দন প্রদান করিল। তাহাতে বলিল, "আমরা আশা করিয়াছিলাম আপনি অন্ততঃ একদিন এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। যাহা হউক, মান্দ্রাজবাসীরা যে শীঘ্রই আপনাকে পাইবে ইহাই ভাবিয়া আমরা পরম আনন্দবোধ করিতেছি।" ত্রিচিনপল্লীর জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি এবং ছাত্রবৃন্দও স্বামীজিকে স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামীজিকে অবশ্য খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তাঞ্জোরে কয়েক দিন পরে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উৎসব ও লোকসমাগম হইয়াছিল। পথিমধ্যে তিনি যেরূপ সাদর অভ্যর্থনা পাইতেছিলেন তাহা হইতেই কুম্ভকোণমে তাঁহার কিরূপ অভ্যর্থনা হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই। কুম্ভকোণম্‌বাসীরা তাঁহাকে পাইয়া অত্যধিক আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। এই নগর সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান ধর্ম্মকেন্দ্র ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি-বিজড়িত। এখানে স্বামীজি তিন দিন থাকিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন; কারণ বেশ বুঝিতে পারা গেল, মান্দ্রাজে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কাণ্ড হইবে। কুম্ভকোণমে হিন্দুসমাজ ও হিন্দু ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে দুইটি অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং স্বামীজি উত্তরে 'বেদান্তের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলেন, আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশা, অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য একমাত্র আমরাই দায়ী; আমরাই আমাদের দেশের সাধারণলোককে পদদলিত করিয়া তাহাদিগকে নীচ জাতিতে পরিণত করিয়াছি এবং প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে এক্ষণে ব্রাহ্মণাপেক্ষা চণ্ডালের শিক্ষাতেই অধিকতর যত্নবান

হওয়া উচিত। উপসংহারে তিনি বলেন, "হে হিন্দুগণ, তোমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই জাতীয় মহান্ অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে, হয়ত উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই প্রাণপণে এই সকল ছিদ্রবন্ধ ও পোতের জীর্ণসংস্কার করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের স্বদেশবাসীকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে—তাহারা জাগ্রত হউক, তাহারা এ দিকে মনঃসংযোগ করুক। আমি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়া নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া ইতিকর্ত্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব। ইত্যাদি—"

কুম্ভকোণম্ হইয়া স্বামীজি মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে প্রায় সকল ষ্টেশনেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় জনতা দেখা যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ মায়াবরম্ ষ্টেশনে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। তথায় শ্রীযুক্ত ডি. নাটিসা আয়ার প্রমুখ একটি ক্ষুদ্র কমিটি তাঁহাকে ষ্টেশন প্লাট্‌ফরমের উপর একটি অভিনন্দন প্রদান করিলেন। উত্তরে তিনি সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি বিশেষ কোন বড় কাজ করি নাই। আমা অপেক্ষা আর যে-কেহ ইহা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতেন। তবে আমার প্রভু যাহা আমাকে করিতে পাঠাইয়াছিলেন আমি শুধু তাহাই সমাধা করিয়া আসিয়াছি। আমার ক্ষুদ্র শক্তি যে আপনাদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে ইহাতেই আমি ধন্য।" আরও বলিলেন, অন্য কোন সময় তিনি মায়াবরমে আসিবার চেষ্টা করিবেন। মহা উৎসাহধ্বনির মধ্যে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চতুর্দ্দিক 'জয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকি জয়' রবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মান্দ্রাজে যাইবার পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে পূর্ব্ববৎ ভিড় হইতে লাগিল। এক স্থানে এমন হইয়াছিল যে সেখানকার লোকেরা ষ্টেশনমাষ্টারকে অন্ততঃ দুই-চারি মিনিটের জন্যও ট্রেনটি থামাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সে ষ্টেশনে ঐ ট্রেন থামিবার কথা নহে। সুতরাং ষ্টেশনমাষ্টার তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। যখন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও কোন ফল হইল না, তখন সেই সহস্রাধিক লোক দূরে ট্রেন আসিতেছে দেখিয়া অধীরভাবে উন্মত্তবৎ রেললাইনের উপর শুইয়া পড়িল। ষ্টেশনমাষ্টার গতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন। গার্ড সাহেব ব্যাপারটি আন্দাজে কতক অনুমান করিলেন এবং অতগুলি লোকের প্রাণনাশ হইবে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইতে আদেশ দিলেন। গাড়ী থামিবামাত্র দলে দলে সকলে স্বামীজির কামরার দিকে ছুটিতে লাগিল। তিনি তাহাদের এবম্প্রকার ভক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মান্দ্রাজে

মায়াবরম্ হইতে স্বামীজি মান্দ্রাজ পৌঁছিলেন। যখন ট্রেন মান্দ্রাজ পৌঁছিল তখন দেখা গেল, সহস্র সহস্র ব্যক্তি স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। স্বামীজির আগমনের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে মান্দ্রাজে তাঁহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রমুখ শহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনেক রাজা, জমিদার, সভাসমিতি ও মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধিগণ এই ঘটনা উপলক্ষে শহরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। নগরটি কোথাও কদলী-বৃক্ষে, কোথাও পত্রপুষ্পে, কোথাও বা নারিকেলশাখাসমূহে সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থানে সপ্তদশটি বিজয়তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে পত্‌পত্ শব্দে বিচিত্রবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল এবং দ্বারে দ্বারে ফুলের মালা দুলিতেছিল। মাঝে মাঝে স্বর্ণাক্ষরে দীপ্তি পাইতেছিল 'পূজনীয় বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউন', 'স্বাগত হে ভগবৎসেবক', 'স্বাগত অতীতঋষিগণসেবক', 'স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি নবজাগ্রত ভারতের সানন্দ সংবর্দ্ধনা', 'এস শান্তির অগ্রদূত', 'এস শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত সন্তান', 'স্বাগত পুরুষসিংহ' ইত্যাদি। আর নানাবিধ সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে ছিল 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। এগমোর ষ্টেশনটি দূর হইতে ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চের ন্যায় দেখাইতেছিল এবং স্বামীজির গমনপথ রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। সাজসজ্জাদর্শনে মনে হইতেছিল যেন নগরে এক বিরাট রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। পথপার্শ্বে, গৃহদ্বারে,

গবাক্ষে, অলিন্দে ও ছাদের উপর সহস্র সহস্র লোক। পথে অবিরাম লোকগতি। মান্দ্রাজে কখনও কাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এরূপ সমারোহ, জনসমাগম বা উৎসাহ দৃষ্ট হয় নাই—এমন কি, লর্ড রিপণ ব্যতীত কোন প্রধান রাজপুরুষের সম্মানার্থও নহে।

স্বামীজী যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন লক্ষ কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। তিনি অবতরণ করিবামাত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যেরা তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহিত ছিলেন তাঁহার দুইজন গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ এবং শিষ্য মিঃ গুড্‌উইন। কাপ্তেন এবং মিসেস্ সেভিয়ার পূর্ব্বদিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, আর কলম্বো হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বোক্ত টি. জি. হ্যারিসন সাহেব ও তাঁহার পত্নী আসিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে নির্গমনদ্বারে আলাপ-পরিচয়াদি হইল। তৎপরে স্বামীজির কণ্ঠদেশ জয়মাল্যে বিভূষিত করা হইল এবং যন্ত্রবাদ্যোত্থিত জাতীয় সঙ্গীতধ্বনি চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত সামান্য কথোপকথনান্তে স্বামীজি গুরুভ্রাতৃদ্বয় ও শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সহিত একটি সুসজ্জিত অশ্বযানে আরোহণ করিয়া এটর্ণি মিঃ বিলগিরি আয়েঙ্গারের 'ক্যাস্‌ল্ কার্নান' নামক ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। অনতিবিলম্বে ছাত্রগণ আসিয়া ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই তাঁহার গাড়ী টানিতে লাগিল এবং শত সহস্র ব্যক্তি তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে দর্শকবৃন্দ উপহার-প্রদানের জন্য ক্রমাগত গাড়ী থামাইতে লাগিল আর অনবরত স্বামীজির উদ্দেশে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। উপহারের মধ্যে অধিকাংশই ফল, বিশেষতঃ নারিকেল। চিন্তাদৃপেত প্রভৃতি কতিপয় স্থানে মান্দ্রাজ রমণীরা কর্পূর-চন্দন, পুষ্প-ধূপাদি এবং প্রদীপের দ্বারা স্বামীজির আরতি করিলেন।

একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া প্রাচীনা সেই বিষম জনতা ভেদ করিয়া স্বামীজির সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার বিশ্বাস স্বামীজি তাঁহার আরাধ্য 'সম্বন্ধমূর্ত্তি'র অবতার। এত গোলযোগে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সাড়ে নয়টার সময় সেখানে পৌঁছিলে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারীয়ার 'মান্দ্রাজ বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী সভা'র পক্ষ হইতে সংস্কৃতভাষায় স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি অভিভাষণ পাঠ করিলেন। পরে কানাড়ী ভাষায়ও একটি অভিনন্দন পঠিত হইল। অবশেষে শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ারের অনুরোধে সকলে সে রাত্রের মত স্বামীজিকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

মান্দ্রাজে এই অভ্যর্থনার সূত্রপাত। কিন্তু এখানে যে তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহা ক্রমশঃ হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে এই স্থান হইতেই বর্ত্তমান ভারতের নব অভ্যুদয়।

মান্দ্রাজে স্বামীজি নয় দিন ছিলেন এবং ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার বজ্রনির্ঘোষে আসমুদ্র হিমাচল আলোড়িত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী রবিবার অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে স্বামীজিকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। নিম্নে উহার সমগ্রটির বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল।

মান্দ্রাজ অভিনন্দন

পূজ্যপাদ স্বামীজি,

আমরা আপনার মান্দ্রাজবাসী সমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের পক্ষ হইতে পাশ্চাত্ত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারের পর এতদ্দেশে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। অভিনন্দন করিতে হয় বলিয়া অথবা অপরের দেখাদেখি আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করিতেছি না। ঈশ্বরকৃপায় ভারতের প্রাচীন মহোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণা

করিয়া আপনি যে সত্যপ্রচাররূপ মহান্ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্যই আমাদের এই চেষ্টা। চিকাগোতে যখন ধর্ম্ম-মহাসভার আয়োজন হইল, তখন আমাদের কতিপয় স্বদেশবাসীর স্বভাবতঃই এই আগ্রহ হইল যে, উক্ত মহাসভায় আমাদের এই মহান্ ও প্রাচীন ধর্ম্মও যেন উপযুক্তরূপে আলোচিত হয়, যেন মার্কিন জাতির নিকট ও তাহাদের সাহায্যে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জাতির নিকট আমাদের ধর্ম্ম যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হয়। ঠিক এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে আপনার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়। আমরা তখনই সকল জাতির ইতিহাসে চিরকাল ধরিয়া যে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা আবার উপলব্ধি করিলাম—অর্থাৎ সময় হইলেই উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন আপনি উক্ত ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যাইতে স্বীকৃত হইলেন তখন আপনার অপূর্ব্ব শক্তিসমূহের পরিচয় পাইয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত চিরস্মরণীয় ধর্ম্মসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি অতি দক্ষতার সহিত উহার সমর্থন করিবেন। আপনি যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক ভাবে হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মতসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে শুধু যে উক্ত মহাসভার সভ্যগণের হৃদয় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্ত্য নরনারী উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ধর্ম্মনির্ঝরিণীর অমরত্ব ও প্রেমরূপ সলিল পান করিলে তাঁহারা সতেজ হইতে পারেন এবং সমগ্র মানবসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর, পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতর উন্নতির ভাগী হইতে পারে, যাহা জগতে আর কখনও ঘটে নাই। ধর্ম্মসমন্বয়রূপ হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্বজ্ঞাপক মতটির প্রতি জগতের অন্যান্য মহান্ ধর্ম্মসমূহের প্রতিনিধিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে আমরা আপনার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রকৃত

শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষে এখন আর এরূপ বলা সম্ভব নহে যে, সত্য ও পবিত্রতা কোন বিশেষ স্থানে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিংবা উহা কোন বিশেষ মত বা সাধনপ্রণালীর একচেটিয়া অধিকার, অথবা কোন বিশেষ মত বা দর্শন অন্যান্যগুলিকে নিরস্ত ও বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনি ভগবদ্গীতার অন্তর্নিহিত মধুর সমন্বয়ভাব সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়া আপনার অননুকরণীয় মধুর ভাষায় বলিয়াছেন—"সমগ্র ধর্ম্মজগৎ বিভিন্নপ্রকৃতি নরনারীর বিভিন্ন অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া এক লক্ষ্যের দিকে গতিমাত্র।" আপনার উপর অর্পিত এই পবিত্র ও মহান্ কার্য্যভার সমাপন করিয়াই যদি আপনি নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা হইলেও আপনার স্বধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ আনন্দ ও ধন্যবাদ সহকারে আপনার কার্য্যের অসীম গুরুত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যদেশে গিয়া ভারতীয় সনাতনধর্ম্মের প্রাচীন উপদেশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র মানবজাতির নিকট জ্ঞানালোক ও শান্তির সুসমাচার বহন করিয়াছেন। বেদান্তধর্ম্ম যে বিশেষভাবে যুক্তিসহ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আপনি আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শন-প্রচারের জন্য স্থায়ী বিভিন্নশাখাবিশিষ্ট একটি কর্ম্মপ্রধান 'মিশন' প্রতিষ্ঠারূপ যে গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে আমাদের বিশেষ আনন্দ বোধ হইতেছে। আপনি যে প্রাচীন আচার্য্যগণের পবিত্র পথের অনুসরণ করিতেছেন, এবং যে মহান্ আচার্য্য আপনার জীবনে শক্তিসঞ্চার করিয়া উহার উদ্দেশ্যসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন আপনিও সেই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই মহান্ কার্য্যে আপনার সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আশা করি যেন ঈশ্বরকৃপায়

আমরাও এই মহান্ কার্য্যে আপনার সহযোগী হইবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারি। আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমান ও পরম দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট হৃদয়ের সহিত এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘ জীবন ও পূর্ণ শক্তি প্রদান করেন আর আপনার কার্য্যকে যেন সনাতন সত্যের শিরোভূষণের উপযুক্ত গৌরব ও সিদ্ধির মুকুটদানে আশীর্ব্বাদ করেন।

উপর্য্যুক্ত অভিনন্দনপাঠের পর 'বিদ্বৎবৈদিক সভা', 'মান্দ্রাজ সমাজ-সংস্কার সমিতি' ও খেতড়ির মহারাজা—ইঁহাদিগের প্রেরিত তিনটি অভিনন্দন এবং তদ্ব্যতীত সংস্কৃত, ইংরেজী, তামিল ও তেলেগু ভাষায় রচিত আরও বিংশতিটি অভিনন্দনপাঠান্তে স্বামিজীকে নিবেদন করা হইল। স্বামীজি যখন প্রত্যুত্তর দিবার জন্ত দণ্ডায়মান হইলেন তখন যে উচ্চ কোলাহল ও জনসংঘর্ষ আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনাতীত। দশ সহস্রেরও অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল। অনেকে স্থানাভাবে সভার বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যখন এই সংক্ষুব্ধ জনসমুদ্রকে শান্ত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন স্বামীজি হল হইতে বাহিরে গিয়া একখানি গাড়ীর কোচবাক্সের উপর আরোহণ করিয়া পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ লোকের ভিড় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং সকলে স্বামীজির বক্তৃতা শুনিতে না পাইয়া গাড়ীর দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং রীতিমত সভা হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। অগত্যা স্বামীজি সংক্ষেপে দুই-চার কথা বলিয়া এবং শ্রোতৃবর্গকে ধন্যবাদ দিয়া সেদিনকার মত বক্তৃতা শেষ করিলেন। তিনি তাহাদিগের উৎসাহদর্শনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "দেখিও যেন এ আগুন নিভিয়া না যায়।"

অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর ব্যতীত স্বামীজি মান্দ্রাজে আরও পাঁচটি বক্তৃতা

দিয়াছিলেন— (১) আমার সমরপন্থা, (২) ভারতীয় জীবনে বেদান্তের নিয়োগ, (৩) ভারতের মহাপুরুষগণ, (৪) আমাদিগের উপস্থিত কর্ত্তব্য, (৫) ভারতের ভবিষ্যৎ। প্রথম বক্তৃতাটি ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বদিন অতিরিক্ত জনতাবশতঃ বক্তৃতা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া এই দিন তিনি মান্দ্রাজবাসীদিগের সদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, "অভিনন্দনপত্রসমূহে আমার প্রতি যেসকল সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কিরূপে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা জানি না, তবে আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে উহাদের যোগ্য করেন, আর আমি যেন সারাজীবন আমাদের ধর্ম্ম ও মাতৃভূমির সেবা করিতে পারি।"

এই বক্তৃতাটি অতিশয় দীর্ঘ এবং ইহাতে নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ নিজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথার উল্লেখ ও সংস্কারসম্বন্ধীয় মন্তব্যপূর্ণ বলিয়াই ইহা বিশেষভাবে পাঠের যোগ্য। এই বক্তৃতাপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, ব্রাহ্মসমাজ বা খ্রীষ্টীয় মিশনরি কোন সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই তিনি আমেরিকায় কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই, বরং তাঁহাদের অনেকে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি 'হিন্দু'শব্দের উৎপত্তিনির্ণয়-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বলেন, হিন্দু শব্দ যখন যে অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকুক, যে ব্যক্তি বেদের সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকার নাই। এই বেদের সারাংশ উপনিষদ্ বা বেদান্ত ; সুতরাং বর্ত্তমান কালে সমগ্র ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে সম্ভবতঃ বৈদান্তিক বা বৈদিক এই দুইটির মধ্যে যাহা হয় একটা বলিলেই ঠিক বলা হয়। তারপর তিনি বেদনামধেয়

অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি, ভারতীয় সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মেরও মূলভিত্তি এবং শাস্ত্র ও দেশাচারের পার্থক্য ও বেদব্যাখ্যায় ভাষ্যকারদিগের মতভেদ প্রদর্শন করিয়া যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিভাবে সকল মতের সমন্বয়সাধন করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করেন। তৎপরে তিনি উপনিষৎসমূহের অদ্ভুত ভাষার প্রশংসা করিয়া মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন, উপনিষৎ-তত্ত্বের আরম্ভ দ্বৈতবাদে ও সমাপ্তি অদ্বৈতে এবং পুরাণের গল্প ত্যাগ করিয়া উপনিষদের তেজ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া বলেন, "সমগ্র জীবন আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর। মানব কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, মানবের দুর্ব্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে কিন্তু অধিকতর দুর্ব্বলতার দ্বারা কি এই দুর্ব্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ', 'ভয়শূন্য হও' এই বাক্য বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। অভীঃ—ভয়শূন্য হও; আর আমার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে সুদূর অতীত হইতে সেই পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সম্রাট আলেক-জাণ্ডারের চিত্র উদিত হইতেছে—আমি যেন দেখিতেছি, সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডোপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন—সম্রাট সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ধনমানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে আসিতে আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থ ও মানে প্রলোভনের কথা শুনিয়া হাস্যসহকারে তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন;

তখন সম্রাট নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব'; তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর কখনও বল নাই। আমায় মারে কে? জড়জগতের সম্রাট তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি চৈতন্যস্বরূপ, অজ ও অক্ষয়; আমি কখনও জন্মাই নাই, কখনও মরিব না, আমি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ। তুমি বালক, তুমি আমায় মারিবে?' ইহাই প্রকৃত তেজ, ইহাই প্রকৃত নির্ভীকতা। বন্ধুগণ! উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই এক্ষণে বিশেষভাবে আমাদের জীবনে পরিণত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

তৃতীয় বক্তৃতায় তিনি বলেন, ধর্ম্মজীবনলাভ করিতে হইলে ঋষি হইতে হইবে—ঋষি অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভগবান বুদ্ধদেব, জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য, মহানুভব রামানুজাচার্য্য, প্রেমাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়াচার্য্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব—সকলের জীবন আলোচনা ও তাহা হইতে কি শিক্ষালাভ হয়, তাহা বর্ণনা করেন।

চতুর্থ বক্তৃতাটি ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত হয়। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, আমেরিকাগমনের পূর্ব্বে এই সমিতির সভ্যগণের সহিত স্বামীজির পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত নানাবিষয়ে আলোচনা হওয়াতে ক্রমশঃ মান্দ্রাজবাসীরা তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতাবলীর পরিচয় পান এবং অবশেষে তাঁহাদের চেষ্টাতেই তিনি চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। এই সকল কারণে এই বক্তৃতাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শেষ বক্তৃতাটি একটি বৃহৎ তাঁবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়, তাহাতে প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

উপরি উক্ত বক্তৃতাগুলি ব্যতীত 'চেল্লাপুরী অন্নদানম্' নামক এক দাতব্য ভাণ্ডারের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে স্বামীজি সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে একজন বক্তা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণজাতিকে ভিক্ষাদান-প্রথার দোষ প্রদর্শন করেন। স্বামীজি ঐ বিষয়ে বলেন, "এই প্রথার ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তাসম্পত্তির রক্ষকস্বরূপ। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে এবং সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।"

ভারতের অবিচারিত দান ও অন্যান্য জাতির বিধিবদ্ধ দানপ্রথার তুলনা করিয়া স্বামীজি বলিলেন, "ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে জীবনযাপন করে, পাশ্চাত্ত্য দেশের দরিদ্রকে আইনানুসারে গরীবখানায় যাইতে বাধ্য করা হয়; মানুষ কিন্তু আহার অপেক্ষা স্বাধীনতা ভালবাসে, সুতরাং সে গরীবখানায় না যাইয়া সমাজের শত্রু, চোর, ডাকাত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য আবার অতিরিক্ত পুলিশ ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। সভ্যতা নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজশরীর অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই, সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্য-দানেরও আবশ্যক থাকিবে। এখন হয় ভারতের ন্যায় অবিচারিতভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অন্ততঃ সন্ন্যাসিগণকে (তাঁহাদের মধ্যে সকলে অকপট না হইলেও) আহার লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রের দুই-চারটা কথাও শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে, অথবা পাশ্চাত্ত্যজাতির ন্যায় বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দরিদ্রদুঃখ-নিবারণপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে আইনের ফলে ভিক্ষুককে চোর-

ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। এই দুইটি ছাড়া পথ নাই। এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়? একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে।"

স্বামীজি একদিন মান্দ্রাজ সমাজ-সংস্কার সমিতির সভাগৃহেও গমন করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজবাসীরা তাঁহাকে ঐ স্থানে একটি কেন্দ্র খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "এ সময়ে নহে। ইহার পরে আমি কাহাকেও পাঠাইয়া দিব।"

ইতোমধ্যে তিনি পাশ্চাত্ত্যবাসী শিষ্য ও ভক্তদিগের নিকট হইতে পত্রাদি পাইতেছিলেন। তাঁহারা সেখানে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের ক্রমিক উন্নতি ও বিস্তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিলেন। অন্যান্য পত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত পত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি

প্রিয় সুহৃৎ ও ভ্রাতঃ,

আমেরিকায় বেদান্তধর্ম্ম ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যার কার্য্যে আপনি যেরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসা সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ধর্ম্ম, দর্শন ও নীতি-শাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনাকারী এই কেম্ব্রিজ কনফারেন্সের সভ্যগণ ভবৎকৃত সেই কার্য্যকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করিতে অতিশয় আনন্দবোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আপনি ও আপনার সহকারী স্বামী সারদানন্দ যেভাবে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে যে-কোন গভীর তত্ত্ব-আস্বাদনেরই সুখ আছে তাহা নহে, পরন্তু তদ্দ্বারা বহুদূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রবন্ধন সুদৃঢ় হইবে এবং মনুষ্য-জাতির সাধারণ ইষ্ট যে এক এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিদ্যমান—এই ধারণা (যাহা আমরা জগতের সকল

উচ্চ ধর্ম্মের নিকট শ্রবণ করিয়া আসিতেছি) আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে।

আমাদের খুব আশা আছে, আপনার ভারতীয় কার্য্য এই মহদুদ্দেশ্য-সাধনে আরও অধিক সহায়তা করিবে এবং আপনি সেই দূরদেশস্থিত মহান্ আর্য্যবংশসমুদ্ভূত ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে ভ্রাতৃস্নেহের সুস্নিগ্ধ আশ্বাস-বাণী লইয়া পুনরায় আমাদিগের নিকট আগমন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আনিবেন আপনার স্বদেশীয়গণের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও ভাবের সংস্পর্শ হইতে যে অভিজ্ঞতালাভ ও চিন্তাশীলতার উদ্ভব হয় তাহার ফলস্বরূপ সুপরিপক্ক জ্ঞানসম্ভার।

এই কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনসমূহের যে ফলপ্রদ কার্য্যসম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে তাহা অবলোকন করিয়া আমরা সানন্দে জানিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছি, আগামী বর্ষে আপনার কার্য্যসমূহ কিভাবে পরিচালিত হইবে এবং আপনাকে আমাদের আচার্য্যরূপে প্রাপ্ত হইবার কোন আশা আছে কি না। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আপনি অচিরে আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসেন; এবং যদি আপনি আসেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব বন্ধুগণের সকলেই যে হৃদয়ের ঐকান্তিকী প্রীতি সহযোগে আপনার সম্বর্দ্ধনা করিবেন ও আপনার কার্য্যে ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহের সহিত যোগ দিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইতি

আপনার একান্ত অনুরক্ত ও ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ

লুইস্ জি জেন্‌স্; ডি ডি ডিরেক্টর; সি সি এভারেট, ডি, ডি; উইলিয়ম জেম্‌স্; জন্‌ই এইচ্ রাইট; যোশিয়া রয়েস্; জে ই লো; এ ও লভজয়; রাচেল কেট টেলর; সারা সি বুল; জন্ পি ফক্স

পত্রের স্বাক্ষরকারীরা সকলেই আমেরিকার বিখ্যাত মনস্বী ব্যক্তি। নিম্নে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ডাঃ জেন্‌স্‌— ব্রুকলিন নৈতিক সভার সভাপতি। প্রফেসর এভারেট— হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন। প্রফেসর জেম্‌স্‌— হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক এবং পাশ্চাত্ত্য জগতের একজন প্রধান দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিৎ। প্রফেসর রাইট— হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে ইনিই স্বামীজিকে চিকাগো ধর্ম্মসভায় পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। মিসেস্‌ বুল—কেম্‌ব্রিজ কন্‌ফারেন্সের একজন প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক এবং আমেরিকা ও নরওয়ের একজন গণনীয়া রমণী। মিঃ ফক্স—কেম্‌ব্রিজ কন্‌ফারেন্সের অবৈতনিক সম্পাদক। প্রফেসর রয়েস—হার্ভার্ডের দর্শনাধ্যাপক এবং উচ্চাঙ্গের দার্শনিক লেখক। ইনি অনেক বিষয়ে স্বামীজির নিকট ঋণী।

উপর্য্যুক্ত পত্র ব্যতীত ব্রুকলিন নৈতিক সভা হইতেও স্বামীজির স্তুতি, প্রশংসা ও বিজয়বার্ত্তা-পরিপূর্ণ আর একখানি পত্র আসে। তাহার শিরোনামায় লিখিত ছিল—'আমাদের ভারতীয় আর্য্য ভ্রাতৃগণের প্রতি।' পত্রের বহুসংখ্যক অনুলিপি মান্দ্রাজে মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

ডেট্রয়েট হইতেও বিয়াল্লিশ জন বিশিষ্ট বন্ধুর স্বাক্ষরিত একখানি অভি-নন্দনলিপি আসিয়াছিল। তাহাতে লিখিত ছিল, "মানব-জাতির মাতৃস্থানীয়া প্রাচীন আর্য্যজাতির এক শাখা কর্ত্তৃক শাসিত, প্রাচীন অথচ নবীন এই দেশের এই বহুদূরবর্ত্তী নগরী হইতে আমরা আপনাকে আপনার জন্মভূমি—যেখানে যুগযুগান্তরের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিহিত আছে—সেই ভারতভূমিতে আপনা কর্ত্তৃক আমাদিগের নিকট আনীত বাণীর প্রতি হৃদয়ের একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিজ্ঞাপিত করিতেছি। আর্য্যবংশোদ্ভব প্রতীচ্যবাসী আমরা আমাদের প্রাচ্য ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে এত দীর্ঘকাল পৃথক হইয়াছি যে আমরা যে একই শোণিত হইতে উৎপন্ন তাহা আপনার আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলাম বলিলেই হয়। কিন্তু আপনি

এদেশে আসিয়া আপনার দিব্য সামীপ্য ও অনুপম বচনচ্ছটায় আমাদের মধ্যে সেই নির্ব্বাণপ্রায় জ্ঞানবহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে আমেরিকার আমরা ও ভারতের আপনারা বিভিন্ন নহি—মূলতঃ এক।

"প্রেমময় ও জ্ঞানময় জগদীশ্বর সকল কার্য্যে আপনার সহায় ও নিয়ন্তা হউন এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণ আপনাকে আশ্রয় করুক। ওঁ তৎ সৎ।"

অন্যান্য পত্রের মধ্যে একটি পত্রে স্বামীজি বড় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তাহাতে আমেরিকাবাসিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার গুরুভাইদিগের অভ্যর্থনা ও তাঁহাদের কর্ম্মের বিস্তার ও সফলতার বৃত্তান্ত ছিল। নিউইয়র্কস্থ 'নিউসেঞ্চুরি হল'-এ বেদান্তসভার ছাত্রগণ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীকে যে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তৎপ্রসঙ্গে ডাঃ ই. জি. ডে বলিয়াছিলেন—

"ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন অনেককে দেখিতেছি যাঁহারা আমাদের অশেষগুণভূষিত প্রিয়তম আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমুখ হইতে বেদান্তের গভীর তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইতেন। আরও অনেককে দেখিতেছি যাঁহারা সেই প্রিয় মিত্র ও শিক্ষাদাতা গুরুর স্বদেশগমনে দুঃখে সন্তাপিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুনরাগমনের জন্য দীর্ঘকাল একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে তাঁহার পরিত্যক্ত কার্য্যভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। ইঁহার নাম স্বামী সারদানন্দ। এখন হইতে ইনিই আমাদিগকে বেদান্ত শিক্ষা দিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যের ন্যায় ইঁহাকেও আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদনে উন্মুখ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহাই আপনাদের বর্ত্তমান মনোভাব। অতএব আসুন এক্ষণে সকলে মিলিয়া এই নবাগত আচার্য্যকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করি।"

পরমহংসদেবের নিকট যেমন নানা শ্রেণীর ও নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত,

সাধু ও সাধক আসিতেন, স্বামীজির নিকটও সেইরূপ বিবিধ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও নানাসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি আসিতে লাগিলেন। আগমবাদী বৈখানস সম্প্রদায়ের একজন বৃদ্ধ তিরুপাতি হইতে আসিয়া স্বামীজির গলদেশে মাল্যদান করিলেন এবং তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "ইনি স্বয়ং বিখানস।" এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিখানসকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ইঁহারা কর্ম্মযোগের বড় অনুরাগী। এই ব্যক্তি স্বামীজির নিকট কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিলেন, "আমি আজন্ম কর্ম্মযোগ ও বৈখানস নীতির মধ্যে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি বটে, কিন্তু আপনি আমা অপেক্ষা তাহার তত্ত্ব অনেক বেশী জানেন।"

কিন্তু এই দেশব্যাপী উচ্চ সম্মান ও দেববৎ পূজা স্বামীজির চিত্তে বিন্দুমাত্রও দম্ভরূপ মালিন্যের সঞ্চার করিতে পারে নাই। তিনি তাহাদিগের এই ভাব তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মানার্থ বলিয়া মনে করিলেন না, কিন্তু দেখিলেন ইহাতে ভারতবাসীর আন্তরিক ধর্ম্মপ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুরাগ সূচিত হইতেছে। তিনি শুধু ভগবানের দয়ায় এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকমাত্র হইয়াই তাহাদিগের নিকট এতটা শ্রদ্ধালাভের অধিকারী হইয়াছেন। বাস্তবিক এত সম্মান হজম করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতে তিনি সিংহাসনাধিষ্ঠিত নৃপতির ন্যায় সম্মান পাইয়াছেন। স্বামীজির দেহত্যাগের বহু পরে একজন বক্তা এক সময়ে আমেরিকায় বলিয়াছিলেন—"বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ সম্মান, সংবর্দ্ধনা ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বর্ত্তমান ভারতের এই মহান্ স্বদেশপ্রেমিক সাধুব্যক্তির প্রতি সকলে যেভাবে হৃদয়ের অকপট ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যেরূপ উৎসাহের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় কোন রাজা বা মহারাজা,

এমন কি কোন রাজপ্রতিনিধি পর্য্যন্ত আজ অবধি এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হন নাই।"

কিন্তু তথাপি তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি যে মাতৃসেবক, সেই মাতৃসেবক। তিনি কখনও হৃদয় হইতে সেবার ভাব দূর করিয়া অন্য ভাব পোষণ করেন নাই। উক্ত বক্তা বলিয়াছিলেন—

"জগতের তিনটি শ্রেষ্ঠ জাতির নিকট হইতে মহোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও স্বামী বিবেকানন্দের চিত্ত কখনও গর্ব্ব বা আত্মশ্লাঘাজনিত পুলকে উৎফুল্ল হয় নাই কিংবা তদীয় শির মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিযুক্ত হয় নাই। চিরদিন সেই একই ভাব—আমেরিকা-আগমনের পূর্ব্বেও যে বালকবৎ সরল ও বিনম্র ভাব তাঁহাতে ছিল পরেও তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। সর্ব্বসময়েই ত্যাগ-বৈরাগ্যবহ্নি-পরিপূর্ণ সে হৃদয় নশ্বর গৌরবের ক্ষণিকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিত।" বাস্তবিক তিনি বৈরাগ্যের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন—নিন্দা-স্তুতিতে কখনও বিচলিত হন নাই। এখানে স্তুতির কথা বলিলাম, অন্যত্র নিন্দার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

কলিকাতায়

মান্দ্রাজ হইতে স্বামীজি ষ্টীমারে চড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে ইতোমধ্যে তাঁহার সম্মানার্থ বিপুল আয়োজন হইতেছিল। স্বয়ং দ্বারবঙ্গাধিপ অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। কলিকাতা-বাসিগণ তাঁহার ভারতভূমিতে পদার্পণের দিন হইতেই অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও মতামত শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

খিদিরপুরে আসিয়া ষ্টীমার থামিল। অভ্যর্থনাসমিতির বন্দোবস্ত অনুসারে ওখান হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেনে স্বামীজি ও তাঁহার সহযাত্রীরা বেলা সাড়ে সাতটার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। তথায় প্রায় বিংশতি সহস্র লোক ঔৎসুক্যপূর্ণ চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের লোকেরা তাঁহাকে যে বিদায়কালীন অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিল, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছিল। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল। স্বামীজি গাড়ীতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাগত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত অথচ কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া কলিকাতাবাসিগণের মন উৎসাহে ভরিয়া গেল। 'জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকি জয়', 'জয় স্বামী বিবেকানন্দকি জয়' শব্দে ষ্টেশন ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। ইণ্ডিয়ান মিরর-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন সভ্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান একখানি বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ীর

দিকে গমন করিতে লাগিলেন। স্বামীজি আশেপাশে তাঁহার গেরুয়া-বেশধারী গুরুভ্রাতাদিগকে লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু তখন আর আলাপের বিশেষ সুবিধা হইল না। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য পুষ্প ও মাল্যোপহার বর্ষিত হইতেছিল। তিনি তাহারই ভারে শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে স্বামীজি সেভিয়ার-দম্পতিকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত ল্যাণ্ডোতে আরোহণ করিবামাত্র স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা আসিয়া গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পিছনে একটি সঙ্কীর্ত্তনের দল আসিতেছিল, তাহার পশ্চাতে অগণন লোক। পথের দুইধারে লোকে লোকারণ্য এবং চতুর্দ্দিক নানা রঙ্গের নিশান, ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া সাজান। সার্কুলার রোড, হ্যারিসন রোডের মোড় এবং রিপন কলেজের সম্মুখভাগে তিনটি সুসজ্জিত গেট্। স্বামীজি রিপন কলেজে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাগবাজারস্থ ভবনে গুরুভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় পশুপতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অপরাহ্নে আলমবাজারস্থ মঠে গিয়া রহিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ গোপাললাল শীলের কাশীপুরস্থ উদ্যানে রহিলেন। স্বামীজি মঠ হইতে প্রত্যহ তথায় আসিয়া আগন্তুকগণকে দর্শন ও নানাবিধ উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। প্রত্যহ কত লোক যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত তাহার সংখ্যা হয় না! তাহার উপর শত শত পত্র ও টেলিগ্রাম ত ছিলই।

এই ভাবে এক সপ্তাহ অতীত হইলে অবশেষে ১৮৯৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দিন মহানগরীর অধিবাসিগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শোভা-

বাজারের রাজা স্থার রাধাকান্ত দেবের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সম্মিলন-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্বামীজি সেখানে উপস্থিত হইলে সকলে বিশেষ সমাদরসহকারে তাঁহাকে সভামধ্যে বসাইলেন। সভায় অনেক প্রথিতনামা উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় কাহারও অভ্যর্থনার জন্য এ নগরীতে এত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আর কখনও সমবেত হন নাই। উঠানে ও বারান্দায় অন্যূন পাঁচ হাজার লোক জমিয়াছিল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ভারতের জাতীয় জীবনে এই পুরুষসিংহ অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। লক্ষের মধ্যে কচিৎ একজন এরূপ মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়।" তারপর তিনি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন এবং একটি রৌপ্যপাত্রে করিয়া উহা স্বামীজির হস্তে প্রদান করিলেন।

স্বামীজির আগমনের পূর্ব্বে এদেশের অনেক লোক যেমন তাঁহার অসাধারণ গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুরাগী ও পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, অপর কতকগুলি লোক আবার তেমনি ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার বিরুদ্ধবাদীও হইয়াছিলেন। কোন কোন গোঁড়া কাগজওয়ালা তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতেও কুন্ঠিত হন নাই। মোট কথা তাঁহার এই বিশ্বব্যাপী গৌরবটাকে অনেকে অনেকরকম ভাবে ও বিশেষ কৌতূহলের সহিত দেখিতেছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য, সমালোচনা, মতামত ও জল্পনা-কল্পনা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু কলিকাতা-অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিয়া তিনি যে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন ও যেরূপ বিনয়নম্র বচনে এবং আন্তরিক অকপটতার সহিত নিজের বিষয়ের উল্লেখ করিলেন তাহাতে সকলের মতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেই বক্তৃতার অদ্ভুত মাধুর্য্য এককালে

সকলকে মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি উঠিয়াই বলিলেন, "মানুষ আপনার মুক্তিচেষ্টায় জগৎপ্রণেতার সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়। মানুষ নিজ আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধুবান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে, অতিদূরে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে; এমন কি মানুষ নিজে যে সার্দ্ধ-ত্রিহস্তপরিমিত দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অন্তরে অন্তরে সে সর্ব্বদাই একটা মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্ব্বদাই বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কাণে কাণে মৃদুস্বরে বলিতে থাকে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' হে ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসিগণ! আজ তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্ম্মপ্রচারকরূপেও নহে। কিন্তু পূর্ব্বের সেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয় এই নগরীর রাজ-পথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের ন্যায় সরল প্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলি।" তারপর শিকাগো ধর্ম্মমহাসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মার্কিন জাতির সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, অজ্ঞানই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে বিদ্বেষের মূলীভূত কারণ। কিন্তু লোকে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাইল যখন তিনি নিজের কৃতকার্য্যতার জন্য বিন্দুমাত্র অভিমান প্রকাশ না করিয়া সকল কর্তৃত্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর অর্পণ করিলেন। পাঠক, দেখুন, গুরুর প্রতি কি অপূর্ব্ব ভক্তি! তিনি বলিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা আমার হৃদয়ের আর এক তন্ত্রী—সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গ্রহণ করিয়া। যদি আমি কায়-

মনোবাক্য দ্বারা কোন সৎকার্য্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই। সকল গৌরব তাঁহার। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দোষ আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্য, বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয় নাই।"

সর্ব্বশেষে তিনি কলিকাতাবাসী যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে।...তোমরা বলিয়াছ আমি কিছু কার্য্য করিয়াছি। যদি তাহা হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম— আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতদূর করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমাপেক্ষা কত অধিক কার্য্য করিতে পার! উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।...আমি ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্যেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই কার্য্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার করিবে যে, আমি কল্পনায়ও তাহা কখনও আশা করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদের উপর।..."

পাঠক জানেন তিনি দশ বৎসর কাল কিরূপে ভারতের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে যে শক্তি সুপ্তভাবে নিহিত আছে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ দেশবাসীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এই বক্তৃতা ও তাঁহার চরিত্র-প্রভাব সর্ব্বত্র এক অভিনব ভাব সৃষ্টি করিল এবং তিনি বর্ত্তমান যুগের পথপ্রদর্শক বলিয়া সহজেই সকলের বরণীয় হইলেন।

ইহার কয়েক দিবস পরে তিনি ষ্টার থিয়েটারে 'সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত' শীর্ষক আর একটি বক্তৃতা করেন, এবং তাহাতে বলেন বেদান্তপ্রচার দ্বারাই ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধিত হইবে।

কিয়দ্দিনের মধ্যে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে বিরাট উৎসবের আয়োজন হইল। স্বামীজিকে পাইয়া এবার সাধারণের উৎসাহ ও আনন্দের পরিসীমা ছিল না। স্বামীজি তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত বেলা ৯টা ১০টার সময় বাগানে উপস্থিত হইলেন—নগ্নপদ, শীর্ষে গৈরিক বর্ণের উষ্ণীষ ও সর্ব্বাঙ্গ সুদীর্ঘ গৈরিক আলখাল্লায় আবৃত। তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখের অগ্নিশিখাসম বাণী শ্রবণ করিবে বলিয়া অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর অনেক অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে অসংখ্য লোক। স্বামীজি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির আনত হইল। তারপর ৺রাধাকান্ত জীউকে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাসগৃহে গমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে তখন আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ স্বামীজির দর্শনলাভে পুলকিত হইয়া ঘন ঘন 'জয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ত্তনদল নাচিতেছে ও গাহিতেছে, অদূরে নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মপিপাসা ও

অনুরাগ মূর্ত্তিমান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছেন। সেবারকার উৎসব যে কি হর্ষের বন্যা বহাইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

স্বামীজির সহিত দুইটী ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আসিয়াছিলেন। স্বামীজি তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া পঞ্চবটী ও বিল্বমূলদর্শনে গমন করিলেন এবং যাইতে যাইতে শরৎ চক্রবর্ত্তীর রচিত উক্ত উৎসবসম্বন্ধীয় একটি সংস্কৃত স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বামীজি উহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আরও লিখিবার জন্য শরৎ বাবুকে উৎসাহ দিলেন।

পঞ্চবটীতে ঠাকুরের অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নাট্যাচার্য্য গিরিশ বাবুকে দেখিয়া স্বামীজি প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "ঘোষজা, সেই একদিন আর এই একদিন!" গিরিশ বাবুও প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে আরও দেখি।" তারপর উভয়ের মধ্যে যেসকল কথা হইল বাহিরের লোকে অনেকেই তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্বামীজি বিল্ববৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর গিরিশ বাবু উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"একদিন হরমোহন মিত্র কি খবরের কাগজ দেখে এসে বললে যে স্বামীজির নামে আমেরিকায় কি একটা কুৎসা রটেছে। আমি তখন তাকে বলেছিলাম, 'নরেনকে যদি নিজ চক্ষে কিছু অন্যায় করতে দেখি তবে বলবো আমার চোখের দোষ হয়েছে—চোক উপড়ে ফেলবো। ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে?'"

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাগত লোকেরা স্বামীজিকে ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে বলিল। কিন্তু সেই বিরাট জনসঙ্ঘের কোলাহলশব্দে তাঁহার কণ্ঠস্বর কোথায় ডুবিয়া গেল। তিনি অগত্যা বক্তৃতার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া

বসিয়া পড়িলেন এবং সকলের সহিত সহাস্যবদনে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তারপর আবার ইংরেজ মহিলা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে ও তাঁহার বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন। ইংরেজ মহিলারা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তাঁহার সঙ্গে বহুদূর দেশ হইতে আসিয়াছেন দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

বেলা তিনটার সময় তিনি আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে আসিতে আসিতে বলিলেন যে, সাধারণের জন্য (অর্থাৎ যাহারা উচ্চ দার্শনিক ভাবগ্রহণে অক্ষম) ধর্ম্মবিষয়ক উৎসব ও বাহ্য পূজানুষ্ঠানের অনেক সময়ে দরকার হইয়া পড়ে। হিন্দুদের বার মাসে তের পার্ব্বণ—এর উদ্দেশ্যই হইতেছে ধর্ম্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। তবে ওর একটা দোষও আছে। সাধারণ-লোকে ঐ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া ঐ সকলে মাতিয়া যায়, তারপর উৎসব-আমোদ থামিয়া গেলেই আবার যা, তাই হয়।

গোপাল শীলের বাগানে

এই সময়ে যদিও তিনি প্রধানতঃ গোপাললাল শীলের কাশীপুরের বাগানে ও আলমবাজার মঠে অবস্থান করিতেন, তথাপি প্রায় অন্যান্য রামকৃষ্ণভক্তদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং ধনী দরিদ্র সকলের সহিত সমভাবে মিশিতেন। স্বামীজির সুখ্যাতি তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত। সুতরাং অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি, উৎসাহশীল যুবক ও কলেজের ছাত্র প্রত্যহ তাঁহার দর্শনার্থ শীলেদের বাগানে আসিতেন। কেহ আসিতেন তাঁহার নিকট জ্ঞানোপদেশলাভের আশায়, কেহ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, আবার কেহ বা আসিতেন কেবল তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান-পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষে সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ ও তাঁহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। তাঁহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া অনেকেই মনে ভাবিতেন তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা বলেন, "প্রশ্নকর্ত্তারা স্বামীজির শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার উদ্ভিন্ন প্রতিভায় বড় বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নির্ব্বাক হইয়া অবস্থান করিতেন! স্বামীজির কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন।"

তিনি সকলেরই সহিত সমভাবে আলাপ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বেশী দৃষ্টি ছিল অবিবাহিত শিক্ষিত যুবকগণের উপর। তাহাদিগকে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন ও স্নেহ করিতেন এবং যদিও সময়ে সময়ে তাহাদিগের শারীরিক দৌর্ব্বল্য বা অন্য কোন দোষ দেখিলেই ভৎর্সনা

করিতেন, তথাপি তাহাদিগকেই তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ব্বদা ত্যাগ-বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ তাহাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিতেন। তিনি বাল্যবিবাহের অবিমৃষ্যকারিতা বা যুবকদিগের মধ্যে শ্রদ্ধা-বীর্য্যের অভাব দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, কঠোর ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর যে অফুরন্ত প্রেমের উৎস বহিত, সে উৎস সকলের পানে শতমুখে ছুটিয়া যাইত। সুতরাং কেহ তাঁহার তিরস্কারে বিরক্ত হইতেন না।

আমেরিকায় তাঁহার বেদান্ত-প্রচারের কৃতকার্য্যতা-শ্রবণে এ দেশের কতকগুলি বৈষ্ণব ভাবিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের প্রচারে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই; এবং সেইজন্য তাঁহার নিন্দা ও তাঁহার কার্য্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব-প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একদিন কথায় কথায় বলিলেন, "বাবাজি, আমি একদিন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমেরিকায় এক বক্তৃতা দিই। তাহাতে এত ফল হইয়াছিল যে এক অতুল সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিকারিণী যুবতী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন দ্বীপে কৃষ্ণচিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।' 'ত্যাগ' সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "ত্যাগ চাই। যাহারা ত্যাগ অভ্যাস না করে তাহারা ধীরে ধীরে অধঃপাতে যায়, যেমন বল্লভাচার্য্যের দল!"

পরের উপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করা তিনি সেবাধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। একদিন তিনি একটি যুবকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। যুবক বলিলেন, 'স্বামীজি, আমি অনেক দলে মিশিয়াছি; কিন্তু সত্য যে কি তাহা আজও ঠিক করিতে পারিলাম না। স্বামীজি সস্নেহে বলিলেন, "বৎস, ভয় নাই। আমারও একদিন ঐ অবস্থা ছিল; আচ্ছা বল, কোন্ কোন্ দল তোমায় কি উপদেশ দিয়াছে, আর

তুমি তাহার কতটা প্রতিপালন করিয়াছ।" যুবক বলিলেন যে থিওসফিক্যাল সম্প্রদায়ের একজন সুপণ্ডিত প্রচারক তাঁহাকে মূর্ত্তিপূজার আবশ্যকতা ও সত্যতা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই অবধি তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রত্যহ পূজা ও জপ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তথাপি শান্তি পান নাই। তারপর আর একজনের উপদেশে ধ্যানের সময় মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিষয় করিতে চেষ্টা করিয়াও তিনি শান্তি পান নাই। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমি প্রত্যহ দ্বার বন্ধ করিয়া ধ্যানে বসি ও অনেকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি। কিন্তু তবুও শান্তি পাই না কেন?" স্বামীজি বলিলেন, "শান্তি যদি চাও ঠিক উহার বিপরীত করিতে হইবে। দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, আর চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে দেখিতে হইবে। তোমার আশেপাশে কত লোক তোমার সাহায্যের প্রত্যাশায় রহিয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্য কর। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দাও, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দাও, যথাসাধ্য পরের উপকার কর—তাহাতেই মনের শান্তি হইবে।"

যুবক বলিল, "কিন্তু ধরুন, যদি পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে গিয়া আমি নিজে বিপদে পড়ি? রাত্রি-জাগরণ, অনিয়মিত আহার ইত্যাদিতে যদি আমার নিজেরই শরীর—।" স্বামীজি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্, বুঝেছি। তোমার সে ভয় নেই। তুমি কোন কালে পরের জন্য রাত্রি জাগতেও যাচ্ছ না, আর তোমার সেজন্য ব্যারামে পড়ারও কোন সম্ভাবনা নেই।" তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে আত্মসুখপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা কোন কালে পরের সেবা হয় না।

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণভক্ত জনৈক বিদ্বান অধ্যাপক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি যে কেবল সেবা, দান আর পরোপকারের কথা বল, ওসব ত মায়ারাজ্যের অন্তর্গত। যখন বেদান্তের মতে মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য, তখন মায়ার বেড়ি কাটানই দরকার, তবে এ সব

প্রচারের দরকার কি? এতেও ত শুধু সাংসারিক বিষয়ের দিকেই মনকে টেনে নিয়ে যায়!” স্বামীজি মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, মুক্তির ধারণাটাও কি মায়ার অন্তর্গত নহে? বেদান্ত কি বলছেন না যে আত্মা চিরমুক্ত? তবে আবার আত্মার মুক্তির জন্য চেষ্টা কেন?”

প্রশ্নকর্ত্তা নীরব রহিলেন। তাঁহার মতে ভক্তিযোগ, ধ্যান ও মুক্তির চেষ্টাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন; আর বাকী সব, এমন কি কর্ম্মযোগ পর্য্যন্ত সবই মায়া। তাঁহার এ ধারণা ছিল না যে জীবন্মুক্তের নিকট সবই মায়া। কিন্তু প্রবর্ত্তক অবস্থায় সব মার্গেরই উপযোগিতা আছে।

স্বামীজি এদেশে কর্ম্মযোগের প্রচার বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে এখানে ধ্যানধারণা, মুক্তিকামনা ও সংসারপরাঙ্মুখতা যত সুলভ, তেজস্বিতা আত্মনির্ভর ও কর্ম্মোৎসাহ তত নহে! তিনি বলিতেন, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া দেশটা ধীরে ধীরে জড়তা ও অবসাদের তমোময় গর্ভে দিন দিন ডুবিতেছে। আমি কিছু নহি, আমি কিছু নহি, অতি হীন আমি, অতি নীচ আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মানুষ যে ক্রমে প্রকৃতই হীন হইয়া যায়, ইহা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; সেইজন্য ঐ সকল ভাবের বড় একটা প্রশ্রয় দিতেন না। একদিন এক ব্যক্তি ‘ঈশানুসরণ’ নামক পুস্তক ও তাহার রচয়িতার প্রতি স্বামীজির অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে জানিয়া ঐ গ্রন্থোক্ত বিনয় ও ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ ভাবের বড় প্রশংসা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, “কি? নিজেকে তুচ্ছ ভাবা! কেন? আত্মগ্লানিতে কি লাভ? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা জ্যোতির সন্তান। যে জ্যোতিঃ বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করিয়া আছে

আমরা তাহাতে বাঁচিয়া আছি, তাহার মধ্যেই ডুবিয়া চলাফেরা করিতেছি।"

আর একদিন এক ব্যক্তি স্বামীজিকে 'অবতার' ও 'মুক্তপুরুষের' মধ্যে প্রভেদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিদেহমুক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। আমি যখন সাধনাবস্থায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলাম তখন অনেক দিন নির্জ্জন গিরিগুহায় কাটাইয়াছিলাম এবং মাঝে মাঝে মুক্তি দূরবর্ত্তী দেখিয়া প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতাম। কিন্তু এখন আর আমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাই। এখন ভাবি, ব্রহ্মাণ্ডের একজনও যতদিন বদ্ধ থাকিবে ততদিন আমার নিজের মুক্তি চাই না।" বুদ্ধদেবও একদিন ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। বোধ হয় যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য যুগাচার্য্যরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তাঁহারাই মুক্তিকে এইরূপ করতলামলকবৎ বোধ করেন, কারণ তাঁহাদের জীবন শুধু পরকে মুক্তিপথে অগ্রসর করিবার জন্য, নিজের মুক্তির জন্য নহে।

দেশের দুর্দ্দশাদর্শনে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি এখন হইতে কায়মনোবাক্যে তাহারই প্রতিকারসাধনে ব্যাপৃত হইলেন। এ প্রতিকারের প্রথম সোপান ভারতে জাতিপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু এখানে মানুষ কৈ! যাহাদের লইয়া জাতি তাহারা কোথায়? সেইজন্য তিনি বক্তৃতা, উপদেশ, স্বীয় আদর্শ চরিত্র ও স্বীয় আদর্শে গঠিত গুরুভ্রাতাগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা এদেশে লোকচরিত্রগঠনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষব্যাপী অধীনতা, দাসত্ব ও সামাজিক রাজনৈতিক উভয়বিধ অত্যাচারে এ দেশের জনসাধারণ হীনবীর্য্য ও মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে সমপ্রাণতা, সহানুভূতি, শৌর্য্য, বীর্য্য এককালে তিরোহিত হইয়া তৎস্থানে ভীরুতা, কাপুরুষতা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা রাজত্ব করিতেছে।

এইগুলি দূর করিতে না পারিলে এদেশের মঙ্গল বা উন্নতিসাধন কখনই সম্ভবপর নহে। ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, 'শক্তি চাই—শক্তি সঞ্চয় কর।' মান্দ্রাজে এক বক্তৃতায় স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "আমাদের আবশ্যক শক্তি—শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উহার প্রত্যেক ছত্র আমায় শিখাইয়াছে—শক্তি।" তিনি ভাবিতেন যে স্বদেশবাসীর এই অসীম শক্তি জাগাইয়া তোলাই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। তিনি একজন শিষ্যকে একদিন বলিয়াছিলেন—"সংগ্রামশীলতাই জীবনের চিহ্ন। যে জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই, সে জাতটা মরেছে—যেমন আমাদের জাত। হাজার বছর কি তারও বেশী দিন ধরে তোরা শুন্‌ছিস্ যে তোরা কিছু নয়, কোন কাজেরই নয়, শুনে শুনে তোরা বিশ্বাস করছিস্ বুঝি সত্যই তোরা অপদার্থ। কিন্তু যদিও এদেশের মাটিতে এ শরীরের পয়দা হয়েছে, তথাপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি ওরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিইনি, নিজের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। তাই প্রভুর দয়াতে, যারা এতদিন ধরে আমাদের লাথিঝাঁটা মেরে আসছিল, তারাই আজ আমাকে তাদের শিক্ষাদাতা গুরু ব'লে মানতে আরম্ভ করেছে। তোরাও যদি আপনাদের উপর বিশ্বাস রাখিস, শ্রদ্ধা রাখিস, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হস, তবে তোরাও ঠিক আমার মতন হবি, অসাধ্য সাধন করবি। আমি সেই আদর্শ দেখাতেই তোদের মধ্যে এসেছি! এই সত্যটা শেখ। আর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহদ্বারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর, 'ওঠো, জাগো, আর স্বপ্নঘোরে থেকো না, তোমার ভেতর অমিতবিক্রম রয়েছে, তাকে জাগাও।' এমন কোন অভাব, এমন কোন দৈন্য নেই যা আত্মশক্তিস্ফুরণ দ্বারা না দূর করা যায়। এ সব বিশ্বাস কর তা হলেই তোরা সর্ব্বশক্তিমান হয়ে যাবি।"

কিন্তু নিরন্ন দেশে শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে শুষ্ক বক্তৃতারোমন্থনের উপর নির্ভর করিলে চলে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্নদানের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। এ বিষয়ে যাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাদের প্রতি তিনি কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। কলিকাতায় পদার্পণের তিন-চারি দিন পরে একদিন স্বামীজি বাগবাজারে ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময়ে 'গোরক্ষিণী সভা'র একজন হিন্দুস্থানী প্রচারক চাঁদা-আদায়ের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?"

প্রচারক—আমরা গোমাতাদিগকে ক্রয় করিয়া কসাইদের হাত হইতে উদ্ধার করি, আর স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করিয়া সেখানে দুর্ব্বল, রুগ্ন ও জরাগ্রস্ত গোসকলকে রক্ষা ও পালন করিয়া থাকি।

স্বাঃ— উদ্দেশ্য খুব সৎ। তা' কি করে এ সব চলে?

প্রঃ— এই আপনাদের মত পাঁচজন মহাত্মার দানে।

স্বাঃ— আপনাদের ফণ্ডে কত টাকা আছে?

প্রঃ— মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরাই আমাদের সভার প্রধান উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারাই বেশী পরিমাণ টাকা দিয়া থাকেন।

স্বাঃ—মধ্যভারতে ভারি দুর্ভিক্ষ হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট একটা রিপোর্ট ছাপিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৯ লক্ষ লোক অনাহারে মরেছে। আপনাদের সভা থেকে এই দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের জন্য কি কোন চেষ্টা হয়েছে?

প্রঃ—আমরা দুর্ভিক্ষে-টুর্ভিক্ষে সাহায্য করি না। শুধু গোমাতাগণকে রক্ষা করাই আমাদের কাজ।

স্বাঃ—আপনাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরছে, আর এক-গ্রাস অন্ন দিয়ে তাদের রক্ষা করা কি আপনাদের কর্ত্তব্য বলে মনে হয় না?

প্রচারক মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "না। তারা নিজ নিজ কর্ম্মফলে—পাপের ফলে দুর্ভিক্ষে মরছে। যেমন কর্ম্ম করেছে তেমনি ভুগছে।"

এই কথা শুনিয়া স্বামীজির বিশাল চক্ষু অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল ও মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু তিনি আত্মভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন, "বাপু! মানুষের দুঃখে যাদের প্রাণ কাঁদে না, যারা নিরন্ন ভায়েদের চক্ষের সম্মুখে অনাহারে মরতে দেখেও একমুঠো চাল দিয়ে সাহায্য করে না, অথচ পশুপক্ষীকে বাঁচাবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করে, এমন কোন সভা-সমিতির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব বা সহানুভূতি নেই, এরকম সভা-সমিতির দ্বারা যে কোন সৎকার্য্য হতে পারে, এ আমার বিশ্বাস হয় না। 'কর্ম্মফলে মরছে মরুক'—এ রকম নিষ্ঠুর কথা বলতে তোমার লজ্জা হল না? কর্ম্মফলের কথা তুললে ত কোনপ্রকার পরোপকারেরই দরকার নেই। তোমার কথাই বলি, গোমাতারা যে কসাইদের হাতে পড়েন সেও ত কর্ম্মফলে। তবে আর তাদের বাঁচাবার দরকার কি?"

প্রচারক ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, আপনি যা বলছেন সে কথা সত্য বটে। তবে শাস্ত্রে আছে গাভী আমাদের মাতা।"

স্বামীজি ঈষৎ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "হাঁ, গাভী যে তোমাদের মাতা তা বেশ বুঝতে পারছি। তা না হলে এমন সব ছেলে জন্মাবে কোথা থেকে?"

বোধ হয় সেই পশ্চিমী প্রচারক এই বিদ্রূপের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। সেইজন্য আর কিছু না বলিয়া পুনরায় স্বামীজির নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজি বলিলেন, "দেখিতেছ আমি সন্ন্যাসী মানুষ। টাকা কোথায় পাইব? আর যদিই লোকে আমায় কিছু ভিক্ষা দেয়, তবে আমি সর্ব্বাগ্রে তাহা মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিব, তাহাদিগকে আহার, বস্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি দিব। তারপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তোমাদের সভায় দিতে পারি।"

লোকটি চলিয়া গেলে স্বামীজি বলিলেন, "কর্ম্মবাদের প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত চলেছে দেখ। বলে কি তারা কর্ম্মফলে মরছে; তাদের সাহায্য করবো কেন? এতেই আজ দেশের এই দুর্গতি!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শীলেদের বাগানে ও আলমবাজারের মঠে অনেক ব্যক্তি স্বামীজির দর্শনার্থ আসিতেন, এবং সকলেই তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মের উদারভাব লইয়া গৃহে ফিরিতেন। যতই গোঁড়া হউক না কেন, স্বামীজির নিকট যাইলেই তাহার দৃষ্টিশক্তির প্রসার বাড়িত ও মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যাইত। উদাহরণস্বরূপ এখানে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। কতকগুলি গুজরাটি পণ্ডিত স্বামীজির নাম ও বিদ্যাগৌরব শুনিয়া পরীক্ষা করিবার মানসে একদিন শীলেদের বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই দর্শনশাস্ত্রবিশারদ ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ তাঁহাদের সংস্কৃতে অনর্গল কথোপকথন করিবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা আসিয়াই স্বামীজিকে সংস্কৃতে প্রশ্ন করিলেন; মতলব যে তাঁহাকে বিপদে ফেলিবেন। কিন্তু যদিও তাঁহার কয়েক বৎসর ধরিয়া আদৌ সংস্কৃত বলা বা সংস্কৃত চর্চ্চা করা অভ্যাস ছিল না, তথাপি তিনি অতি ধীর গম্ভীর ভাবে বিশুদ্ধ ও সুললিত সংস্কৃতে তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তর ও তর্কের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। সমাগত সকলেই এবং পরে পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছিলেন যে স্বামীজির ভাষা পণ্ডিতদিগের ভাষা অপেক্ষা অনেকাংশে সরস ও শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। সকলেই সেদিন তাঁহার ক্ষমতাদর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। কেবল এক স্থানে তিনি ভ্রমক্রমে 'স্বস্তি' বলিতে 'অস্তি' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। অমনি পণ্ডিতগণ মহা হাস্য, চীৎকার ও কোলাহল করিয়া উঠিলেন। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিতানাং দাসোঽহং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্'

—আমি পণ্ডিতগণের দাস, আমার এই ব্যাকরণ-স্খলন ক্ষমা করুন। পণ্ডিতেরা তাঁহার সৌজন্য ও বিনয়দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন।

বিচারের বিষয় বহুল ও বিবিধ ছিল। তবে মুখ্য বিষয় ছিল 'পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ?' স্বামীজি বাদে সিদ্ধান্তপক্ষ ও পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর অবশেষে তাঁহারা সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্য্যাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং যাইবার সময়ে সকলের সমক্ষে বলিয়া গেলেন, "ব্যাকরণশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ-প্রণিধানে স্বামীজির অসাধারণ অধিকার আছে। তিনি প্রকৃত শাস্ত্রার্থদ্রষ্টা এবং তর্ক ও বিচারের ক্ষমতাও তাঁহার অতি অভিনব। আর যেভাবে তিনি বাদখণ্ডন ও মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও অদ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।" স্বামীজির ভক্তেরা আরও শুনিতে পাইলেন পণ্ডিতেরা আপনাদিগের মধ্যে বলাবলি করিতেছেন, "স্বামীজির চোখের একটা মাদকতা-শক্তি আছে। ঐ শক্তিতেই বোধ হয় উনি জগৎ জয় করেছেন।" বস্তুতঃই তাঁহার মোহিনী দৃষ্টিশক্তির প্রভাব রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। সে শুধু পাণ্ডিত্যের আভা নহে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যের বিষম তেজ। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন, অমন চোখ কখনও জীবনে দেখে নি।

পণ্ডিতেরা প্রস্থান করিলে স্বামীজি তাঁহাদের বিদ্রূপ স্মরণ করিয়া বলিলেন, অনেক বৎসর সংস্কৃতে কথা বলার অভ্যাস না থাকায় ওরূপ ভ্রম হইয়াছিল। অবশ্য সেজন্য তিনি পণ্ডিতগণের উপর দোষারোপ করিলেন না, তবে বলিলেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যসমাজে কেবল বাদের মূল বিষয়ের প্রতিই সকলের লক্ষ্য থাকে, ভাষার দোষ বা ব্যাকরণগত ত্রুটির প্রতি কেহ

কোনরূপ কটাক্ষ করেন না। কারণ উহা শিষ্টাচারসম্মত নহে। আমাদের দেশে কিন্তু এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে খুব কচ্‌কচি হয়।

স্বামীজির গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে কিরূপ আন্তরিক ভালবাসিতেন নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। যতক্ষণ স্বামীজি বিচারে নিযুক্ত ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পার্শ্বের একটি ঘরে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ক্রমাগত জপ করিতেছিলেন, শেষে জানিতে পারা গেল স্বামীজি যাহাতে জয়লাভ করেন তজ্জন্য তিনি ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছিলেন।

আর একদিন প্রিয়নাথ সিংহের সহিত দুইজন ভদ্রলোক স্বামীজির নিকট 'প্রাণায়াম' সম্বন্ধে কতকগুলি জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সমাধান জন্য আসিয়াছিলেন। স্বামীজিকৃত 'রাজযোগ' নামক গ্রন্থ পাঠাবধি ঐসকল প্রশ্ন তাঁহাদিগের মনে উদিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন স্বামীজির সহপাঠী ছিলেন। অন্যান্য কয়েকজন লোকের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হইলে স্বামীজী জিজ্ঞাসিত না হইয়াই স্বয়ং প্রাণায়ামের কথা উত্থাপন করিলেন এবং বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রাণায়াম সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। তিনি এমন বিশদ করিয়া বিষয়টি বুঝাইলেন যে যাঁহার মনে যে-কিছু সন্দেহ ছিল সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল এবং আর কোন জিজ্ঞাস্য রহিল না। সকলেই বুঝিলেন এগুলি পুঁথিগত বিদ্যা নহে, কিন্তু অনুভূতির ফল। আর তিনি যাহা বুঝাইলেন তাহার অতি সামান্য অংশই তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কারণ এই—স্বামীজি কি করিয়া তাঁহাদের মনোভাব জানিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। পরে একদিন সিংহ মহাশয় স্বামীজির নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ও দেশেও অনেক সময় ঠিক এইরূপ ঘটিত, আর

লোকে আমায় জিজ্ঞাসা করিত কেমন করিয়া আমি তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কথা বলি এবং তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা করি।" কথায় কথায় জাতিস্মরতা, পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগজ শক্তির আলোচনা হইল। হঠাৎ এক জন স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামীজি, আপনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয় জানেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই।" কিন্তু যখন তাঁহারা অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিবার জন্য তাঁহাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিলেন, "আমি সে সবই জানি এবং ইচ্ছা করিলে আরও জানিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।" বাস্তবিক কেবল কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এসকল গুহ্য রহস্যের উদ্ভেদ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

এই সময়কার আর একটি ঘটনা হইতেও আমরা স্বামীজির অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তির পরিচয় পাই। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি মঠের একটি ঘরে বসিয়া স্বামী প্রেমানন্দের সহিত গল্প করিতে করিতে হঠাৎ স্তব্ধভাব ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কিছু দেখিলে?" তিনি বলিলেন, "না।" তখন স্বামীজি বলিলেন, "আমি এইমাত্র একটা প্রেতাত্মার ছিন্ন মুণ্ড দেখিলাম। সে কাতরভাবে তার কষ্টকর অবস্থা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছে।" অনুসন্ধানে জানা গেল বহু বৎসর পূর্ব্বে ঐ বাগানে একজন ব্রাহ্মণ দ্বারবান বাস করিত। সে অতিরিক্ত সুদ লইয়া টাকা ধার দিত। একদিন একজন খাতক তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়।

আরও অনেক বার স্বামীজি এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, আর সেই সময়ে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার কল্যাণার্থ প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করিতেন।

রামকৃষ্ণ মিশন-প্রতিষ্ঠা

অতঃপর স্বামীজির প্রধান চেষ্টা হইল গুরুভ্রাতাগণকে আপনার উদ্দেশ্যানুরূপ শিক্ষাদান। পূর্ব্বেও এ বিষয়ে কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদিগকে নিজ আদর্শে গঠিত করিতে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু এই পথে এক বিষম অন্তরায় ছিল, তাহা এ স্থলে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। পরমহংসদেবের ঈশ্বরৈকনিষ্ঠতা-দর্শনে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল আত্মমুক্তিসাধন বা ভগবৎপ্রাপ্তিই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। লোকসেবা বা দরিদ্রের দুঃখমোচন এসকল গৌণ কর্ম্ম। কিন্তু স্বামীজি লোকসেবাকেই সকল ধর্ম্মের সার ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ব্বত্র মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন। গুরু-ভ্রাতারা এ মতটির তত পোষণ করিতেন না, কারণ স্বামীজির এ মত পরমহংসদেবের মতের বিরোধী বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, পরমহংসদেব যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তিনি তাহা হইতে কোন ভিন্ন মত প্রচার করিতেছেন না। তাঁহারও লক্ষ্য সেই একবস্তু অর্থাৎ ঈশ্বর, তবে তাঁহার সাধনপ্রণালী আপাত-দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ধ্যান ধারণা সমাধি দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় এবং পরমহংসদেব তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে নিবৃত্তিমার্গের ঐ পন্থা তত সুগম না হওয়াতে এবং নিবৃত্তির নামে অলসতার বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া (বিশেষতঃ আমাদের দেশে) প্রবৃত্তিমূলক সেবাধর্ম্মের বহুল প্রচারই আবশ্যক। আর এ দেশের জনসাধারণের হীনাবস্থায় এরূপ সেবা ও সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে। সুতরাং ইহাতে দুইটি কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। প্রথমতঃ দেশের ও সমাজের

কল্যাণ, দ্বিতীয়তঃ নিরন্তর সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা-সম্পাদন ও তৎফলে জীবব্রহ্মের অভেদ—বেদান্তের এই সার সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি। পরমহংসদেবও পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে ভেদাভেদ-বর্জ্জনই ধর্ম্মের চরম পদ। বস্তুতঃ যে ব্যক্তির ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়াছে তিনি অতি সহজেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারী। সংসারত্যাগী যোগিগণ দুর্গম গিরিকন্দরে অনশন-অর্দ্ধাশনে শীতাতপ-সহিষ্ণু হইয়া ধ্যান বা বিচারের সহায়তায় পরিণামে যাহা লাভ করেন, সংসারসেবাপরায়ণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীরাও পরহিতসাধনে শত বাধাবিঘ্নের অতিক্রম, লজ্জা, ঘৃণা, আত্মসুখবিসর্জ্জন ও অনবহিত-চিত্তে সর্ব্বজীবের হিতচিন্তনের দ্বারা ঠিক সেই ফলই লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং কর্ম্মমার্গের সাধনা ভক্তি, জ্ঞান বা ধ্যানধারণামূলক সাধনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন বা নিকৃষ্টতর নহে। স্বামীজি গুরুভ্রাতাদিগকে বুঝাইলেন যে আত্মাভিমান বা যশোলিপ্সাপ্রসূত কার্য্য সকল সময়েই হেয়, কিন্তু অহংভাববর্জ্জিত সেবামাত্রলক্ষ্য কর্ম্ম অতীব প্রশংসনীয় ও চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বস্বভাব ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণলোকে এবং সকল লোকই যতক্ষণ পর্য্যন্ত রজস্তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া সত্ত্বভাবে অবস্থিত না হন ততক্ষণ ধ্যানধারণা ও জ্ঞানবিচারের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন না। পরমহংসদেবের শিক্ষা ও উপদেশ যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারা স্বামীজির কথার সহিত তাঁহার গুরুর কথার বিন্দুমাত্রও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার গুরুভ্রাতারা অনেকেই ক্রমে তাঁহার কথার তাৎপর্য্য বুঝিলেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিশেষতঃ স্বামীজির উপর তাঁহাদের সকলেরই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহারা জানিতেন স্বয়ং পরমহংসদেব বারংবার তাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ ও আচার্য্যকোটির থাক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সেইজন্য তাঁহারা বরাবর স্বামীজির কথা গুরুবাক্যবৎ মান্য করিতেন এবং এক্ষণেও তৎপ্রদর্শিত পথে চলিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার প্রথম ফলস্বরূপ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (যিনি বার বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও ঠাকুরের পূজারতি ত্যাগ করিয়া মঠের বাহিরে যান নাই) মান্দ্রাজে প্রচারকার্য্যে গেলেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষপীড়িত-দিগের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। আর স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দের আমেরিকাগমনের সংবাদ ইতঃপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপে ধীরে ধীরে সেবাশ্রমগঠন দ্বারা সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রব্রজ্যাবস্থায় আবু পর্ব্বতের সন্নিকটে স্বামীজি স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখিতে পাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আজও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

"আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমঘাট ঘুরিয়া আসিতেছি। কিন্তু হায়, স্বচক্ষে দেশবাসীর যে দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। এখন আমি বেশ বুঝিতেছি যে, দেশের এই হীনতা ও দারিদ্র্য না ঘুচাইতে পারিলে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা। এই জন্যই অর্থাৎ ভারতের মুক্তির উপায়বিধানের জন্যই বর্ত্তমানে আমি আমেরিকাযাত্রা স্থির করিয়াছি।"

কলিকাতার জলবায়ুতে স্বামীজির স্বাস্থ্য ক্রমশঃ আরও খারাপ হইতে লাগিল। অগত্যা চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে তিনি দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছিলেন। স্বামীজিও এক্ষণে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানানন্দ, গুড্উইন সাহেব, গিরিশবাবু,

ডাঃ টার্ণবুল এবং মান্দ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি জি নরসিংহাচার্য্য, শিঙ্গারবেলু মুদালিয়ার প্রভৃতি অনেকে গমন করিলেন। দার্জ্জিলিং-প্রবাসী মিঃ এম এন ব্যানার্জ্জি মহাশয় অতি সমাদরে তাঁহাদের সকলকে আপন গৃহে স্থানদান করিলেন। কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজাও স্বীয় 'রোজ-ব্যাঙ্ক' নামক প্রাসাদের একাংশ তাঁহাদের অবস্থানের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজিকে তিনি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন।

উপর্য্যুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। মতিলাল মুখোপাধ্যায় (যিনি পরে স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত হন) সে সময়ে ঐ বাটীতে ছিলেন। একদিন তাঁহার ভয়ানক জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে বিষম প্রলাপ উপস্থিত হইল। স্বামীজি তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমনি তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, অমনি সেই প্রবল জ্বর মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং কিয়ৎকালের মধ্যে একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে রোগী রোগযাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, তিনি বেশ শান্ত সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ইনি বড় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন এবং সঙ্কীর্ত্তনাদির সময়ে মাঝে মাঝে দশা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ অবস্থায় তিনি মাটিতে শুইয়া পড়িয়া হাত পা ছুঁড়িতেন ও চীৎকার বা গোঁ গোঁ করিতেন—সে এক বিষম কাণ্ড। একদিন কিন্তু স্বামীজি তাঁহার বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই হইতে তাঁহার ভাবপ্রবণতা কমিয়া যায় ও দশাপ্রাপ্তিও বন্ধ হয় এবং তিনি জ্ঞান-যোগ ও অদ্বৈতবাদের অতিশয় পক্ষপাতী হইয়া উঠেন।

দার্জ্জিলিং-এ স্বামীজি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলেও মোটের উপর বড় ভাল ছিলেন না। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য এত অধিক পরিমাণে ভগ্ন হইয়াছিল যে, চিকিৎসকেরা তাঁহাকে কোনও প্রকার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, এমন কি পুস্তক পর্য্যন্ত পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি অলসভাবে দিনযাপন মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর মনে করিতেন, সুতরাং দুইমাস পরে পুনরায় কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া এ সময়ে অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে স্বামীজির নিম্ন-লিখিত কয় ব্যক্তিকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করেন—বিরজানন্দ, নির্ভয়ানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নিত্যানন্দ। তন্মধ্যে বিরজানন্দ প্রায় ১৮৯১ সাল হইতে মঠে অবস্থান করিতেছিলেন এবং পরের দুইজন স্বামীজির পাশ্চাত্ত্যদেশে অবস্থানকালে মঠে যোগদান করেন। সর্ব্বশেষোল্লিখিত ব্যক্তি স্বামীজি অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং স্বামীজির ভারতাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। মঠের সন্ন্যাসিগণের মুখে শোনা যায়, ইঁহাদের মধ্যে একজনের পূর্ব্বজীবন ভাল ছিল না বলিয়া তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে সন্ন্যাসপ্রদানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু স্বামীজি বলিলেন, "আমরা যদি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তা হলে কে আর তাদের দেখবে? তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না। আর তা ছাড়া ও ব্যক্তি যখন মঠে আশ্রয় নিয়েছে তখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে ওর মন বদলে গেছে। আর তোমরা যদি অসৎ ব্যক্তিদিগকে সংশোধন করতে পারবে না মনে কর, তবে গেরুয়া ধারণ করেছ কেন, আর আচার্য্য হতে যাচ্ছ কি বলে?" স্বামীজির ইচ্ছাই বলবতী হইল। অনাথশরণ পতিতপাবন স্বামীজি নিজ কৃপাগুণে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আর সকলের আপত্তি ভাসিয়া গেল। দীক্ষা যথাবিধি সম্পন্ন হইল। দীক্ষালাভেচ্ছুগণ দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বদিবস মস্তকমুণ্ডন, উত্তরীয়ধারণ ও নিজ নিজ শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন। স্বামীজি অতিশয় উৎসাহ সহকারে তাঁহাদিগের অভীষ্ট পূরণ করিলেন এবং বলিলেন, "সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে— এরা ব্রহ্মচর্য্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের

ন্যায় অবস্থান করবে। 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'।" স্বামীজির আদেশে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্রাদ্ধক্রিয়ার পৌরোহিত্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারি-চতুষ্টয় যখন গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন তখন স্বামীজি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতগ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।" সেই রাত্রে আহারান্তে স্বামীজি অগ্নিময়ী ভাষায় কেবল ব্রহ্মচর্যা ও সন্ন্যাসেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—একথা বেদবেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব, তাদের কথা আদপেই নিবিনি। ওসব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য।—" ইত্যাদি বলিতে বলিতে স্বামীজির মুখমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় তেজোদীপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—তিনি যেন মূর্ত্তিমান সন্ন্যাসরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলে যায়—'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।" পরে নিজ ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ আমাদের জন্ম। কি কচ্ছিস্ সব বসে

বসে? ওঠ জাগ—নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর—নরজন্ম সার্থক করে চলে যা—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

ইহার কয় দিবস পরে স্বামীজি পুনরায় দুই জনকে দীক্ষাপ্রদান করেন—শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (স্বামিশিষ্যসংবাদ-প্রণেতা) ও স্বামী শুদ্ধানন্দ। স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন ব্রহ্মচারিরূপে মঠভুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই; এ দিন শরৎবাবু ও তিনি উভয়ে এইভাবে দীক্ষিত হইলেন। ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। দীক্ষান্তে স্বামীজি পূজাঘর হইতে বাহির হইয়া নির্ম্মলানন্দ স্বামীকে দেখিয়া আনন্দ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "তুলসী, আজ দুটো বলি হল।" তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া পাপের উৎপত্তি, অহংভাবনাশ ও আত্মজ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

এই সময়ে স্বামীজি আলমবাজারের মঠে এবং কখনও কখনও কলিকাতায় বলরাম বসু মহাশয়ের বাগবাজারস্থ ভবনে থাকিয়া যুবকগণের মধ্যে বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষা ও উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুদেশ ভ্রমণের ফলে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য না করিলে কোন বৃহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। সেজন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১লা মে তারিখে বলরাম বাবুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমুদয় গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যকে আহ্বান করিয়া একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিলেন। প্রথমে সঙ্ঘগঠনের আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "তবে আমার মনে হয় এদেশে এখন যেরূপ শিক্ষাবিস্তারের অভাব তাহাতে সাধারণতন্ত্র সঙ্ঘ এ দেশের পক্ষে আপাততঃ সুবিধাজনক নহে। সেই জন্য এই সঙ্ঘের একজন Dictator বা প্রধান পরিচালক চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সাধারণের চিন্তাক্ষেত্র প্রসারিত হলে সকলের মত লয়ে কার্য্য করা হবে।"

অতঃপর তিনি বলিলেন, "আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্য্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর পুণ্যনাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একার্য্যে সহায় হউন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ সকলে একবাক্যে এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে সঙ্ঘের নাম ও ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। গিরিশবাবু প্রস্তাব করিলেন উহার নাম হউক 'রামকৃষ্ণ প্রচার'। কিন্তু পরে উহা পরিত্যক্ত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে 'রামকৃষ্ণ মিশন' এই নামই স্থিরীকৃত হয়। নিম্নে উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিবৃত হইল—

"এই সঙ্ঘ রামকৃষ্ণ মিশন নামে পরিচিত হইবে।

ইহার উদ্দেশ্য—রামকৃষ্ণদেব জগতের হিতার্থে যে সকল সত্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং নিজ জীবনে যাহা প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রচার করা এবং জনসাধারণকে তাহাদের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য ঐ সকল তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করা।

ব্রত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের সকল ধর্ম্মকেই এক অক্ষয় সনাতন ধর্ম্মের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপন্থীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য যে কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।

কার্য্যপ্রণালী—(ক) যাহাতে সাধারণ লোকের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় এরূপ জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক-প্রণয়ন।

(খ) শিল্প-কলাদির বিবর্দ্ধন ও উৎসাহদান।

(গ) বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্ত্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য্যবিভাগ—যে-সকল সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ অপরকে শিক্ষা দিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদিগকে আচার্য্যব্রত-সম্পাদনোপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য ভারতের নগরে নগরে মঠ ও আশ্রম স্থাপন করা হইবে এবং যাহাতে তাঁহারা এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।

বৈদেশিক কার্য্যবিভাগ—ভারতেতর দেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎপ্রদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্দ্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও আদর্শ—লোক-সাধারণের সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান। রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

উপর্য্যুক্ত উদ্দেশ্যগুলির সহিত যাঁহার সহানুভূতি আছে বা যিনি বিশ্বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতে কোন বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনি এই সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অধিকারী।"

স্বামীজি সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহার সাধারণ সভাপতি হইলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ যথাক্রমে কলিকাতাকেন্দ্রের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি হইলেন। স্থির হইল প্রতি রবিবার অপরাহ্নে বলরাম বাবুর বাটীতেই সভার অধিবেশন হইবে এবং গীতা উপনিষদাদি শাস্ত্রপাঠ ও আবৃত্তি বা কোন বিষয়-বিশেষ অবলম্বন করিয়া বক্তৃতাদি হইবে। স্বামিশিষ্যসংবাদ-প্রণেতা শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। তিন বৎসর

রামকৃষ্ণ মিশন[১] এইখানেই ছিল এবং স্বামীজি পুনরায় পাশ্চাত্ত্যদেশে গমন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমিতির অধিবেশনসমূহে উপস্থিত থাকিয়া প্রায়ই উপদেশদান বা কিন্নরকণ্ঠে গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

রামকৃষ্ণ-মিশন স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে গুরু-ভ্রাতারা সকলে ইহার উদ্দেশ্যের পোষকতা করিতেন না। সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিতে লাগিলেন, "এইরূপে কাজ ত আরম্ভ করা গেল; এখন স্থাখ্ ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর কি হয়।" যোগানন্দ স্বামী বলিলেন, "সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া, লোকের উপকার করিব এরূপ অভিমান করা—এসব বিদেশী ভাব। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?" স্বামীজি বলিলেন, "তুই কি করে জানলি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? তা হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তাঁর পূজা প্রচার করতে বলেন নি, ধ্যানধারণা আর ধর্ম্মের যে সব উঁচু উঁচু কথা আমাদের তিনি শিখিয়ে গেছেন সেইগুলি উপলব্ধি করে জগৎকে শিক্ষা দিতে হবে। মনে করিসনি আমি আর একটা নূতন দল করতে বসেছি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।"

যোগানন্দ স্বামী চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামীজি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"দেখ, প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি, বেশ অনুভব করেছি তিনি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে এ সব কাজ করিয়ে

১। ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে যখন রামকৃষ্ণ মিশন আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হয় তখন কতকটা আইনের খাতিরে কতকটা অন্যান্য কারণে উপরি উক্ত নিয়মাদির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

নিচ্ছেন। যখন খেতে না পেয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন বাঁধবার কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না, যখন এক পয়সা সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা ঘুরবো মনে করেছি তখন দেখেছি তাঁর দয়ায় যেখানে গিয়েছি সেখানেই সাহায্য পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য চিকাগোর রাস্তায় মেয়ে মদ্দর গাঁদি লেগে যেত তখনও তাঁরই দয়াতে তত মানসম্ভ্রম—যার শতাংশের একাংশ পেলেও সাধারণ লোক ক্ষেপে যায়—অনায়াসে হজম করেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেখানে গেছি বিজয়লাভ করেছি। এখন চাই—এই দেশের জন্য কিছু করতে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্য্যে সাহায্য কর, দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সকলের কল্যাণ হবে।"

যোগানন্দ— তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই হবে। আমরা ত চিরদিনই তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এসকল কচ্ছেন, মাঝে মাঝে তা স্পষ্ট দেখতে পাই। তবু কি জান, মাঝে মাঝে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্য্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না! মনে হয় বুঝিবা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি। তাই তোমায় সাবধান করে দিই।

স্বামীজি— কথাটা কি জানিস? সাধারণ ভক্তেরা তাঁকে যতটুকু বুঝেছে তিনি বাস্তবিক ততটুকু নন। তাঁর লীলা অদ্ভুত—ভাব অসংখ্য! তাঁকে বোঝবার যো নেই। তাঁর উপমা তিনিই। নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুরও ধারণা হয়, কিন্তু তাঁর অনন্ত অসীম ভাবের ইয়ত্তা হয় না। তিনি মনে করলে কটাক্ষে লক্ষ বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তবুও যদি তিনি তা না করে আমার ভিতর দিয়েই তাঁর কার্য্য সাধন করতে চান, তবে আমি কি করতে পারি বল!

এই বলিয়া স্বামীজি কার্য্যান্তরে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। বাস্তবিক বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, স্বামীজির ভিতর

যে সর্ব্বভূতে প্রেম, অপরের দুঃখে সহানুভূতি, কারুণ্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইত তাহার সবগুলিই পরমহংসদেবে পূর্ণমাত্রায় ছিল। কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরমুখী বৃত্তিগুলি এত অধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল যে, সচরাচর সেইগুলিই সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইত, অন্যান্য ভাবগুলি বিশেষ সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন না করিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইত না। সেই জন্য অনেকে মনে করিতেন বুঝি তিনি ধ্যানভজন ব্যতীত অন্য ভাবে ঈশ্বর-সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না; ভক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক অনন্যচিত্তে ঈশ্বরারাধনা —ইহাই তাঁহার একমাত্র উপদেশ। কিন্তু প্রকৃতই যে তাহা নহে, ইহা যাঁহারা তাঁহার 'যত্র জীব তত্র শিব,' 'শিবভাবে জীবসেবা', 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি উক্তির সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং তদুপদিষ্ট ত্যাগবৈরাগ্য, সাধনভজন প্রভৃতি ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টার সহিত স্বামীজিপ্রবর্ত্তিত লোকসেবা, মঠ-মিশন-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানসমূহের বিন্দুমাত্র বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে যে শেষোক্ত কার্য্যসমূহ দ্বারা মন বহির্ম্মুখ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং উহা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অন্তরায়, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বুঝা যাইবে উভয় আদর্শের গূঢ় লক্ষ্য এক ব্যতীত দুই নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল শিষ্যের মধ্যে একমাত্র স্বামীজিই গুরূপদিষ্ট মূলতত্ত্বটি সম্যক প্রণিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, তিনি কেবল শুষ্ক ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেষ্টা-মাত্র নহেন, তাঁহার অন্তর মূর্ত্তিমতী করুণার অমল পদ্মাসন। যে হৃদয় তৃণগুচ্ছের বেদনায় পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিত, পশুপক্ষীর দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইত তাহা যে অনাথ আতুর নরনারীর দৈন্য-দুর্দ্দশায় কিরূপ ব্যথিত ও আকুল হইত তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? কে না দেখিয়াছে অত্যাচারক্লিষ্ট, বুভুক্ষা-নিপীড়িত হতভাগ্য

মানবগণের যন্ত্রণা দেখিয়া তিনি কিরূপ অস্থির হইতেন এবং তাহা নিবারণের জন্য কিরূপ সচেষ্ট ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেন? যিনি জীবনের প্রতিমুহূর্তে জীবমাত্রকেই নারায়ণ জ্ঞান করিতেন, তাঁহার বিশ্বপ্লাবী প্রেম কি মানবের কাতর ক্রন্দনশ্রবণে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে—না, প্রেমৈকলক্ষ্য মানব-সেবাব্রত তাঁহার নিকট হেয় বা অনভিপ্রেত হইতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অসামান্য চরিত্রের সকল দিক বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এ তত্ত্বটি বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া যে তিনি নির্ভয়চিত্তে মুক্তকণ্ঠে তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়া সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সফল করিতে পারিয়া-ছিলেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এজন্য তিনি মানবমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

কিন্তু এ কার্য্যটি যত সহজ বোধ হইতেছে প্রকৃতপক্ষে তত সহজে সিদ্ধ হয় নাই। গুরুভ্রাতাগণকে স্বীয় মতে আনয়ন করিতে তাঁহাকে যে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, নিম্নলিখিত ঘটনায় পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

যোগানন্দ স্বামীর সহিত উপর্য্যুক্ত কথাবার্ত্তার পর একদিন সন্ধ্যার সময় বলরামবাবুর বাটীতে বসিয়া স্বামীজি গুরুভ্রাতাগণের সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন, এমন সময় পুনরায় পূর্ব্ববৎ একজন গুরুভ্রাতা সহসা বলিয়া উঠিলেন, তিনি কেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন না, এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রদত্ত শিক্ষা ও উপদেশের সহিত তৎপ্রবর্ত্তিত কার্য্যসমূহের ঐক্য কোন্ খানে? বাহিরের লোকের নিকট তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত আচার্য্যের পদবীতে আরূঢ় হইলেও গুরুভ্রাতা ও অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর নিকট তিনি চিরদিনই সেই কৌতুকপরায়ণ ব্যঙ্গ-রহস্যপ্রিয় নরেন্দ্রনাথই ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপকালে তাঁহার

হৃদয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইত, কোথাও এতটুকু আবরণ থাকিত না। সরল বালকের ন্যায় কত কথা কাটাকাটি করিতেছেন, কত হাসিতামাসা হইতেছে, কত রঙ্গ কত বিদ্রূপ চলিতেছে! কখন তিনি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতেছেন, কখনও বা তাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছেন, এমন কি শ্রীশ্রীগুরুদেব পর্য্যন্ত এ প্রেম-কলহের উচ্ছল স্রোতোবেগের মুখে দুই-একটা আঘাতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। এসকল দৃশ্য প্রেমরহস্যের অন্তর্মর্ম্মানভিজ্ঞ সাধারণের জন্য নহে, কারণ তাঁহারা হয়ত ইহা হইতে কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিকৃতার্থ করিয়া বসিবেন। কিন্তু গুরুভাইরা সব বুঝিতেন, এবং অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ঘাঁটাইয়া মজা দেখিতেন। যত বেশী গালি খাইতেন ও কঠোর কথা শুনিতেন ততই যেন অধিক আনন্দ বোধ করিতেন। এ দিনও তাহাই হইতেছিল। সুতরাং স্বামীজি প্রথমে ব্যঙ্গচ্ছলে উত্তর করিলেন—"তুই কি জানিস? তুই ত ঘোর মূর্খ! যেমন গুরু তাঁর তেমনি চেলা! প্রহ্লাদের মত 'ক' দেখেই কেঁদে সারা। তোরা সব ভক্তের দল, অর্থাৎ কতকগুলো ভাবরোগগ্রস্ত উন্মাদ। তোরা ধর্ম্মের কি জানিস? শুধু কচি খোকার মত নাকে কাঁদতে পারিস, 'ওহে প্রভু, তোমার কি সুন্দর নাক, কিবা চোখ! কি যে সব, আহা মরি!' ইত্যাদি। মনে করেছিস এতেই তোদের মুক্তি হাতের ভেতর, আর শেষ দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে তোদের হাতে ধরে একেবারে গোলোকে টেনে নিয়ে যাবেন! আর জ্ঞানের চর্চ্চা, লোকশিক্ষা, আর্ত্ত-অনাথের সেবা, এ সব মায়া—কেন না পরমহংসদেব ওসব করেন নি। আর কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন, 'আগে ভগবান লাভ কর, তার পর আর সব। পরের উপকার করতে যাওয়া অনধিকারচর্চ্চা'—যেন ভগবান লাভ করা মুখের কথা! ভগবান একটা খেলনা কি না যে খুঁজলেই মুঠোর মধ্যে পড়বে!"

তখন তিনি হঠাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করিতে না পারিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"তোমরা মনে করছো যে, তোমরাই তাঁকে বুঝতে পেরেছ, আর আমি কিছুই পারিনি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা নীরস শুষ্ক জিনিস। তার চর্চ্চা করতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলা টিপে মারতে হয়। তোমরা যাকে ভক্তি বলছো সেটা যে একটা দারুণ আহাম্মকি, কেবল মানুষকে দুর্ব্বল করে মাত্র, তা বুঝছ না। যাও, কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি-মুক্তি চায়? কে দেখতে চায় তোমার শাস্ত্র কি বলছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে তমকূপ থেকে তুলে মানুষ করে গড়তে পারি, যদি তাদের ভেতর কর্ম্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে আমি হাসতে হাসতে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ-টামকৃষ্ণ কারুর কথা শুনতে চাই নি। যে আমার মতলব অনুসারে কাজ করতে চায় তারই কথা শুনবো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুরই দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তি বা মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।"

বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, স্বর বদ্ধ হইবার উপক্রম হইল এবং সমস্ত শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বিদ্যুদ্বেগে ঘরের বাহিরে গিয়া বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতারা ইহা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ত্রস্ত হইলেন এবং তাঁহার নিকট উপর্যুক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুতপ্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন সাহস অবলম্বন করিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, স্বামীজি নিশ্চলভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁহার স্তিমিত চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইতেছে। দেখিয়া বেশ বোধ

হইল তিনি তখন ভাবরাজ্যে। তাঁহারা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার ভাবভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্বামীজি গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং মুখাদি প্রক্ষালিত করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে বন্ধুবর্গের নিকট আসিয়া বসিলেন—মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। সকলেই তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয়তটে একটি বিষম ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ তখনও স্নিগ্ধোজ্জ্বল ললাট ও জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল ভাবাবেগে আরক্তিম রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ কাহারও বাক্য নিঃসরণ হইল না। অবশেষে স্বামীজি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—

"মানুষের প্রাণ যখন ভক্তিতে ভরিয়া উঠে, তখন তার হৃদয় ও স্নায়ু সকল এত নরম হয় যে তাতে ফুলের ঘা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। তোমরা কি জানো যে আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেমকাহিনী পর্য্যন্ত পড়তে পারি না? ঠাকুরের কথা খানিকক্ষণ বলতে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হয়ে থাকতে পারি না? সেই জন্য কেবলই এই ভক্তিস্রোতটা চেপে যাবার চেষ্টা করি, আর জ্ঞানের শিকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই, কারণ এখনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্ত্তব্য শেষ হয় নি। সেই জন্যে যেই দেখি উদ্দাম ভক্তিপ্রবাহে প্রাণটা ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে, অমনি তার মাথায় কঠোর জ্ঞানের অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করতে থাকি। ওঃ, এখনও আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে; আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস, তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যতদিন না সে কাজ শেষ হয় ততদিন আমার বিশ্রাম নেই। বাস্তবিক আমার ওপর তাঁর কি ভালোবাসাই!···" স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি পুনরায় তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া গ্রীষ্মের অছিলায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং তাঁহার মনকে অন্যদিকে ধাবিত করিবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে স্বামীজি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এই ঘটনায় আমরা দেখিতে পাই স্বামীজির মনের স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে। ইহা যে অন্তঃসলিলা ভক্তিপ্রবাহে নিরন্তর সিঞ্চিত ও জ্ঞানকর্ম্মের বাহ্য উপলাবরণে আচ্ছাদিত এবং সেই জ্ঞানকর্ম্মের আবরণ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে যে নিশিদিন প্রবল অন্তর্যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার গুরুভ্রাতাগণও জানিতেন যে, সেই কঠিন শৈলাবরণ ভেদ করিয়া যেদিন তাঁহার হৃদয়নিহিত প্রেম-ভক্তির প্রবল উৎস ছুটিয়া বাহির হইবে সেদিন আর তাঁহার ভঙ্গুর পার্থিব দেহ তাহার বেগধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিমনা দেখিলেই তাঁহার মনের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিতেন।

আরও একটি কারণে উল্লিখিত ঘটনাটি স্মরণ করিবার যোগ্য। উহা যেন স্বামীজির দুর্ব্বোধ্য চরিত্রের একটি সরল টীকাস্বরূপ। যে চরিত্রে আপাতবিরোধী বহুবিধ ভাবসমাবেশ সাধারণের নিকট একটা জটিল প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়, তাহা উক্ত চিত্রে দর্পণের মত স্বচ্ছ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহা হইতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি কেন তিনি সময়ে সময়ে এক একটা ভাবের উপর অতিমাত্রায় জোর দিতেন, কেন কর্ম্মমার্গকে ভক্তিমুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, এদিনকার এই প্রবল ঝটিকা স্বামীজির গুরুভাইদের মন হইতে সন্দেহের মেঘরাশি উড়াইয়া লইয়া গেল। এদিন হইতে আর তাঁহারা কখনও স্বামীজির কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন নাই। তাঁহাদের সকলের দৃঢ় প্রতীতি হইয়া গেল, ঠাকুর সত্যসত্যই তাঁহার মধ্য দিয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন।

ভক্তসঙ্গে

স্বামীজি যে কয় দিবস কলিকাতায় রহিলেন সে কয় দিবস তাঁহার আর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। দিনরাতই লোক যাতায়াত করিতেছে, দিনরাতই কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বলরামবাবুর বাটীতে প্রায় নিত্যই এইরূপ আসর জমিত, তাহা ছাড়া আবার অনেকে পৃথক্‌ভাবে তাঁহাকে স্ব স্ব গৃহে লইয়া গিয়াও সৎসঙ্গ করিতেন। এই উপায়ে ধীরে ধীরে লোকশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল। কত বিষয়ের যে আলোচনা হইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি, বিভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক কাহিনী প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত। বলিতে বলিতে তাঁহার উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নযুগলে অপূর্ব্ব তেজ ফুটিয়া উঠিত, শ্রোতৃবর্গ স্তব্ধ হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার ভিতরে এমন অদ্ভুত উৎসাহ ছিল এবং সেই উৎসাহ তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথায় এমন প্রবল তেজের সহিত প্রকাশ পাইত যে শ্রোতৃবৃন্দ তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেন না। তিনি যখন যে বিষয়ের অবতারণা করিতেন তখন তাহাতেই মাতিয়া উঠিতেন, মনে হইত বুঝি জগতে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ বর্ণনকালে তাঁহার আবেগময়ী ভাষার কুহকে বিষয়টি এরূপ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত যে শ্রোতৃগণ দেশকালপাত্র বিস্মৃত হইয়া মনে করিতেন যেন ঘটনাটি তাঁহাদিগের সম্মুখেই সংঘটিত হইতেছে এবং তাঁহাদের মুগ্ধ মন কল্পনা-ইন্দ্রধনুর বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া এক বিচিত্র মায়ালোকে বিহার করিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশে এখন এমন শিক্ষাপ্রচলনের আবশ্যক হইয়াছে যাহাতে প্রকৃত মনুষ্য গঠিত

হয়, বিচারশক্তির উন্মেষ হয় ও প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয়। সেই জন্য তিনি বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের শিক্ষাদর্শ পুনঃ প্রচারিত করিয়া মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা, লীলাবতীর ন্যায় বিদুষী এবং ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসাদির ন্যায় কবি ও মনস্বী সৃষ্টির সহায়তা করিবার জন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে বলিতেন। বাস্তবিক, পূর্ব্বে এদেশে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু এখন সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে; তাহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রকৃত সৎশিক্ষার অভাব। যে দেশে ভীষ্মদ্রোণাদির ন্যায় রথী, অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্য, ভরত-লক্ষ্মণের ন্যায় অনুজ, যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় ধর্ম্মশীল নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে দেশের লোক এমন কাপুরুষতার কলঙ্কভার মস্তকে বহন করিতেছে এবং গৃহ-বিবাদ ও দ্বেষহিংসায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সে আদর্শ এখন আর নাই, সে শিক্ষা, সাধনা, সংযম ও শিষ্টাচার এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। এমন কি ঐতিহাসিক যুগের প্রতাপসিংহ, পৃথ্বীরাজ, শিবাজী প্রভৃতির ন্যায় রণকুশল যোদ্ধাও এখন বিরল। কথায় কথায় একদিন গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রসঙ্গ উঠিল। গুরু গোবিন্দ সিংহকে তিনি ভারতীয় বীরবৃন্দের তালিকায় অতি উচ্চাসন প্রদান করিতেন। যে মহাপুরুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুগণকে যবনধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাঁহার কঠোর আত্মত্যাগ, তপশ্চর্য্যা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা অত্যাচারমথিত শিখজাতির হৃদয়ে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল এবং যিনি বীরের ন্যায় পূতসলিলা নর্ম্মদাতীরে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বামীজি আবেগে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। বলিতেন—

"সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব্ গুরু গোবিন্দ নাম শুনাউঁ॥"

—গুরুগোবিন্দের নিকট নাম শুনিলে অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ করিলে একজনের বাহুতে সওয়া লক্ষ বলীর বল সঞ্চারিত হইত, অর্থাৎ এক একজন শিষ্য লক্ষাধিক শত্রুনিপাতে সমর্থ হইতেন। বাস্তবিক স্বধর্ম ও স্বজাতির প্রাধান্যস্থাপনকল্পে সেই মহাপুরুষের আজীবন পরিশ্রম কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিল, সমুদ্রতরঙ্গসম মোগলচমূর সম্মুখে মুষ্টিমেয় শিখবীরের নির্ভীক আত্মদানই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বামীজির বাক্যে শ্রোতৃগণের ধমনীতে খরতর শোণিতস্রোত বহিত, তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতেন দেশে এক সময়ে কি দিন ছিল, আর আজি কি দিন আসিয়াছে! কোথায় বা সে কর্ম্মপ্রাণতা, কোথায় বা সে অটল দৃঢ়তা! এইরূপে প্রত্যহ কত যে প্রসঙ্গ আলোচিত হইত, কত যে নব নব ভাব উৎকর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিত তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ কেমন করিয়া দিব! তিনি শয়নে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে, দণ্ডায়মানাবস্থায় সর্ব্বদা লোককে উপদেশ দিতেন, সর্ব্বদা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও বীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মকর্ত্তব্যসাধনের পথে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিতেন।

স্বামিশিষ্য-সংবাদ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে একদিন তিনি স্বামীজির নিকট সায়ণের ভাষ্যসমেত বেদপাঠ করিতেছিলেন। সায়ণাচার্য্য বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণের জন্য যেসকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সেগুলি কিরূপ গভীর চিন্তাসমুদ্ভূত তাহা স্বামীজি বুঝাইতেছিলেন, আর সায়ণের প্রশংসা করিতেছিলেন। স্থানে স্থানে আবার স্বয়ং অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সায়ণকৃত ব্যাখ্যার সমালোচনা করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মোক্ষমূলরের কথা উঠিল। স্বামীজি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, স্বয়ং সায়ণ মোক্ষমূলররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। কি অদ্ভুত অধ্যবসায়, আর বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে কি অসাধারণ পারদর্শিতা! অক্সফোর্ডে বৃদ্ধ

ও তাঁহার পত্নীকে দেখিয়া আমার বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর কথা মনে পড়িয়াছিল। আর বিদায়কালে বৃদ্ধের যে অশ্রুপাত!"

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে সায়ণ এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়া ম্লেচ্ছকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন কেন?" তদুত্তরে স্বামীজি বলিলেন, "অজ্ঞানের নিকটই 'ম্লেচ্ছ' 'আর্য্য' এসকল ভেদ। কিন্তু যিনি বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, তাঁহার নিকট আবার বর্ণাশ্রম-জাতিভেদ কি? মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। আর একটা কথা এই যে, এ দরিদ্র দেশে জন্মিলে তাঁহার পুস্তকপ্রকাশের খরচ জুটিত কোথা হইতে? অনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এজন্য নয় লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাতেও হয় নাই। মাসিক বেতন দিয়াই এ দেশের কত পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। বিদ্যাপ্রচারের জন্য এদেশে এরূপ অর্থব্যয় ও বিপুল পরিশ্রমের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছে কি? ভূমিকায় মোক্ষমূলর স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি শুধু হস্তলিখিত পুঁথির নকল করিয়াছেন, তারপর আরও বিশ বৎসর লাগে ছাপাইতে। একটা গ্রন্থের জন্য জীবনের ৪৫ বৎসর অক্লান্ত ভাবে যাপন করা কি সহজ কথা? আমি কি সাধে বলি তিনি স্বয়ং সায়ণ?"

আবার পাঠ চলিতে লাগিল। স্বামীজি সাধকের নির্ব্বিকল্প অবস্থায় আরোহণ ও তাহা হইতে পুনরায় বাহ্যজগতে প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত জগতের প্রলয় ও সৃষ্টির তুলনা করিতে লাগিলেন। এমনভাবে অবস্থা হইতে অবস্থান্তর-প্রাপ্তি বুঝাইতে লাগিলেন যে, শরৎবাবুর পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজি স্বয়ং ঐ সকল অবস্থার মধ্য দিয়া অনেকবার সমাধিভূমিতে গমন করিয়াছেন, নতুবা ওরূপ বিশদভাবে বুঝান সম্ভবপর হইত না।

এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন। পরস্পর অভিবাদনান্তে স্বামীজি রহস্য করিয়া বলিলেন, "জি সি,[১] তুমি ত এসকল কিছুই পড়লে না, শুধু কেষ্টো বিষ্টু নিয়েই দিনটা কাটালে।" গিরিশবাবু বলিলেন, "ভাই, আমার আর ওসব পড়ে কি হবে? আমার শক্তিও নেই, সময়ও নেই। আমি দূর থেকে বেদবেদান্তকে নমস্কার করে ঠাকুরকে স্মরণ করতে করতে পাড়ি মারব। তোমাকে দিয়ে তাঁর লোকশিক্ষা দিবার দরকার ছিল, তাই তোমাকে ওসব পড়তে হয়েছে।" এই বলিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ সেই বৃহৎ বেদগ্রন্থগুলিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন, ও বলিতে লাগিলেন, "জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়!"

গিরিশবাবু স্বামীজির স্বভাব উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। স্বামীজি যে প্রকৃতই ভক্তিমার্গের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ কথাগুলি বলেন নাই তাহা বুঝিতে পারিলেন, কারণ তাঁহার স্বভাবই ছিল যখন যে বিষয়ে বলিতেন তখন তাহার উপর বিশেষ জোর দিয়া গভীরভাবে তাহা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া দিতেন। সেইজন্য বলিলেন, "আচ্ছা নরেন, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। বেদবেদান্ত ত তুমি ঢের পড়েছ, কিন্তু তাহাতে দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদ, আর ব্যভিচারাদি পাপস্রোত-নিবারণের কোন ব্যবস্থা আছে কি? রোজই শুনি ঐ অমুক বাড়ীর গিন্নি—যার বাড়ীতে এককালে প্রত্যহ ৪০।৫০ খানা পাত পড়তো—আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায় নি; অমুক বাড়ীর এক অনাথা কুলস্ত্রীকে দুষ্টদের অত্যাচারে প্রাণ হারাতে হয়েছে; অমুক পরিবারের একজন যুবতী বিধবা কলঙ্কগোপনের জন্য ভ্রূণহত্যা করেছেন; অমুক জুয়োচুরি করে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে। বলতো এ সব রহিত করার

১ স্বামীজি গিরিশবাবুকে জি সি বলিয়া ডাকিতেন।

কোন উপায় বেদে আছে কিনা।” গিরিশবাবু সমাজের এই সকল গাঢ়কালিমালেপিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজি নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন এবং হৃদয়ের ভাব সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সাশ্রুনয়নে গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিলেন।

গিরিশবাবু তখন শরৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দেখলি রে, তোর গুরুর হৃদয়টা! এই যে পরের দুঃখে অশ্রুমোচন, এই যে মহাপ্রাণতা—এই জন্যই আমি তাকে বড় বলে মানি—বিদ্যেবুদ্ধির জন্য নয়। দুঃখদুর্দ্দশার কথা যেই শোনা, অমনি বেদবেদান্ত ফেলে উঠে যাওয়া। সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি যেন পরপ্রেমে গলে গেল! তোর স্বামীজি যেমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোকসেবক।”

কিঞ্চিৎ পরে স্বামীজি প্রত্যাগমন করিলেন এবং পাত্র-বিশেষে যুক্তিতর্ক ও বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন। এমন সময়ে স্বামী সদানন্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামীজি ব্যাকুল হইয়া অন্ততঃ সামান্য ভাবেও একটা সেবাশ্রম-প্রতিষ্ঠার কথা বলিলেন। সদানন্দ স্বামী ‘যো হুকুম মহারাজ,—বান্দা তৈয়ার হ্যায়’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীজির অভিরুচিমত কার্য্য আরম্ভ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর স্বামীজি গিরিশবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “দেখ জি সি, আমার মনে হয় যদি জগতের দুঃখনিবারণের জন্য—এমন কি একটি জীবের দুঃখও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করিবার জন্য আমায় সহস্র বার জঠরবাসক্লেশ সহ্য করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত। শুধু একলা নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে পারি তবে তো!”

এই সময়ে একদিন তিনি শরৎবাবুকে সঙ্গে লইয়া প্রাতঃস্মরণীয়া মাতাজী তপস্বিনীর প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। মাতাজী স্বয়ং তাঁহাকে কয়েকটি শ্রেণী দেখাইলেন। এক শ্রেণীর ছাত্রীরা

তাঁহার সম্মুখে দেবাদিদেব মহাদেবের একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিল এবং শিবার্চ্চনার সমুদয় বিধি প্রদর্শন করিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা কালিদাসের 'রঘুবংশ' হইতে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সংস্কৃতে উহার ব্যাখ্যা করিল। স্বামীজি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি মাতাজীকে তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায়ের জন্য পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিলেন এবং 'দর্শকবৃন্দের মন্তব্যপুস্তকে' একটি দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া সর্ব্বশেষে লিখিলেন, 'এই বিদ্যালয়ের কার্য্য ঠিক পথে চলিতেছে।'

পথে শরৎবাবুর সহিত স্বামীজির স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। স্বামীজি এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শ স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তাঁহার মতে বালিকাগণকে উত্তমরূপে শিক্ষিতা না করিলে এবং বালিকাবিবাহ নিবারণ না করিলে এদেশের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। এতদর্থে বিদ্যাজ্ঞানসম্পন্না ব্রহ্মচারিণীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। মাতাজী তপস্বিনী স্বয়ং সংসারত্যাগিনী হইয়াও এই সুদূর বঙ্গদেশের বালিকাগণকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য যেভাবে আত্মজীবন নিয়োজিত করিয়াছেন—তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তবে স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহাকালী পাঠশালায় যে পুরুষ শিক্ষকের দ্বারা অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে এটুকু স্বামীজি অনুমোদন করিলেন না।

এইভাবে কিয়দ্দিন গত হইলে ৬ই মে তারিখে চিকিৎসকগণের পরামর্শে স্বামীজিকে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ আলমোড়া যাত্রা করিতে হইল। ইতোমধ্যে মিস্ মূলার বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি ও গুড্উইন সাহেব কয়েক দিবস পূর্ব্বেই সেখানে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বামীজিও আলমোড়াবাসিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন।

আলমোড়ায়

আলমোড়া যাইবার পথে স্বামীজি লক্ষ্ণৌএ এক রাত্রি বাস করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। কাঠগোদাম হইতে মিঃ গুড্উইন ও কয়েকজন ভক্ত তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। তারপর আল-মোড়ার নিকটবর্ত্তী লোদিয়া নামক স্থানে এক বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁহাকে অভ্যার্থনা করিয়া ক্রমাগত জয়ধ্বনি ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা স্বামীজির জন্য একটি সুসজ্জিত অশ্ব আনিয়াছিল। তিনি তাহাতেই আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রতি গৃহদ্বার দীপমালায় উদ্ভাসিত ও রাজপথসমূহ মাল্যপতাকাদিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল এবং বাজারের একাংশে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপবিমণ্ডিত একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পথে গমনকালে শত শত বাতায়নবর্ত্তিনী কুলরমণী স্বামীজির শিরোপরি পুষ্পলাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সভাস্থলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রায় পাঁচ সহস্র ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। প্রথমে অভ্যর্থনাসমিতির পক্ষ হইতে পণ্ডিত জ্বালাদত্ত যোশী হিন্দীতে একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তৎপরে লালা বদরি সা-র হইয়া পণ্ডিত হরিরাম পাঁড়ে আর একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। স্বামীজি যতদিন আলমোড়ায় ছিলেন, ততদিন এই সা-জীর অতিথি হইয়াই বাস করিয়াছিলেন। তারপর আর একজন পণ্ডিত একটি সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

স্বামীজি সংক্ষেপে প্রাণস্পর্শী ভাষায় ভারতীয় চিন্তার উপর সাধুজন-সেবিত গিরিরাজ হিমালয়ের প্রভাব বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "এই হিমালয়ের

সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্ম্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র হওয়া চাই-ই চাই—এই কেন্দ্র কর্ম্মপ্রধান হইবে না, এখানে শান্তি, নিস্তব্ধতা ও ধ্যানশীলতা পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশা করি একদিন না একদিন এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব।”

আলমোড়ায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিল বটে এবং শরীরেও যথেষ্ট বলাধান হইল, কিন্তু তথাপি জনকয়েক ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির অত্যাচারে সময়ে সময়ে তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। ভারতবর্ষে পদার্পণের দিন হইতে তাঁহার দেশব্যাপী উচ্চসম্মান-দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া এ দেশের কোন কোন আমেরিকান পাদরী আমেরিকায় তাঁহার কার্য্যের ক্ষতিসাধন-মানসে এদেশ হইতে নানাবিধ মিথ্যা সংবাদ সে দেশের সংবাদপত্রসমূহে প্রেরণ করিতেছিল এবং যুক্তরাজ্যে ঐ সকল পত্রের বহুল প্রচার দ্বারা স্বামীজি ও তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধে লোকের মনে বিদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছিল। সেখানকার বন্ধুবান্ধবেরা আবার সংবাদপত্রের ঐ সকল অংশ কাটিয়া রাশি রাশি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছিলেন, স্বামীজি কিন্তু উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া নীরব অবজ্ঞার সহিত ঐগুলিকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজের মত একজন বড়দরের সাহেবও এই সকল ক্ষুদ্রলোকের দলে যোগ দিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। এ দেশের লোকে যাহাতে তাঁহার যথোপযুক্ত সমাদর করে তজ্জন্য স্বামীজি ১৮৯৬ সালের শেষভাগে লণ্ডন হইতে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিরর ও অন্যান্য পত্রে একখানি

লিপি প্রেরণ করেন।[১] ফলে ব্যারোজ সাহেব এখানে খুব সম্মান প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত তত উদার না থাকাতে তিনি এদেশীয় জনসমাজের মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বিরক্ত হইয়া তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সেখানে

১ লিপিটি এই :—

"Dr. Barrows was the ablest lieutenant Mr C. Bonney could have selected to carry out successfully his great plan of the Congresses at the World's Fair, and it is now a matter of history how one of those Congresses scored a unique distinction, under the leadership of Dr. Barrows.

It was the great courage, untiring industry, unruffled patience and never-failing courtesy of Dr. Barrows that made the Parliament a grand success.

India, its people and their thoughts have been brought more prominently before the world than ever before, by that wonderful gathering at Chicago, and that national benefit we certainly owe to Dr. Barrows more than to any other man at that meeting.

Moreover, he comes to us in the sacred name of religion, in the name of one of the great teachers of mankind, and I am sure, his exposition of the system of the Prophet of Nazareth would be extremely liberal and elevating. The Christ-power this man intends to bring to India, is not that of the intolerant, dominant superior with heart full of contempt for everything else but its own self, but that of a brother who craves for a brother's place as a co-worker of the various powers, already working in India. Above all, we must remember that gratitude and hospitality are the peculiar characteristics of Indian humanity, and as such, I would beg my countrymen to hehave in such a manner, that this stranger from the other side of the globe may find that in the midst of all our misery, our poverty and degradation, the heart beats as warm as of yore, when the 'wealth of Ind' was the proverb of nations, and India was the land of the 'Aryas'."

স্বামীজির কার্য্যের বিঘ্নোৎপাদন-মানসে তাঁহার নামে কতকগুলি অমূলক কুৎসা রটনা করেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, স্বামীজি মিথ্যাবাদী, তিনি আমেরিকার রমণীদিগের অযথা নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, শূদ্র, অর্থাৎ নীচজাতিদের অন্তর্গত, সুতরাং সমুদ্রযাত্রা করায় তাঁহার জাতি গিয়াছে বলিয়া যে কথাটা রটিয়াছে সেটা ভুল, ভারতবর্ষের লোকে সকলে তাঁহার মতাবলম্বী নহেন, সেখানে তাঁহার প্রভাব অতি সামান্য, বিলাতে ও আমেরিকায় তাঁহার প্রচারকার্য্যে যে ফল হইয়াছে তিনি তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া স্বদেশীয়গণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠক দেখিবেন, এগুলি গাত্রদাহজর্জ্জরিত ব্যক্তির প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক, স্বামীজি এ সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া আন্দোলন করা অশ্লাঘ্য বিবেচনা করিতেন, সুতরাং প্রকাশ্যে ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তবে আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যেরা বিশেষতঃ মিসেস্ সারা বুল তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া পত্রাদি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং ব্যারোজ সাহেবের অকৃত-কার্য্যতার দোষ কাহার তাহার আলোচনা করিয়া নিজ শিষ্যদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে দুই একখানি পত্রে একটু আধটু কিছু লিখিয়াছিলেন। চিকাগোর জনৈক বন্ধুকে ৩০শে জানুয়ারীর একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

"ডাক্তার ব্যারোজকে ভালরূপে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি লণ্ডন হইতে আমার দেশে একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সেখানে তাঁর অভ্যর্থনাও বেশ সমারোহে হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে কলকাতায় কোন প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারেন নি, সেটা কি আমার দোষ? এখন শুনছি ব্যারোজ আমার নামে কত কি বলছেন! জগতের গতিকই এই।"

৯ই জুলাই তারিখে স্বামীজি আমেরিকার আর এক বন্ধুকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন। উক্ত বন্ধুটি সংবাদপত্রসমূহে স্বামীজির বিরুদ্ধে নানাবিধ আক্রমণ পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া উহা দ্বারা তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের সমূহ ক্ষতিসম্ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য স্বামীজি এই পত্রখানি লেখেন। ইহার আরম্ভে দেখিতে পাই বারংবার আত্মসম্মানে আঘাত পাওয়ায় উগ্রতরোষ সন্ন্যাসীর কঠোর ভ্রূভঙ্গি ও অসহিষ্ণুতা, আবার শেষে দেখি আজন্ম সংযমীর অদ্ভুত তিতিক্ষা, ব্রহ্মনিষ্ঠের সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা। বাস্তবিক ইহার প্রতি ছত্রে নির্দ্দোষের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধের ভাব এবং বৈরাগ্যবানের স্বাভাবিক উদাসীনতা ও বিরক্তি অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। লিপিসাহিত্যে এরূপ পত্র অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে উহার ভাবার্থ দিবার চেষ্টা করিলাম—

"বিস্তর আমেরিকান কাগজের টুকরা টুকরা অংশ আমার হস্তগত হয়েছে, তাতে দেখছি আমেরিকান রমণীগণ সম্বন্ধে আমার উক্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আমেরিকান পত্রে কি ভয়ঙ্কর সমালোচনা ও আমি জাতিচ্যুত হয়েছি বলে কি আশ্চর্য্য সংবাদই প্রকাশিত হয়েছে! যেন সন্ন্যাসীরও আবার জাতি বলে একটা যাবার কিছু আছে!

"আমার পাশ্চাত্ত্যদেশগমনে জাতিনাশ ত হয়ই নি, বরং উহা দ্বারা সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে যে একটা প্রবল আপত্তি ছিল তা প্রভূতপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হত, তা হলে অর্দ্ধেক দেশীয় রাজা ও প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীকেও যে সেই সঙ্গে জাতিচ্যুত হতে হত। কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে কি?—না, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে আমি যে জাতিভুক্ত ছিলাম, সেই জাতির একজন প্রধান রাজা আমার সম্মানের জন্য এক ভোজ দিয়ে তাতে ঐ জাতীয় সমস্ত প্রধান প্রধান

ব্যক্তিকে নিমন্ত্রিত করেছিলেন !···আর প্রিয় ম—, এই পা দু'খানা বোধ হয় শ'খানেক রাজবংশীয় ব্যক্তি কর্তৃক ধোয়ান, মোছান হয়েছে ও পূজা পেয়েছে, আর দেশের উন্নতি এখন যেমন হু হু করে এগিয়ে চলেছে, এরূপ আগে আর কখনও হয় নি। এইটি বল্লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে আমি রাস্তায় বেরুলেই লোকের ভিড় ঠিক রাখবার জন্য পুলিস পাহারা মোতায়েন রাখতে হয়েছে। একেই কি বলে জাতিচ্যুতি, সমাজচ্যুতি? অবশ্যি ওতে 'মিসু' (মিশনরী) বেচারাদের মুখটি চুপসে গেছে। কিন্তু তাঁরা এখানকার কে? কেউই নয়। আমরা তাঁদের অস্তিত্ব টেরও পাই নে—দিব্যি আছি। একটা বক্তৃতায় আমি এই 'মিসু'দের সম্বন্ধে ও তাঁদের উৎপত্তি নিয়ে দু'একটা কথা বলেছিলাম—অবশ্য ইংরেজ ধর্মযাজকদের বাদ দিয়ে—আর সেই সঙ্গে আমেরিকার চার্চ্চওয়ালী স্ত্রীলোকদের ও তাদের কুৎসা উদ্ভাবনের শক্তি সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করেছিলাম। এইটাকে নিয়ে 'মিসুরা' খুব লাফালাফি করে বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি সমস্ত আমেরিকান নারীজাতির নিন্দা করেছি—মতলব আর কিছুই নয়, ওদেশে আমি যে কাজটা করে এসেছি সেটা পণ্ড করা, কারণ ওরা খুব জানে ঐ কথা বল্লেই ওদেশের লোকের কাছে ওদের একটু সুবিধা হবে। প্রিয় ম—, ধর যেন আমি ইয়াঙ্কিদের (আমেরিকানদের) বিরুদ্ধে ঐ সব অযথা কথা বলেছি,—কিন্তু তা হলেও তারা আমাদের মাতা বা ভগ্নীর সম্বন্ধে যেসব কথা বলে, ওটা কি তার লক্ষাংশের একাংশও হবে? এই 'ভারতের বিধর্ম্মীদের' বিরুদ্ধে খৃশ্চান ইয়াঙ্কি নরনারী যে বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করে, সপ্তসমুদ্রের জলেও তা ধোওয়া যায় না! অথচ আমরা ওঁদের কি করেছি! আগে ওঁরা অপরের মুখে নিজেদের সমালোচনা শুনে ধৈর্য্য ধরতে শিখুন। তারপর যেন পরের সমালোচনা করেন! মনস্তত্ত্ববিদরা জানেন, এটা মানবমনের একটা আশ্চর্য্য ·· যে যারা

৪৩

দিনরাত পরকে খোঁচা দেয় তারা নিজেদের সম্বন্ধে পরের সামান্ত একটা কথার ভরও সইতে পারে না। আর তা ছাড়া ওঁরা আমার করেছেন কি? তোমার পরিবারবর্গ, মিসেস্ বি—, মিঃ ও মিসেস্ স—আর জনকতক সহৃদয় ব্যক্তি—এঁরা ছাড়া আর কে আমার কাজে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেছেন? আমি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে খেটে এখন ত মরবার দাখিল হয়েছি—জীবনের সারাংশটা আমেরিকায় কাটিয়ে এলুম, নিজের যতটা শক্তি ছিল সব খোয়ালুম—কেন? না, ওদেশের লোককে উদার উন্নত করবার জন্য ও ওদের আধ্যাত্মিক মার্গে নিয়ে যাবার জন্য! ইংলণ্ডে আমি মাত্র ছ'মাস খেটেছিলুম। সেখানে আমার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলে নি—শুধু একবার ছাড়া—তাও একটা আমেরিকান স্ত্রীলোকের কার্য্য। শুনে আমার ইংরেজ বন্ধুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন! শুধু যে কেউ আমায় কোন আক্রমণ করে নি তা নয়, বরং ইংরেজ ধর্ম্মনায়কদের মধ্যে অনেক ভাল ভাল লোক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। সেখানে আমি না চেয়েও অনেক সাহায্য পেয়েছি, এবং জানি পরে আরও পাবো। একটা সমিতিই হয়েছে আমার কাজ দেখবার ও তার জন্য সাহায্য সংগ্রহ করবার জন্য এবং সে দেশের চার জন অতি ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি আমার কাজের সহায়তা করবার জন্য সব বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে আমার সঙ্গে ভারতে এসেছেন। আরও অনেকে আসতে প্রস্তুত ছিলেন, আর এবার যদি যাই, বোধ হয় আরও শত শত ব্যক্তি আসতে চাইবেন। প্রিয় ম—, তুমি আমার জন্য একটুও ভয় করো না। এ পৃথিবীটা প্রকাণ্ড—খুবই প্রকাণ্ড—সুতরাং 'ইয়াঙ্কীদের ফোঁস্ ফোঁসানি গর্জ্জানি' সত্ত্বেও এখানে আমার জন্য একটুখানি জায়গা মিলবেই। যাই হোক, আমি আমার কাজে খুসী আছি। আমি কখনও মতলব এঁটে কোন কাজ করি নি। যেমন কাজ এসে জুটেছে, তেমনি করে গেছি। আমার মাথায়

শুধু একটা চিন্তা বরাবর স্থিরভাবে জ্বলেছে—ভারতের সাধারণ নর-নারীকে উন্নত করার উপায় বিধান করা, এবং কতক পরিমাণে তা আমি করতেও পেরেছি। আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, রোগ, দারিদ্র্যের মাঝখানে কেমনকরে কাজ কচ্ছে, কেমন করে কলেরারোগগ্রস্ত হাড়ী ডোমের পর্য্যন্ত সেবা কচ্ছে, চণ্ডালের ক্ষুধাতুর মুখে আহার যোগাচ্ছে, আর ভগবান কেমন করে আমার ও তাদের সকলকেই সাহায্য পাঠাচ্ছেন, তা দেখলে তোমার বড় আনন্দ হতো। মানুষ কে?—তিনি আমার সঙ্গে ফিরছেন—সেই প্রাণবল্লভ—যিনি আমেরিকায়, ইংলণ্ডে এবং ভারতের চতুর্দ্দিকে যখন আমি অপরিচিত ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়িয়েছি তখনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। লোকে কি বলে না বলে, তাতে আমার কি আসে যায়? ওরা ওসব দুগ্ধপোষ্য শিশুর দল—আর ওর চেয়ে বেশীই বা কি জানে? কি! আমি ঐ সব অপোগণ্ডের কিচকিচিতে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হব—যে আমি প্রত্যগাত্মার সন্ধান পেয়েছি, সমস্ত দুনিয়াটাকে অসার মায়াজাল বলে বুঝেছি? আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়?

"নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হচ্ছে, তার মানে তোমায় এগুলো বলা উচিত মনে করি। দেখ, আমি বেশ টের পাচ্ছি আমার কাজ ফুরিয়ে এসেছে—আর বড় জোর তিন বছর কি চার বছর বাঁচবো। নিজের মুক্তির জন্য আমার একতিল আকাঙ্ক্ষা নেই। পৃথিবীর ভোগসুখ আমি কখনও চাই নি। আমি শুধু দেখবো আমার কলটা (সেবকসম্প্রদায়) কাজ করবার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারপর যখন নিশ্চিত বুঝবো জগতের ভালোর জন্য (আর কোথাও না হ'ক অন্ততঃ ভারতবর্ষেও) চাড়া দেবার মত এমন একটা কিছু খাড়া করতে পেরেছি, যা কোন শক্তিতেই টলাতে পারবে না, তখন চিরনিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করব—

তারপর যা হোকগে। আর এই আমার কামনা যে, আমি যেন সহস্র দুঃখভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মাই, যেন তাতে করে সেই একমাত্র ভগবানের সেবা করতে পারি—যে ভগবান ছাড়া অন্য ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না—অর্থাৎ যিনি সকল জীবের সমষ্টিভূত নারায়ণ বা বিশ্বদেব, সকল জাতির পাপী তাপী, সকল জাতির দীনদুঃখী—তারাই আমার দেবতা, তারাই আমার ভগবান—আমি শুধু যেন তাদেরই সেবা করতে পারি।

"যিনি তোমার অন্তরে বাহিরে, তুমি যাঁহার স্থূলদেহ ও যিনি 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদৌ'—শুধু সে বিরাট আত্মার পূজা কর, আর সব ঠাকুর ভেঙ্গে ফেল।

"যিনি ঊর্দ্ধ, অধঃ, সাধু, পাপী ও ব্রহ্ম হতে কৃমিকীট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান ; যিনি দৃশ্য, জ্ঞেয়, সত্য ও সর্ব্বত্যাগী— শুধু তাঁকেই পূজা কর, আর সব দেবতা চূর্ণ করে ফেল।

"যাঁর ভূত ভবিষ্যৎ নাই, মৃত্যু নাই, গমনাগমন নাই, যাঁতে আমরা বিদ্যমান আছি ও চিরদিন থাকব, তাঁরই উপাসনা কর, আর সব দেবতা ভেঙ্গে ফেল।

"আমার সময় সংক্ষিপ্ত। তবে যা বলবার আছে তা বলতেই হবে —তাতে যার যেখানে যা লাগে লাগুক। সুতরাং প্রিয় ম—, আমার মুখ থেকে যা শুনছ তাতে করে ভয় পেয়ো না ; কারণ, আমার পশ্চাতে যে শক্তি রয়েছে—সে বিবেকানন্দের শক্তি নয়, তাঁরই শক্তি—সেই প্রভু, যিনি জানেন কিসে ইষ্টানিষ্ট, শুভাশুভ। যদি আমায় জগৎকে খুসী করতে হয় তাতে জগতের অনিষ্ট হবে ; অধিকাংশ লোকের কথাটাই ঠিক নয়, কারণ দেখ তারাই ত জগতের এই দুঃখকষ্ট সৃষ্টি করেছে। নূতন চিন্তা বা ভাব দেখলেই লোকে তার পিছনে লাগবে—সভ্যসমাজে হয়ত একটু বাহ্য ভদ্রতার খাতিরে নাসিকা কুঞ্চিত করে, আর অসভ্য

চাষার দলে ভীষণ চীৎকার গলাবাজি ইতর গালিগালাজ ও অভদ্র অপবাদ রটনা করে। কিন্তু এই সব মৃত্তিকাভোজী কেঁচোর দলকেও তুলতে হবে। বালকের দলকেও আলো দেখাতে হবে। আমাদের দেশে কত শত উন্নতির স্রোত এল, গেল। আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা কালকের ছেলেরা কেমন করে বুঝবে বল? এ সব 'কুছ্ নেহি হ্যায়'— সব ভোজবাজি—মায়া! সব ছেড়ে ছুড়ে দাও—মজা পাবে। কামকাঞ্চন ছাড়—আনন্দ মিলবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। রমণসুখ আর টাকা-কড়ি এরাই ত যত আপদের মূল। এগুলো গেলেই দিব্য চক্ষু খুলবে— আত্মা আপনার অনন্ত শক্তি ফিরে পাবেন।"

বাস্তবিক মানুষের অকৃতজ্ঞতাদর্শনে মনে যে কষ্ট হয় তাহার তুলনা নাই। যাহাদের জন্য অকাতরে হৃদয়শোণিত পাত করা যায় তাহারা যখন বিষধর সর্পের ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে থাকে তখন মনে যে কি দুঃসহ ক্লেশের সঞ্চার হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কে অনুভব করিতে পারে?—বিশেষতঃ যখন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সত্যকে আবৃত করিয়া বিদ্বেষের হলাহল বর্ষণ করিতে থাকেন। ডাক্তার ব্যারোজ জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ। কিন্তু তিনি ১০ই মে তারিখে এদেশ হইতে ক্যালিফর্ণিয়ায় পদার্পণ করিয়াই 'ক্রনিকল্' পত্রে স্বামীজি সম্বন্ধে যেসকল তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন উহার সকলগুলিই অযথা ও মিথ্যা।[১] স্বামীজি তাঁহার কোন প্রকাশ্য বক্তৃতায়

১ এ সম্বন্ধে মিসেস্ সারা বুল ৭ই জুন তারিখে ডাক্তার লুইস জেন্‌সকে যে পত্র লেখেন তাহাতে একটি সুন্দর কথা লিখিয়াছেন—

" Thank you for the California clipping. Since Dr. Barrows so unqualifiedly denounces Vivekananda as a liar and for that reason charges him with intent to avoid him at Madras, I regret, for his own good, that Dr. Barrows should have committed all mention of

বা সামাজিক আলাপে ঘুণাক্ষরেও আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে তিনি যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার জন্য বাহাদুরি প্রকাশ করেন নাই। বরং ঐ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেই চাহিতেন না, চুপচাপ থাকিতেন। তবে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে অতি বিনীতভাবে ও সাবধানে দুই-এক কথা বলিতেন। ভারতের কত স্থানে কত অভিনন্দনে তাঁহার সফলতার জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহার একই উত্তর দিয়াছেন, "আমি আর এমন কি করিয়াছি? আপনারা যে-কেহ উহা আমার চেয়ে ভাল করিয়া করিতে পারিতেন।" আর তিনি কখনও বলেন নাই তাঁহার কৃতকার্য্যতা অত্যন্ত অধিক আশানুরূপ হইয়াছে। কুম্ভকোনম্, মান্দ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের প্রত্যেক বড় বড় বক্তৃতাতেই বলিয়াছেন, "কতকটা পথ পরিষ্কার ও কার্য্যের সুবিধা হইয়াছে বটে"; আর মার্কিনজাতির সহৃদয়তার জন্য পুনঃ পুনঃ মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও যে ব্যারোজ সাহেব কি করিয়া লিখিয়াছিলেন, "বিবেকানন্দের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে"—এ কথাটা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু স্বামীজি কিছু বলুন বা না বলুন, বেদান্তের প্রভাব যে পাশ্চাত্ত্যদেশের শিক্ষিত সমাজে ক্রমশঃ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল তাহা সারা বুলের চিঠিতেই বুঝিতে

the Swami Vivekananda's widely circulated letter of welcome urging upon the Hindus, whatever their views of Dr. Barrows' message concerning their and his own religion might be, to offer a hospitality of thought and greeting worthy of the kindness extended to the Eastern delegates at Chicago by Dr. Barrows and Mr. Bonney. Those letters circulated at the time when the Indian nation was preparing a welcome unprecedented for warmth and enthusiasm to the monk, contrast markedly with Dr. Barrows' recent utterances in California, on his own homecoming, concerning Vivekananda, and bring the two men before the Indian public for their judgment."

পারা যায়। তিনি লিখিতেছেন, "জার্ম্মান ও ইংরেজ পণ্ডিতগণ ও আমাদের এমার্সনের লেখাই সাক্ষ্য—বেদান্তের ভাব আজকাল পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে কতটা পরিমাণে মিশিয়াছে।" বাস্তবিক বেদান্তের এই সার্ব্বভৌমত্বের উল্লেখ করিয়াই স্বামীজি সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্ত্যের শত শত লোক আজ বেদান্তের ভক্ত।" কথাটা কি মিথ্যা, না অতিরঞ্জিত?

তাহার পর তৎকর্ত্তৃক আমেরিকান রমণীগণের নিন্দা! কথাটা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও বিকৃত তাহা তাঁহার যেকোন ভারতীয় বক্তৃতা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কোথাও আমেরিকান রমণীগণের বিরুদ্ধে একটি কথাও নাই। বরং তিনি যে তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং অতিশয় প্রশংসাই করিতেন, তাহা ঐ সময়ের তিন বৎসর পূর্ব্বে খেতড়ির রাজাকে লিখিত একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়। ঐ পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

আমেরিকা, ১৮৯৪

"আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের নারীর মত চালচলন নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে এক বৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি, ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাবাসিনী রমণীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শতজন্মেও শোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায়

প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই প্রাচ্যমানবের সুগভীর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে।
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং—"

—'যদি সাগর মস্যাধার, হিমালয় পর্ব্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী, পৃথিবী পত্র হয়, এবং স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন', তথাপি এসকল তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে অসমর্থ হইবে।

"গতবৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহুদূর দেশ হইতে আগত, নাম-যশ-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দ্দকশূন্য, পরিব্রাজক প্রচারকরূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান এবং আমাকে তাঁহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁহাদের নিজেদের যাজককুল এই 'বিপজ্জনক বিধর্ম্মী'কে ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই 'অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী'র হয়ত বা সাংঘাতিক চরিত্রের লোকটির সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা আমার বন্ধুরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিঃস্বার্থ, পবিত্রা রমণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে অধিকতর নিপুণা—কারণ, নির্ম্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

"কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—কত শত জননী দেখিয়াছি যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—কত শত কন্যা ও কুমারী

দেখিয়াছি যাহারা 'ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্ম্মল,' আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে; ভালমন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপদার্থ অসার অংশ-দর্শনে সমগ্র জাতির ধারণা করিলে চলিবে না। কারণ উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র তাহা দ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে।"

এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণপ্রয়োগ অনাবশ্যক। যাঁহারা স্বামিজীর চরিত্র পূর্ব্বাপর অবগত আছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন সে চরিত্রে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্কস্পর্শ কোনমতেই সম্ভব নহে।

এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা পরিত্যাগ করিয়া যখন আমরা এই সময়কার অন্যান্য ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। কারণ, এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ দুর্ভিক্ষপীড়িত মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া নিজে কপর্দ্দকশূন্য হইয়াও প্রত্যহ চারি-পাঁচ শত ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতেছিলেন এবং স্বীয় মৃত্যুভয় বা স্বাস্থ্যভঙ্গ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে শত শত ম্যালেরিয়া ও কলেরাগ্রস্ত নরনারী ও বালকবালিকার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলেন। স্বামীজি তাঁহার সাহায্যার্থ স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অর্থসংগ্রহের জন্য একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাতে কলিকাতা, কাশী, মান্দ্রাজ এবং মহাবোধি সোসাইটি হইতে চাঁদা উঠিতেছিল। অখণ্ডানন্দ স্বামীর নিঃস্বার্থ মানবসেবা-দর্শনে মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ ই ভি লেভিঞ্জ মহোদয় অতীব প্রীত হইয়া গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে

অর্থ ও লোকবল প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং যাহাতে চাউল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা অল্পমূল্যে তাঁহার নিকট পঁহুছিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত ও অন্যান্য নানাবিধ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমন কি যেদিন অখণ্ডানন্দ স্বামী পাঁচশত ব্যক্তিকে বস্ত্র বিতরণ করেন, সেদিন লেভিঞ্জ সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া বলিয়াছিলেন, "মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষদমনের জন্য আমি স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট ঋণী। তিনি আমায় সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং যেভাবে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে গবর্নমেণ্টের সাহায্যভাণ্ডার উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করিবার জন্য আমায় একবিন্দু ভাবিতে হয় নাই।"

পাঠকগণের বোধ হয় মনে আছে যে এই অখণ্ডানন্দ স্বামী একসময়ে হিমালয়ভ্রমণে স্বামীজির সাথী ছিলেন। ইনি বিংশতিবর্ষ-বয়ঃক্রমলাভের পূর্ব্বেই নিঃসম্বলে চারি বার হিমালয় অতিক্রমপূর্ব্বক তিব্বত দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল ভ্রমণের রমণীয় বৃত্তান্ত অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বামীজি যখন আমেরিকায় ছিলেন সেই সময়ে কয়েক বর্ষ তিনি রাজপুতানায় অবস্থান করিয়া খেতড়ির রাজার সাহায্যে দরিদ্রদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আরও একজন গুরুভ্রাতার কার্য্যদর্শনে স্বামীজি এই সময়ে আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইনি পুণ্যস্মৃতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। মার্চ্চ মাসের শেষভাগে এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী মান্দ্রাজ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে গমন করিয়া আপনার দেবোপম চরিত্র ও মধুময় উপদেশে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং প্রবল উদ্যমে শ্রীচৈতন্য, রামানুজ, শঙ্কর, মধ্ব, বুদ্ধ, জরতুষ্ট্র, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের পূত চরিত্রের আলোচনা এবং বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা,

গীতা ও উপনিষদের পঠনপাঠন দ্বারা শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্ম-পিপাসা চরিতার্থ করিতেছিলেন।

ক্রমশঃ স্বামীজির স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে লাগিল এবং রোগের উপসর্গাদি কমিয়া আসিল। তিনি পুনরায় শৈলাবাস ত্যাগ করিয়া শিক্ষা ও প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

স্বামীজির চলিয়া যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে আলমোড়ার ভক্তগণ তাঁহাকে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্থানীয় ইংরেজ অধিবাসিগণও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ইংলিশ ক্লাবে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাবে একশতের অধিক লোকের স্থান না থাকায় স্থির হইল একটি বক্তৃতা হিন্দীতে স্থানীয় জেলা স্কুলে দেওয়া হইবে, আর একটি ক্লাবে ইংরেজীতে হইবে। স্বামীজি কথনও হিন্দী বক্তৃতা করেন নাই, আর হিন্দীভাষাও সুললিত বক্তৃতাপ্রদানোপযোগী বলিয়া পূর্ব্বে তাঁহার ধারণা ছিল না। কিন্তু স্বামীজী প্রথমে ধীরভাবে আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই বিষয়ের গুরুত্ব-প্রভাবে ভাষার দৈন্য অতিক্রম করিলেন এবং সুস্পষ্ট অথচ ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার বক্তব্যসমূহ বিবৃত করিতে লাগিলেন। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল ভাষা যেন তাঁহার হস্তে যন্ত্রবিশেষ হইয়া যথেচ্ছ পরিচালিত হইতেছে— এমন কি তিনি নূতন নূতন শব্দপ্রণয়ন দ্বারা তাহাকে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া অনর্গলভাবে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। যাঁহাদের ধারণা ছিল হিন্দীভাষা অসম্পূর্ণ, তাহাদের ভ্রম দূর হইল এবং হিন্দীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন উক্ত ভাষায় এরূপ বিজয়লাভ এই প্রথম, অর্থাৎ স্বামীজি ঐ ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যেরূপ কৃতকার্য্য হইলেন, এরূপ আর কেহ কথনও হন নাই—"শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে,

হিন্দীভাষার মধ্যে এমন যথেষ্ট উপাদান আছে, যদবলম্বনে ঐ ভাষার অচিন্তিতপূর্ব্ব উন্নতিসাধন করিয়া উহাকে ওজস্বিনী বক্তৃতার উপযোগিনী করা যাইতে পারে।" এই বক্তৃতায় প্রায় চারিশত বাছা বাছা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

ইংলিশ ক্লাবে যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে স্থানীয় সমুদয় ইংরেজ অধিবাসীই উপস্থিত ছিলেন। গুর্খা রেজিমেণ্টের কর্ণেল পুলি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ডাঃ হ্যামিল্টন, ডেপুটি কমিশনার মিঃ গ্রেসী ও তাঁহার পত্নী, কর্ণেল হ্যারিসনের পত্নী, মিঃ ও মিসেস্ হুইশ লার্কিন ও ম্যাকফার্লন, মিঃ স্প্রাই, লালা বদ্রিশা, লালা চিরঞ্জীলাল শা, জ্বালাদত্ত যোশী ও স্বামীজির অনেকগুলি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রধান প্রধান স্থানীয় ভদ্রলোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"বেদের উপদেশ— তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক"। স্বামীজি প্রথমে জাতীয় দেব-উপাসনার উৎপত্তি ও দেশবিজয় দ্বারা উহার বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বেদের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। বেদে কি আছে, বেদের উপদেশ কি, সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিয়া আত্মতত্ত্ব-বিচারে নিযুক্ত হইলেন। তারপর পাশ্চাত্ত্যপ্রণালীর (যাহা বাহ্যজগৎ হইতে জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সমাধান চেষ্টা করে) সহিত প্রাচ্যপ্রণালীর (যাহা বহির্জগতে উহার উত্তর না পাইয়া অন্তর্জগতে উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়) তুলনা করিলেন; বলিলেন, হিন্দুজাতিই এই অন্তর্জগৎ-অনুসন্ধান-প্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা—ইহা এই জাতির বিশেষ সম্পত্তি, আর একমাত্র ঐ প্রণালীর সহায়তাতেই তাহারা ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতারূপ মহারত্ন আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগৎকে উহা প্রদান করিয়াছেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামীজি আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। মিস্ হেনরিয়েটা মূলার বলেন, "তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য

বোধ হইল বক্তা, বক্তৃতা ও শ্রোতৃবৃন্দ সব এক হইয়া গিয়াছে; যেন 'আমি' 'তুমি', 'উহা' 'ইহা' এই ভেদবোধ আর নাই। যেসকল বিভিন্ন ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন সেই কয়েক মুহূর্ত্ত আচার্য্যবরের দেহনিঃসৃত আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃপ্রবাহে আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"যাঁহারা স্বামীজির বক্তৃতা অনেকবার শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ অনুভূতি তাঁহাদের নিকট নূতন নহে। তাঁহারা জানেন, মধ্যে মধ্যে এমন দুই-একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন আর বোধ হয় না তিনি অবহিতচিত্ত দোষগুণ-সমালোচক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতাকারী স্বামী বিবেকানন্দ—সে সময়ে সব ভেদবুদ্ধি ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ক্ষণকালের জন্য অন্তর্হিত হয়, নামরূপ উড়িয়া যায়, কেবল থাকে একমাত্র চৈতন্য সত্তা, যাহাতে বক্তা বাক্য ও শ্রোতা এক হইয়া মিলিয়া যায়।"

দার্জ্জিলিং ও আলমোড়ায় স্বামীজি কর্ম্মের আহ্বান হইতে অনেকটা দূরে ছিলেন। এ সময়কার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ভগ্নস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন। পূর্ব্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিল না বটে, কিন্তু যেভাবে শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই বায়ুপরিবর্ত্তন ও বিশ্রামে তাহার বেগ কিঞ্চিৎ কমিল। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ আর তাঁহার অদৃষ্টে নাই, পরলোকের ঘনীভূত ছায়া ধীরমন্দ পদক্ষেপে ক্রমশঃ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেইজন্য তিনি ভারতবাসীর নিকট তাঁহার যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা শুনাইবার অভিলাষে তৎপর হইয়া পুনরায় অমিত উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

উত্তর ভারতে প্রচার

সার্দ্ধ দুই মাসকাল আলমোড়ায় অবস্থানের পর স্বামীজি পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের অধিবাসিগণের অনুরোধে পার্ব্বত্য ভূমি ত্যাগ করিয়া নিম্নে আগমন করিলেন এবং নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজীতে অধিক বক্তৃতা দেন নাই, অধিকাংশ বক্তৃতাই হিন্দীতে দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকলের রিপোর্ট সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত যথেষ্ট চর্চ্চা হইত এবং যেখানে যাইতেন সেইখানেই ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষভাবে কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেন। ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি বেরিলিতে উপনীত হইলেন। এস্থানে চারি দিবস থাকিয়া আর্য্যসমাজ-প্রতিষ্ঠিত অনাথালয় পরিদর্শন ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ দিয়া তিনি ১২ই আগষ্ট রাত্রি ১১টার গাড়ীতে আম্বালায় গমন করিলেন। বেরিলিতে স্বামী অচ্যুতানন্দ নামক আর্য্যসমাজের জনৈক প্রচারককে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর পাঁচ-ছয় বৎসর মাত্র জীবিত থাকিবেন। উপর্য্যুপরি এই বিষয়ের উল্লেখ দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন এই সময় হইতে কতকটা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার লীলা-সংবরণের আর অধিক বিলম্ব নাই। আর বাস্তবিক এ অনুমান মিথ্যাও হয় নাই, কারাণ ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজির দেহত্যাগ হয়।

আম্বালাতে তিনি এক সপ্তাহ রহিলেন। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার সিমলা হইতে এখানে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল বোধ হওয়াতে সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

তাঁহাদিগের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী প্রভৃতি বিভিন্ন-মতাবলম্বী লোক ছিলেন। স্বামীজি তাঁহাদের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা করিলেন। বিশেষতঃ আর্য্যসমাজীদের সহিত বিশেষভাবে শাস্ত্রালোচনা হইল। তাঁহারা তাঁহাকে নানাবিধ কূট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি যথাযথ উত্তরদানে সকলকেই নিরস্ত করিলেন। এমন কি, একদিন উদরের যন্ত্রণার জন্য রাত্রে অনাহারে থাকিয়াও দেড় ঘণ্টা যাবৎ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৬ই তারিখে লাহোর কলেজের জনৈক অধ্যাপক একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র লইয়া আসিয়া তাঁহাকে উহার মধ্যে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন। মোটের উপর এখানে তিনি যে কয়দিন ছিলেন দেশভক্তি, সমাজনীতি এবং তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা, ইউরোপ আমেরিকা ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা এবং স্বদেশোন্নতির প্রকৃত উপায় প্রদর্শন করিয়া সকলকেই প্রীত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

২০শে আগষ্ট তিনি ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে অমৃতসরে গমন করিলেন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চারি-পাঁচ ঘণ্টা মাত্র তোড়রমল নামক একজন ব্যারিষ্টারের বাটীতে থাকিয়া বিশ্রামলাভার্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে গমন করিলেন ও তথায় কয়েক দিবস যাপন করিয়া পুনরায় অমৃতসরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং দুই দিবস এখানে থাকিয়া রায় মূলরাজ প্রভৃতি আর্য্যসমাজীদের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত রহিলেন। ৩১শে আগষ্ট তিনি অমৃতসর হইতে মেলে রাওলপিণ্ডি গমন করিলেন। ষ্টেশনে ডাক্তার ভক্তরামের ভ্রাতা তাঁহার জন্য বগি গাড়ী প্রভৃতির আয়োজন করিয়া অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শরীরের অসুস্থতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি রাওলপিণ্ডিতে অবস্থান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেভিয়ার-দম্পতির সহিত

টঙ্গায় মরি পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য সঙ্গিগণ পশ্চাৎ একার করিয়া তথায় গমন করিলেন এবং সকলে উকিল হংসরাজের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ স্থানে বাঙ্গালী অধিবাসিগণ একদিন স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজি তাঁহাদের গৃহে যাইয়া অনেক ধর্ম্ম-বিষয়ক গান গাহিলেন এবং উপদেশ দিলেন। তারপর ৬ই সেপ্টেম্বর সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেভিয়ার-দম্পতিরও এই সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু মিসেস্ সেভিয়ার সহসা অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহাদের যাওয়া স্থগিত হইল। যাত্রার পূর্ব্বদিবস মিঃ সেভিয়ার একখানি পত্র-মধ্যে স্বামীজিকে ৮০০৲ পাঠাইয়া দেন। স্বামীজি উদ্বিগ্নভাবে একজন বন্ধুকে বলিলেন, "আমরা ফকির, এত টাকা লইয়া কি করিব, যোগেশ? থাকিলেই খরচ হইয়া যাইবে। তার চেয়ে অর্দ্ধেক লওয়া যাউক আর বাকী ফেরত দিই। ইহাতেই আমার ও সঙ্গীদের ভ্রমণব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।" এই বলিয়া তিনি সেভিয়ার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া অর্দ্ধেক টাকা ফিরাইয়া দিলেন।

মরি ত্যাগ করিয়া ৮ই তারিখে তাঁহারা টঙ্গাযোগে বারামুল্লায় উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে নৌকায় আরোহণ করিয়া শ্রীনগরে যাওয়া হইল, পথে নানা বিষয়ের আলোচনা হওয়ায় বড়ই আনন্দে কাটিল।

শ্রীনগরে পৌঁছিয়া তিনি কাশ্মীরপ্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ চিফজষ্টিস ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নিজগৃহে রাখিয়া বিশেষ যত্নের সহিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বহু কাশ্মীরী পণ্ডিত স্বামীজির নিকট আসিয়া নানাবিধ সৎচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে তিনি রাজপ্রাসাদ-দর্শনে গমন করিলেন। পরদিবস রাজভ্রাতা রাজা রামসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহারাজ তখন জম্মুতে ছিলেন। রাজা রামসিংহ স্বামীজির প্রতি সাতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়া একখানি

চেয়ারে বসাইলেন এবং স্বয়ং পাত্রমিত্র ও সভাসদ্‌গণ সহ নিম্নে উপবেশন করিলেন। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম ও সাধারণের উন্নতিবিধান সম্বন্ধে আলোচনা হইল। রাজা স্বামীজির সহিত আলাপে নিরতিশয় মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শ্রীনগরে স্বামীজি সাধু, পণ্ডিত, বিদ্যার্থী, উচ্চরাজকর্ম্মচারী ও নাগরিকগণ কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এবং প্রায় সর্ব্বক্ষণই ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত হইত, পশ্চাৎ সঙ্গীতাদি হইত। এইভাবে বিস্তর পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী লোকের সহিত তাঁহাকে ইংরেজীতে ও হিন্দীতে আলাপ করিয়া তাঁহাদের সংশয়সমাধান করিতে হইত। সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিলেন। তিনিও কাশ্মীরের অতুলনীয় নিসর্গশোভা ও নানা দর্শনীয় বস্তু সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। রাজা অমরসিংহের উজীর তাঁহার একজন ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজির জন্য একখানি হাউস বোটের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজি সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্বামীজি প্রায় ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইতেন। সেখানেও অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সমাগম এবং শাস্ত্রচর্চ্চা হইত। একদিন ঐরূপ এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে ভোজনার্থ গমন করিলে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুষ্পবৃষ্টি ও মাল্য দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে আসিয়া বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা বাস্তবিক স্বামীজিকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। মধ্যে মধ্যে স্বামীজি নৌকারোহণে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। একদিন তিনি ঐরূপে নৌকায় করিয়া পামপুর নামক স্থানে গমন ও তথায় রাত্রিবাস করিলেন এবং অনন্তবাগ ও সুপ্রসিদ্ধ বীজবেরার

মন্দির দর্শন করিয়া পদব্রজে মার্ত্তণ্ড নামক স্থানে গমন করিলেন। সেখানে পাণ্ডাদিগের সহিত আলাপাদি করিয়া অক্ষয়বল (আচ্ছাবল) নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে লোকেরা তাঁহাকে 'পাণ্ডবের মন্দির' বলিয়া একটি প্রাচীন মন্দির দেখাইল। জনশ্রুতি এইরূপ যে উহা পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক। স্বামীজি এই মন্দিরের অত্যাশ্চর্য নির্মাণকৌশল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উহা দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত, এবং এমন উত্তম মন্দিরও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আচ্ছাবল হইতে তিনি পুনরায় শ্রীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখান হইতে উলার হ্রদের উপর দিয়া বারামুল্লা ও তথা হইতে মরিতে পৌঁছিলেন। সমগ্র পথ হাস্যকৌতুকাদিতে অতিবাহিত হইল। কাশ্মীরের ভুবনমোহন প্রাকৃতিক শোভা ও ঐতিহাসিক কালের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া তাঁহার ইতিহাস ও কলাবিদ্যানুরাগী চিত্তে বড়ই তৃপ্তিসঞ্চার হইল এবং শরীরও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিল।

মরিতে আসিয়া স্বামীজি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী বন্ধুদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারও সেখানে ছিলেন। ১৪ই অক্টোবর তারিখে অনেকগুলি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া তাঁহাকে একটি অভিনন্দন প্রদান করিলেন। স্বামীজি তদুত্তরে এক মনোহর বক্তৃতা দিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন।

পরদিন তিনি রাওলপিণ্ডিতে হংসরাজের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় আর্য্যসমাজের প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত আলাপ করিয়া তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। ঐ সময়ে বিচারপতি নারায়ণদাস, ব্যারিষ্টার ভকতরাম ও আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

এস্থানে দিবসদ্বয় অতীত হইতে না হইতে স্বামীজি মিঃ সুজনসিংহের মনোহর উদ্যানে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। বিচারপতি

রায় নারায়ণদাসের প্রস্তাবে ও উকীল হংসরাজের অনুমোদনে সুজনসিংহ সভাপতি হইলেন। সভায় প্রায় ৪০০ শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামীজি দুই ঘণ্টা ধরিয়া ইঁহাদের সমক্ষে ইংরেজীতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন ও বেদাদিশাস্ত্র হইতে বহুল বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। "কথনও বীরদর্পে আত্মার অনন্ত মহিমা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে মহা তেজ ও শক্তির সঞ্চার করিলেন, কথনও বা সামাজিক কপটাচারের প্রতি কঠোর শ্লেষপ্রয়োগে তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্যরসের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।" সে বক্তৃতাশ্রবণে সকলেরই প্রাণে অভূতপূর্ব্ব ভাব ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া জনৈক ব্যক্তিকে সাধনরহস্য উপদেশ দিলেন। তারপর রাত্রে ভকতরামের কুঠীতে নিমন্ত্রিত হইয়া বিচারপতি নারায়ণদাস, হংসরাজ ও প্রকাশানন্দ প্রভৃতির সহিত আহার করিলেন। তথা হইতে রাত্রি ১০টার সময় স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত প্রকাশানন্দের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত রহিলেন।

পরদিন নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ, বিশেষতঃ বিচারপতি নারায়ণদাস, বাবা ক্ষেমসিংহের পুত্র ও প্রকাশানন্দের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি আর্য্যসমাজ ও মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের সমাধান করিলেন এবং তৎপর দিবস প্রকাশানন্দের সহিত স্থানীয় কালীবাড়ীতে গমন করিয়া ভোজনান্তে একজন শিখের সহিত অনেক চর্চ্চা করিলেন। সে সময়ে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর কালী-বাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটি ক্ষুদ্র সভা হইল। তাহাতে স্বদেশের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, এবিষয়ে স্বামীজি অনেক উপদেশ দিলেন। এইভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল, হংসরাজের বাটীতে এবং সেভিয়ার সাহেবের বাংলাতেও কয়দিন খুব দীর্ঘ প্রসঙ্গ চলিল।

যাত্রার দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তিনি জনকয়েক দর্শকের সহিত আলাপে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একজন গুরুভ্রাতা একটি ফিটন গাড়ী লইয়া আসিয়া বলিলেন যে, একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহেন। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। প্রকাশানন্দ ও অপর কয়েকজন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি স্বামীজিকে পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন ও বলিলেন, "এই পাঁচটি প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে আমি নাস্তিক হইয়া যাইব।" স্বামীজি একটি একটি করিয়া প্রত্যেক প্রশ্নের তন্ন তন্ন বিচার ও সূক্ষ্ম মীমাংসা করিয়া দিলে ভদ্রলোকটির মন হইতে সকল সন্দেহ অপসৃত হইল এবং তিনি সম্পূর্ণ কৃতকৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে জলযোগ করাইলেন।

ঐ দিন রাত্রি বারটার সময় তিনি রাওলপিণ্ডি ত্যাগ করিয়া কাশ্মীর-রাজের নিমন্ত্রণে জম্মু যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে পৌঁছিতেই রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক রাজ-অতিথিরূপে সমাদৃত হইয়া অভ্যর্থনা বিভাগের অধ্যক্ষ বাবু মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে রহিলেন। মহেশবাবু ও তাঁহার পুত্রগণ অতিশয় সম্মান সহকারে তাঁহার সেবায় তৎপর হইলেন। সায়ংকালে স্বামীজি রাজার পুস্তকালয় পরিদর্শন করিয়া পরদিবস মহেশবাবুর গুরু কৈলাসানন্দ স্বামী ও আরও বহুসংখ্যক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিলেন এবং মহেশবাবুর সহিত কাশ্মীরে একটি মঠস্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

২২শে তারিখে বেলা ১১টার সময় তিনি রাজদত্ত বগিগাড়ীতে করিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাজের নিকট তাঁহার দুই ভ্রাতা ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজিকে এক স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হইল। প্রথমে মহারাজ কর্ত্তৃক সন্ন্যাসমার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান

করিলেন, এবং ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাহ্যাচারে অত্যাসক্তির দোষ প্রদর্শন করতঃ যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া অন্ধের ন্যায় কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়াতেই ভারতের লোক সাত শত বর্ষ পরের দাসত্ব করিতেছে। বলিলেন, "আজকাল ব্যভিচারাদি প্রকৃত পাপাচরণে কেহ সমাজচ্যুত হয় না, কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটী ঘটিলেই যেন সমাজের ঘোরতর সর্ব্বনাশ হয়।" তারপর সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি উহার সমর্থনপূর্ব্বক বলিলেন, রামচন্দ্র লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন এবং এখনও বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতি স্থানে ভারতের অনেক লোক বাণিজ্য করিতেছে,—আর বহুদেশ ভ্রমণ না করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। পরিশেষে ইউরোপ আমেরিকাদি দেশে বেদান্ত-প্রচারের সার্থকতা কি এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবিত কার্য্য কি তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, দেশের হিতসাধন করিতে গিয়া নিরয়গামী হওয়াও তিনি সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রায় তিনটার সময় কথাবার্ত্তা শেষ হইল। কথাবার্ত্তায় মহারাজ প্রভৃতি সকলেই অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ দিন বৈকালে ছোট রাজার সহিতও বিস্তর কথাবার্ত্তা হইল। স্বামীজি বগিগাড়ীতে করিয়া তাঁহার নূতন ভবনে গমন করিলেন। বগি পৌছিবামাত্র রাজা স্বামীজিকে প্রণামপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

পরদিবস শিয়ালকোট হইতে অনেকগুলি ভদ্রলোক তথায় যাইবার জন্য স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে তিনি সাধারণের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিলেন। ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহারাজ অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন এবং তৎপর দিবস পুনরায় আর একটি বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, স্বামীজি যেন

অন্ততঃ ১০।১২ দিন ওখানে থাকিয়া একদিন অন্তর একটি করিয়া বক্তৃতা দিয়া সকলকে সুখী করেন।

এই সময়ে স্বামীজির অধিকাংশ বক্তৃতাই হিন্দীতে প্রদত্ত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ না থাকাতে সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দীভাষার মধ্যে তিনি যে অদ্ভুত শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন তদ্দর্শনে কাশ্মীরাধিপ তাঁহাকে ঐ ভাষায় কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিতে অনুরোধ করেন। স্বামীজিও হৃষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহার জন্য কতকগুলি হিন্দী প্রবন্ধ লিখিয়া দেন। মহারাজ সেগুলি পাঠ করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

২৪শে অক্টোবর প্রাতঃকালে তিনি পদব্রজে নদী ও নদীতীরস্থ জলের কল দেখিলেন, এবং পরে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমাগত লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। তৎপরে ভোজন ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সঙ্গীতালাপ করিয়া সন্ধ্যার সময় বগিতে উঠিয়া সহরের দীপমালিকা দর্শন করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে প্রচ্যুতানন্দের নিকট বন্ধুভাবে আর্য্যসমাজের কতকগুলি ত্রুটীর উল্লেখ এবং পাঞ্জাবীদিগের অনভিজ্ঞতার বর্ণনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

২৫শে প্রাতঃকালে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া রাজার পশুশালা দর্শন করিলেন ও অপরাহ্ণে মহারাজের অনুরোধে এক বৃহৎ জনসঙ্ঘের সম্মুখে বেদপুরাণাদি শাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক দুই ঘণ্টা ধরিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং উপসংহারে ভক্তিমার্গের ব্যাখ্যা করিলেন।

২৮শে প্রাতঃকালে অল্প ভ্রমণের পর স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক গূঢ়তত্ত্বের উপদেশ দিতে লাগিলেন। উহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, সকলের ভোগ তুল্য হওয়া উচিত।- বংশগত বা গুণগত জাতিভেদে ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠিয়া যাওয়া উচিত। তবে

বংশগত জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। যেমন, কোন ব্যক্তি যতই গুণবান বা ধনবান হউক না কেন, বংশগত জাতি থাকিলে স্বজাতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং তাহার জাতি, তাহার গুণ ও ধনের কিছু না কিছু অংশভাগী হইয়া থাকে। গুণগত জাতিতে তাহা হইতে পারে না। তারপর বেকনের নীতিতত্ত্বের কথা উঠিল। স্বামীজি তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন, মানযশের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য করাই মহাপুরুষের লক্ষণ—আমাকে লোকে মানুক বা না মানুক, যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি তাহা করিয়া যাইব। নিজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ডোমপাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতেন। এই সকল কথাবার্ত্তা নিজের অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণের সঙ্গেই হইত।

২৯শে অক্টোবর তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শিয়ালকোট গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কাশ্মীরপতি অতিশয় দুঃখের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিয়া বলিলেন, যখনই তিনি কাশ্মীর বা জম্মুতে আসিবেন তখনই যেন কাশ্মীররাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

শিয়ালকোটে গিয়া তিনি লালা মূলচাঁদ এম্-এ, এল্-এল্-বি-র বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে দুইটী বক্তৃতা দিবার আয়োজন হইয়াছিল—একটি ইংরেজীতে, অপরটি হিন্দীতে। ইংরেজী বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় জাতিসমূহের ধর্ম্মবিষয়ক ঐক্য প্রদর্শন করিলেন এবং হিন্দীতে সাধারণের জন্য ভক্তিবাদের ব্যাখ্যা করিলেন। শিয়ালকোটে অবস্থানকালে স্বামীজির নিকট অনেক প্রকার লোক আসিত। একদিন পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে দুইজন সাধিকা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার একটি বালিকাবিদ্যালয়-স্থাপনের প্রবল ইচ্ছা হইল এবং তিনি শিয়ালকোটবাসীদের নিকট উহা প্রকাশ করিলেন।

সকলেই আগ্রহের সহিত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত করিয়া একটি কমিটিও গঠিত হইল।

৫ই নভেম্বর স্বামীজি সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শিয়ালকোট ত্যাগ করিয়া বেলা সাড়ে চারিটার সময় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বিপুল জনসংক্ষোভ হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মসভার পরিচালকগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বন্দোবস্ত অনুসারে তিনি প্রথমে রাজা ধ্যানসিংহের হাভেলী নামক লাহোরের সুবৃহৎ প্রাসাদে উপনীত হইলেন এবং পরে তথা হইতে 'ট্রিবিউন'-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন।

আর্য্যসমাজও স্বামীজিকে অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না। দয়ানন্দ এঙ্গলো-বেদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রভৃতি বড় বড় আর্য্য-সমাজিগণ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত নানারূপ চর্চ্চা করিতেন। আর্য্যসমাজীরা বেদকে—বিশেষতঃ বেদের সংহিতাভাগকে—একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, আর ইহাও বলেন যে, বেদের ব্যাখ্যা এক প্রকারই হইতে পারে। স্বামীজির মতে কিন্তু বেদের উপনিষদ্‌ভাগেরই বিশেষ প্রামাণ্য এবং ঐ উপনিষদের ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদী. বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার বাদিগণ আপনার ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারেন। ইহাতে কোন হানি নাই, বরং ইহাতে উন্নতিই হইয়া থাকে, কারণ মানুষকে জোর করিয়া কোন একটা ভাব না দিয়া তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিলে যদিও তাহার উন্নতি খুব ধীরে ধীরে হয়, তথাপি সেই উন্নতি পাকা হইয়া থাকে। যদি বলা যায় দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই কিরূপে এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্যানুসারে ইহা সম্ভব।

আর্য্যসমাজীদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর-ধারণার তুল্য। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময়। তাঁহারা অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্মও বুঝিতে পারেন না এবং মূর্ত্তিপূজকের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কারণে তাঁহারা অদ্বৈতবাদ ও মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী। স্বামীজি অকাট্য যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্য্যসমাজীদিগকে বিচার ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত আর কোন মতই টিঁকিতে পারে না, ইহা বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তারপর দেখাইলেন—নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের ধারণা আমাদের মন এবং তজ্জাত কল্পনাশক্তির সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং যদি আমাদের অক্ষমতাবশতঃ আমরা কল্পনাশক্তিরই সহায়তা গ্রহণ করিলাম, তখন যাহারা আরও নিম্ন অধিকারী, তাহারা যদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রতিমাদি দেখিয়া সহজে ঈশ্বরোপলব্ধি করিতে পারে, তবে তোমার তাহাকে বাধা দিবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী হও, তোমার নিজ অভিপ্রায় মত সাধনা কর, কিন্তু অপর দুর্ব্বল ভ্রাতাকে বাধা দাও কেন? আর তুমি আপনাকে যতদূর জ্ঞানী মনে করিতেছ, বাস্তবিক তুমি ততদূর জ্ঞানী নহ—তোমা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক (অদ্বৈতবাদী) আছে। এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা স্বামীজি আর্য্যসমাজের গোঁড়ামি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

প্রায় প্রত্যহ প্রাতে দুই ঘণ্টা ও অপরাহ্ণে দেড় ঘণ্টা ধ্যানসিংহের হাবেলিতে সমাগত অনুমান দেড়শত দুইশত পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত এরূপ চর্চ্চা হইত। এতদ্ব্যতীত স্বামীজির আবাসস্থান নগেন্দ্র গুপ্তের বাটীতেও অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন নগেন্দ্র গুপ্তের বাটীতে হংসরাজের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি নিম্নলিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

হংসরাজ আর্য্যসমাজের মত সমর্থন করিয়া বলিতেছিলেন, বেদের এক-প্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে পারে। স্বামীজি নানাবিধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া অধিকারিবিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝাইতেছিলেন। হংসরাজও বিপরীত যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উহা খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছিলেন—অবশেষে স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন, "লালাজি, আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমি গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতিসাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও আমি জানি। আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলা ও তাঁহার আশ্রয় লইলেই মুক্তি—এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামি দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতি শীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতার-রূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমি ঐ প্রচারের বিরোধী। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু উহা পাকা হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি চার বৎসর অন্ততঃ এইরূপ উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিব। যদি উহাতে কোন ফল না হয় (আমার দৃঢ় বিশ্বাস উহাতে নিশ্চয়ই ফল হইবে) তবে আমি গোঁড়ামি প্রচার করিব।"

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজির সম্বন্ধে দুই-একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বিবৃত হইতেছে। যদিও ঐগুলি কোন বৃহৎ ব্যাপার নহে, তথাপি সকলেই জানেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মহাপুরুষগণের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝা যায়। স্বামীজির

জনৈক শিষ্য, যিনি এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, এই ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছেন।

"স্বামীজি তাঁহার জনৈক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সঙ্গী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু স্বামীজি, সে ব্যক্তি আপনাকে মানে না।' স্বামীজি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'ভাল লোক হইতে হইলে যে আমায় মানিতে হইবে, ইহার মানে কি?' সঙ্গীটি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

"এই সময়ে লাহোরে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস আসিয়াছে। একদিন কোন কার্য্য উপলক্ষে উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী বাবু মতিলাল বসু নগেন্দ্র গুপ্তের বাটীতে আসিয়াছেন। স্বামীজি দেখিয়াই চিনিলেন, তাঁহার বাল্যবন্ধু। অমনি তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় খোলাখুলি ভাবে কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ইঁহারা এক আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। মতিবাবু তাঁহার বাল্যসঙ্গীর অপূর্ব্ব তেজ, প্রতিভা ও শক্তি-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যেন ঝলসিয়া গেলেন—স্বামীজি যতই তাঁহার সহিত আপনার মত ব্যবহার ও তদনুরূপ কথাবার্ত্তা কহিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততই সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া মতিবাবু স্বামীজিকে সম্বোধন করিয়া অতি দীনস্বরে বলিলেন, 'ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাকব?' স্বামীজি অতিশয় স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, 'হাঁরে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, আর তুইও সেই মতি।' স্বামীজি এরূপভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, মতিবাবুর সমুদয় সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল।"—ভারতে বিবেকানন্দ

স্বামীজি লাহোরে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলেন। ধ্যানসিংহের হাবেলিতে প্রথম দিনের বক্তৃতার আয়োজন হয়। বিষয় ছিল 'আমাদের বর্ত্তমান

সমস্যাসমূহ'। স্বামীজি বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া প্রায় ছয় সহস্রেরও অধিক লোকসমাগম হয় এবং স্থানাভাববশতঃ এত অধিক গোলমাল হইতে থাকে যে, স্বামীজি যতদূর সাধ্য উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিয়াও সভায় নিস্তব্ধতা আনয়নে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তিনি দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার পর বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ রাখিয়াই আসন পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। এই বক্তৃতা পরে 'হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ' নামে প্রকাশিত হয়।

শুক্রবার দিন উক্ত বক্তৃতার পর মঙ্গলবার অধ্যাপক বসুর বেঙ্গল সার্কাসের ক্রীড়াভূমিতে দ্বিতীয় বক্তৃতার আয়োজন হইল। এইটী 'ভক্তি' বিষয়ক বক্তৃতা। স্বামীজি পুরাণাদির স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া শেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নারায়ণজ্ঞানে দরিদ্রের সেবা করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু এই বক্তৃতাও অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হয়, কারণ সেদিন সার্কাসের ক্রীড়াপ্রদর্শনের দিন ছিল; মতিবাবু স্বামীজিকে রাত্রি ৮টার পূর্ব্বে বক্তৃতা শেষ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কতকটা বলা হইলে পর স্বামীজি লক্ষ্য করিলেন, মতিবাবু ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছেন। তিনি মনে করিলেন মতিবাবু তাঁহাকে বক্তৃতা বন্ধ করিবার সঙ্কেত করিতেছেন, এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সহসা মধ্যপথে বক্তৃতা বন্ধ করিলেন। উপর্য্যুক্ত দুই দিবসই স্বামীজি বক্তৃতা দিয়া স্বয়ং সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, লাহোরবাসিগণ স্বামীজির এই দুই বক্তৃতায় তৃপ্ত হইতে না পারিয়া পরবর্ত্তী শুক্রবার ধ্যানসিংহের হাবেলিতে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতার আয়োজন করিলেন। এই দিন লাহোর কলেজের ছাত্রবৃন্দ সমুদয় বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সভায় গোলমাল না হয় এজন্য বিনামূল্যে টিকিট বিতরণ এবং লোকের বসিবার জন্য চেয়ার প্রভৃতিরও সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। লোকসংখ্যা পূর্ব্ববৎ অতিরিক্ত হয়

নাই অথচ লাহোরের সর্ব্বশ্রেণীর সমুদয় শিক্ষিত ভদ্রলোকই উপস্থিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতাটি প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া হয় এবং সকলেই শেষ পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি এই বক্তৃতা শুনিবার পর বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন—হাঁ, এই বক্তৃতায় 'মাল' আছে। গুড্‌উইন সাহেবও লিখিয়াছেন—ইহাই লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ 'বেদান্ত' বক্তৃতা। এই বক্তৃতাটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন কেন ইহা এত প্রশংসিত হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি ভারতবর্ষে যত বক্তৃতা করিয়াছিলেন বোধ হয় তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আর একদিন স্বামীজি লাহোরের অনেকগুলি যুবককে লইয়া একটি সভা স্থাপন করিলেন। সভাস্থাপনের পূর্ব্বে তিনি অতি বিশদ ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, কিরূপ ভাবে তাহারা আপনাপন প্রতিবেশীর কল্যাণসাধনে সমর্থ। সভাটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে গঠিত হইল। স্থির হইল, অপরাহ্ণে অধ্যয়নাদির অবকাশে সভ্যগণকে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতে হইবে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষুধার্ত্ত খাইতে পারে, পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ ও পথ্য পায়, অশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা পায়, সাদাসিধা ভাবে এইরূপ কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে।

লাহোরে স্বামীজি সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সনাতন ও আর্য্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও স্বামীজির উপস্থিতি নিবন্ধন তাঁহারা কিয়দ্দিনের জন্য নিজ নিজ বিরোধ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আর্য্যসমাজীদিগের ভদ্র ব্যবহারে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার অসাম্প্রদায়িকতা লাহোরে সবিশেষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কারণ নৈষ্ঠিক হিন্দুসমাজের কোন কোন সমিতি কর্ত্তৃক আর্য্যসমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি তাঁহাদের

ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন নাই। তবে তাঁহাদিগের সন্তোষার্থ 'শ্রাদ্ধ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, কারণ আর্য্যসমাজীরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে আদৌ বিশ্বাসী নহেন এবং উহার আবশ্যকতাও স্বীকার করেন না। কিন্তু সনাতন সভার কর্তৃপক্ষগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অনিচ্ছাক্রমে উহাতে সম্মত হইলেও আর্য্যসমাজকে আক্রমণ করিয়া কোন কথা বলিতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন না। প্রথমে কথা ছিল, বক্তৃতাটি প্রকাশ্যে হইবে কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঘটনা* উপলক্ষ করিয়া স্বামীজি তাহা হইতে না দিয়া কৌশলক্রমে উভয় পক্ষের নেতৃগণের সমক্ষে কথোপকথনচ্ছলে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় হিন্দু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা প্রমাণ করিয়া আর্য্যসমাজীদের সকল তর্ক যুক্তিবলে নিরস্ত করিলেন। এই দীর্ঘকাল প্রচলিত অনুষ্ঠানের উৎপত্তিনির্ণয়প্রসঙ্গে

* ব্যাপারটি এইরূপ—এইদিন পাঞ্জাবীগণ স্থির করিয়াছিল স্বামীজিকে লইয়া নগর-সংকীর্ত্তন করিবে এবং স্বামীজিকে তাঞ্জামে চড়াইয়া সংকীর্ত্তনের সঙ্গে শহর প্রদক্ষিণ করিবে। স্বামীজি তাঞ্জামে চড়িতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু নগরসংকীর্ত্তনে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সঙ্গীদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, পাঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ বড় শুষ্ক—যদি এইরূপ সংকীর্ত্তনের দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে কিছু ভক্তি প্রবেশ করে, এইজন্য তিনি সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে ইচ্ছুক। বাঙ্গালীদিগকে তিনি নিশান প্রভৃতির আয়োজন ভাল করিয়া করিতে বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বামীজি সঙ্গিগণ সহ লাহোরের মিউজিয়মে বেড়াইয়া ধ্যানসিংহের হাবেলিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছে, কিন্তু সংকীর্ত্তনের উদ্যোক্তাগণ নাই। লোকপরম্পরায় শুনা গেল, লাহোর শহরের মধ্যে একখানি মাত্র খোল ছিল—তাহাও ব্যবহারাভাবে এমন খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, এক ঘা চাঁটি দিবামাত্র ফাঁসিয়া গিয়াছে। সংকীর্ত্তন না হওয়াতে স্বামীজি 'শ্রাদ্ধ' সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিলেন না। সমবেত লোকগণের মধ্যে গিয়া জানাইলেন, সেদিন আর বক্তৃতা হইবে না।

তিনি বলিলেন—প্রেত-পূজাতেই হিন্দুধর্ম্মের আরম্ভ। প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের শরীরে কোন মৃত আত্মীয়ের প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিয়া তদুদ্দেশ্যে পূজা ও বলি প্রদানের প্রথা ছিল। ক্রমে দৃষ্ট হইল যে, যেসকল ব্যক্তির শরীরে প্রেতের আবির্ভাব হয়, তাহারা বড় শারীরিক দৌর্ব্বল্য অনুভব করে, সুতরাং এ প্রথার পরিবর্ত্তে কুশপুত্তলীতে প্রেতানয়নের ব্যবস্থা প্রচলিত হইল এবং তাহারই উদ্দেশে পিণ্ড ও পূজা প্রদত্ত হইতে লাগিল। বৈদিকযুগের দেবতাদির আহ্বান ও পূজাও তিনি এই প্রেত-পূজারই পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। যাহা হউক, স্বামীজি পাঞ্জাবে প্রধানতঃ সনাতন ও আর্য্যধর্ম্মীদের মধ্যে প্রচলিত দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৎস্থলে শান্তি ও মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা তৎপ্রতি সম্মান-প্রদর্শনব্যাপারে উভয় পক্ষের প্রতিযোগিতা ও দলে দলে তাঁহার নিকট আগমন ও বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইতেই প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক তিনি আর্য্যসমাজীদিগের প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও তৎপ্রতি এরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কিয়দ্দিন যাবৎ লোকমুখে প্রচার হইতে লাগিল, প্রধান প্রধান আর্য্যসমাজীরা তাঁহাকে উক্ত সমাজের নেতৃত্বপদে বরণ করিবেন।

লাহোরে স্বামীজির সহিত গণিতাধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামীর আলাপ হয়। ইনিই পরে সুবিখ্যাত স্বামী রামতীর্থ নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হন এবং স্বামীজির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার কার্যে গমন করেন ও অনেক ভক্ত ও শিষ্য সংগ্রহে কৃতকার্য্য হন। তিনি স্বামীজিকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং সশিষ্য স্বামীজিকে তাঁহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে স্বামীজি গান ধরিলেন, 'যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহী, যাঁহা কাম তাঁহা নেহী রাম।'

তীর্থরাম লিখিতেছেন—"তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বরে গানের অর্থ সকলের হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল।" তিনি স্বামীজিকে তাঁহার পুস্তকালয় প্রদর্শন করিলে স্বামীজি মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'তৃণগুচ্ছ' (Leaves of Grass) নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। ওয়াল্ট হুইটম্যানকে তিনি মার্কিন সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করিতেন। স্বামীজির সহিত তীর্থরামের অতিশয় সৌহৃদ্য হইয়াছিল। তীর্থরাম তাঁহাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। স্বামীজি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তীর্থরামের পকেটে পুনঃ স্থাপিত করিয়া বলিলেন—"বেশ ত বন্ধু, এই পকেটেই আমার পরা হবে।"

আর একদিন অপরাহ্ণে স্বামীজির জন্য একটি সান্ধ্য সম্মিলন হইল এবং তাহাতে লাহোরের গণ্যমান্য লোকদের সহিত স্বামীজির পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। লাহোরের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেক বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক স্বামীজিকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই সকল স্থানেই নানাবিধ চর্চ্চা হইত। অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি স্বামীজির নিকট গুপ্তভাবে সাধনাদি শিক্ষা করিলেন। লাহোরের নিকটবর্ত্তী মিয়ানমীরে অনেক বাঙ্গালী কমিসেরিয়েটের কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন। স্বামীজি একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। নানাবিধ ফলমূল মিষ্টান্নাদি দ্বারা তাঁহারা স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণকে জলযোগ করাইলেন। তাঁহারা স্বামীজির মধুর অথচ শিক্ষাপ্রদ উপদেশবাণী শুনিয়া পরম সন্তোষলাভ করিলেন।

লাহোরে শিখসম্প্রদায়ের 'শুদ্ধিসভা' নামক সভা আছে। যেসকল শিখ কোন কারণে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার শিখ হইবার প্রার্থনা করে এবং মোহবশতঃ এরূপ ধর্ম্মান্তর-

গ্রহণরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিতে পারে, তবে এই শুদ্ধিসভা তাহাদিগকে পুনরায় শিখ করিয়া থাকে। স্বামীজি নিমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গিগণ সহ এই সভার একটি অধিবেশনে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন একটা সুবৃহৎ কড়ায় কড়া-প্রসাদ (হালুয়া) প্রস্তুত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। আজ দুই জনকে 'শুদ্ধ' করা হইবে। প্রথমতঃ সভার সম্পাদক মহাশয় কিরূপ অবস্থায় ইহারা মুসলমান হইয়াছিল সেই সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। পরে শুদ্ধিকামিদ্বয় অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক সভাসমক্ষে পুনরায় শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিলে গুরু গোবিন্দসিংহের নামোচ্চারণ, গ্রন্থসাহেবের পবিত্র মন্ত্রসকল পাঠ ও পবিত্র বারিসেবনে উহাদিগকে 'শুদ্ধ' করা হইল। পরিশেষে সভাস্থ সকলকে কড়াপ্রসাদ বিতরিত হইল। স্বামীজি শিখদিগের এইরূপ উদার ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। এইরূপে লাহোরে দশ-বার দিন কাটিয়া গেল। স্বামীজি সর্ব্বদাই এখানে কেবল মতবাদ অপেক্ষা কার্য্যের উপর বিশেষ ঝোঁক দিতেন।

লাহোর হইতে স্বামীজি ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া দেরাদুন যাত্রা করিলেন। এখানেও দশ দিন ছিলেন এবং যদিও উদ্দেশ্য ছিল কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ না করিয়া বিশ্রাম করিবেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার ভিতরে যে অদম্য শক্তি কার্য্য করিতেছিল তাহার প্রেরণায় তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গী শিষ্যগণকে রামানুজাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং সময়ে সময়ে অধ্যাপনায় এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সেভিয়ার-দম্পতি অপরাহ্ণ-ভ্রমণের জন্য আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিলেও খেয়াল করিতেন না। এখন হইতে ভ্রমণের অবশিষ্ট কাল এই অধ্যাপনা রীতিমত চলিয়াছিল—একদিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই। স্বামী

অচ্যুতানন্দের উপর তিনি সাংখ্যদর্শন পড়াইবার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায়ই পাঠের সময় নিজে উপস্থিত থাকিতেন। অচ্যুতানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অনেক সময়ে তিনি কোনও কোনও স্থলের তাৎপর্য্য-নিরূপণে অক্ষম হইলে স্বামীজি তাঁহার সাহায্যার্থ দুই-চারিটি কথায় এমন সরলভাবে উক্ত অংশের ব্যাখ্যা করিতেন যে, অচ্যুতানন্দ বিস্মিত হইয়া যাইতেন। কাশ্মীরে এবং ধর্মশালার ন্যায় দেরাদুনেও সেভিয়ার-দম্পতি আশ্রমবাটী-নির্ম্মাণার্থ একটি জমি অন্বেষণ করিতেছিলেন. কিন্তু সুবিধামত স্থান মিলিল না।

দেরাদুনে অবস্থানকালে খেতড়ির রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ গুরুদর্শন, দ্বিতীয়তঃ প্রজাদিগের মধ্যে স্বামীজির ভাবপ্রচার। সুতরাং স্বামীজিকে দেরাদুন ত্যাগ করিয়া রাজপুতানার দিকে অগ্রসর হইতে হইল। পথে তিনি সাহারানপুর, দিল্লী, আলোয়ার ও জয়পুর দর্শন করিলেন। দিল্লীতে তিনি ৪।৫ দিন অবস্থান করিলেন। এক্ষণে আর স্বামীজির অভ্যর্থনা প্রভৃতিতে রুচি ছিল না, পুরাতন বন্ধু ও ভক্তগণের সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। সেইজন্য অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া নটুকৃষ্ণ বলিয়া এক পূর্ব্বেকার আলাপী গরিব শিষ্যের বাটীতে উঠিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমেরিকাযাত্রার বহুপূর্ব্বে ভারতভ্রমণের সময় ইঁহার সহিত স্বামীজির পরিচয় এবং স্বামীজির সঙ্গলাভে ইঁহার পূর্ব্ব-চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয়। ইনি বরাবরই অতি সরলপ্রকৃতি ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। স্বামীজিকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পূজ্যপাদ শুদ্ধানন্দ স্বামী বলেন, "আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে একসময়ে স্বামীজি রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কষ্টে অতিশয় অস্থির হইয়া ইঁহার নিকট একখানি

মধ্যম শ্রেণীর টিকিট প্রার্থনা করায় ইনি বলিয়াছিলেন, 'কি গুরুজী, বিলাস ঢুকছে নাকি?'" এখন তাঁহার সেই গুরুজী পাশ্চাত্যদেশ বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেও গুরুশিষ্যে সেইরূপ অবাধ ও অকপট ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। একদিন তিনি বলিলেন, "গুরুজী, প্রায় ৫।৬ মাস ধরে সন্ধ্যে আহ্নিক কচ্ছি, কিন্তু কিছু পাচ্ছি নে।" স্বামীজি বলিলেন, "ভাষায় (অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতভাষার পরিবর্ত্তে সহজবোধ্য মাতৃভাষায়) ভগবানকে ডাক দেখি।" এই বলিয়া বেশ করিয়া গায়ত্রীর অর্থ টি পুনরায় বুঝাইয়া দিলেন। উক্ত ভদ্রলোক আর একদিন স্বামীজির জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যের শিখার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এটি আবার কি? ব্রহ্মচারী উত্তরপ্রদানে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করায় স্বামীজি বলিলেন, "ও ব্রহ্মচারী কিনা, তাই শিখা রাখিয়াছে।" নটুকৃষ্ণ অমনি চক্ষু টিপিয়া বলিলেন, "আর আপনি বুঝি পরমহংস হয়েছেন!" এইরূপ স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মধ্যে গুরুশিষ্যে আলাপ হইত এবং প্রেমও ছিল ভরপুর। নটুকৃষ্ণ প্রাণপণে স্বামীজি ও তাঁহার শিষ্যগণের সেবা করিতে লাগিলেন। এখানকার কলেজের একজন অধ্যাপক স্বামীজির নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্যোগে দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রলোক একটি ক্ষুদ্র সভা করিয়া স্বামীজিকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজি সকলের প্রশ্নেরই সুমীমাংসা করিয়া দিলেন। দিল্লী হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে ওখানকার পুরাতন দুর্গ কুতবমিনার, প্রাচীন দিল্লী প্রভৃতি সমুদয় দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামীজি সহচরগণকে এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত ইতিহাসের কথা গল্পের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত।

দিল্লী হইতে তিনি আলোয়ারে গমন করিলেন। চারিদিকে বালির

পাহাড়—তাহার মধ্য দিয়া ট্রেন চলিয়াছে। রেওয়াড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখা গেল, তথায় খেতড়ির রাজার লোক পাল্কি, উট, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যান লইয়া উপস্থিত। খেতড়ি জয়পুরের অধীন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য—জয়পুর শহর হইতে তৃণহীন মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল পথ যাইতে হয়। রেওয়াড়ি ষ্টেশন হইয়া যাইলে মাইল কুড়ি কম পড়ে। সেইজন্য রাজার লোকজন এইখানেই অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু স্বামীজি একেবারে খেতড়ি যাইবেন কিরূপে? আলোয়ারের ভক্ত শিষ্যগণ যে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং তিনি ৪।৫ দিনের জন্য আলোয়ারে গিয়া রহিলেন এবং এক আধটি বক্তৃতাও করিলেন। আলোয়ার মহারাজের একটি বাটী তাঁহার ও সঙ্গী শিষ্যগণের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ স্বয়ং কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে ছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ভক্তশিষ্যগণের যত্নে তাঁহার অভ্যর্থনা বা সেবার কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর আনন্দের সঞ্চার হইল প্রব্রজ্যাকালের বন্ধুদিগের দর্শনলাভে। এখানে দুই-একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটে, যাহা হইতে আমরা তাঁহার অন্তঃকরণের মহত্ত্ব ও সাধারণের প্রতি অহৈতুক প্রেমের পরিচয় পাই। তিনি রেলওয়ে ষ্টেশন নামিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে বড় বড় লোকের ভিড়। সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে সমুৎসুক। তিনি কিন্তু তাহার মধ্যে একজন পুরাতন ভক্তকে দীনহীন বেশে দূরে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া লোকলজ্জা বা সভ্যতার আদব কায়দা না মানিয়া উচ্চকণ্ঠে 'রামস্নেহী' 'রামস্নেহী' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সেই লোকই বটে! অনেক হোমরা-চোমরা বড় লোককে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহাকে নিকটে আনাইলেন এবং পূর্ব্বেকার মত প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মান্দ্রাজেও এই রকম আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি একটা বিরাট মিছিলের মধ্যে গাড়ী করিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন পথপার্শ্বে একখানি পরিচিত মুখ। অমনি তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "সদানন্দ" বাবা, সদানন্দ বাবা, এদিকে এস।" গাড়ী থামান হইল, সদানন্দ স্বামী আসিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে চলিলেন।

বহুদিন পরে পরিচিত ব্যক্তি দেখিলে তাঁহার প্রেমসমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিত। কলিকাতায় বলরামবাবুর বাটীতে উপেন্দ্রবাবু নামে এক ভদ্রলোক (ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে স্বামীজির সহপাঠী ছিলেন) একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। স্বামীজি তখন প্রায় পঞ্চাশ জন লোকের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কথা কহিতেছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে দেখিবামাত্র আসন হইতে উঠিয়া দৌড়াইয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। উপেন্দ্রবাবু বলেন যে সেই দিন তাঁহার মনে পাঠ্যাবস্থার স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক স্বামীজি যাহার সহিত এক দিবসও আলাপ করিতেন, বহু বর্ষ অতীত হইলেও তাহাকে ভুলিতেন না।

আলোয়ারেও পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে স্বামীজির বড় আনন্দবোধ হইল। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার ভ্রমণের কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন এবং ভারতবর্ষে কি কি কার্য্য করিবেন তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পার্থিব সম্মানে অবিকৃত ও পূর্ব্ববৎ প্রেমপূর্ণহৃদয় সুহৃৎ এবং সরল ও সত্যানুরাগী সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন।

চতুর্দ্দিক হইতে এত নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল যে, সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু একজনের নিমন্ত্রণ তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন—সে একটি বৃদ্ধার। পূর্ব্বে একবার তাহার গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি তাহাকে বলিয়া

পাঠাইলেন যে, তাহার মোটা চাপাটি খাইতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। শ্রবণমাত্র বৃদ্ধার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল। অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে পরিবেশন করিতে করিতে বৃদ্ধা স্বামীজিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাছা, আমার ত ইচ্ছে করে তোমাদের ভাল ভাল জিনিস খেতে দিই, কিন্তু আমি গরিব। ভাল জিনিস কোথায় পাবো বল?" স্বামীজি পরম পরিতোষের সহিত তৎপ্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী আহার করিতে করিতে শিষ্যদিগকে বলিলেন, "দেখছো হে, বুড়ীমার কি স্নেহ! আর এ চাপাটিগুলি কি সাত্ত্বিক!" বৃদ্ধাকে দারিদ্র্য-পীড়ায় নিতান্ত কাতর দেখিয়া এবং তাহার পূর্ব্বেকার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজি বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে গৃহস্বামীর হস্তে তাহার সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া একখানি একশত টাকার নোট দিয়া গেলেন।

আলোয়ার হইতে জয়পুর যাওয়া হইল। এখানে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমাগত হইতে লাগিলেন। স্বামীজি খেতড়ীর রাজার বাংলায় রহিলেন। শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এই স্থানেই একদিন সামান্য ফকিরবেশে আসিয়াছিলাম—তখন রাজপাচক অনেক মুখনাড়া দিয়া দিনান্তে চারিটি খাইতে দিয়া যাইত। আর এখন পালঙ্কের গদিতে শয়নের বন্দোবস্ত হইতেছে—কত লোক সেবার জন্য অহরহঃ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ কথাটি অতি সত্য যে 'অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরং শরীরিণাম্।' জয়পুর হইতে ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া খেতড়ি যাওয়া হইল। এদিকে মরুভূমির মধ্য দিয়া যাওয়া হইতেছে, যেই পড়াওয়ে (পথের মধ্যে বিশ্রামার্থ স্থান) পৌছান হইতেছে, অমনি বেদান্ত-অধ্যাপনা আরম্ভ। কেহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা রথযোগে চলিতেছে। কত প্রসঙ্গ, কত আনন্দের কথাই

হইতেছে! এই সময়ে স্বামীজি একদিন বলিয়াছিলেন যে তিনি পড়াওয়ে একটা ভূত দেখিয়াছিলেন।

খেতড়ির রাজা জয়পুর হইতে খেতড়ি পর্য্যন্ত উপযুক্ত বন্দোবস্তের আদেশ দিয়া স্বয়ং বার মাইল অগ্রসর হইয়া স্বামীজির পাদবন্দনা করিলেন এবং নিজের ছয়ঘোড়ার গাড়িতে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া খেতড়িতে উপনীত হইলেন। খেতড়ি-রাজ্যে তখন মহা ধুমধাম ও মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে। মহারাজ অল্প দিন পূর্ব্বে ইউরোপভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে প্রজাগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিয়াছে। তাহার উপর আবার স্বামীজির আগমন। কাজেই তাহাদের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। চতুর্দ্দিকে ভোজ, আতসবাজী, দীপসজ্জা প্রভৃতি সমারোহের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। সাধারণের পক্ষ হইতে মহারাজ ও স্বামীজি উভয়কেই অভিনন্দন প্রদত্ত হইল। উভয়েই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন। একটি পর্ব্বতচূড়ায় অবস্থিত মনোহর বাংলায় স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

১১ই ডিসেম্বর স্থানীয় স্কুলে স্বামীজি মহারাজের সহিত পারিতোষিক-বিতরণার্থ আহূত হইলেন এবং মহারাজের অনুরোধে স্বহস্তে ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। এখানে বিভিন্ন সমিতি হইতে রাজাজী ও স্বামীজিকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। তদুত্তরে রাজাজী তাঁহাদের সকলকে, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামীজিকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার পূর্ব্বে যেসকল ভাব লইয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল ভাবেরই অধিকতর বিস্তৃতি-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। আরও বলিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে শিক্ষাবিভাগের যথাসাধ্য উন্নতির চেষ্টা হইতেছে; এই বৎসরেই তিনটি

নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আর পুরাতন স্কুলটিরও বেশ উন্নতি হইতেছে। তিনি অঙ্গীকার করিলেন, চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনের জন্য শীঘ্রই চেষ্টা করিবেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর স্বামীজি সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিলেন। রাজাজীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার সহায়তা না পাইলে তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিয়াছেন তাহাও করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তৎপরে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া বলিলেন, প্রাচ্যের শিক্ষা—ত্যাগ, প্রতীচ্যের শিক্ষা—ভোগ, এবং ছাত্রদিগকে প্রতীচ্যের চাক্‌চিক্যে বিহ্বল না হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য আদর্শেরই অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন, শিক্ষার অর্থ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসম্পাদন। সুতরাং শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীর উপর অসীম শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিতে হইবে। মনে করিতে হইবে প্রত্যেক বালক অনন্ত শক্তির আধার, আর সেই শক্তিকে, সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য। আর একটি জিনিসও শিক্ষা দিবার সময় মনে রাখিতে হইবে—সেটি হইতেছে ছাত্রদিগের মধ্যে মৌলিক চিন্তা-প্রবাহ-উদ্রেকের চেষ্টা। বালকেরা যাহাতে নিজে নিজে চিন্তা করিতে শিখে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ও উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ। তিনি বলিলেন, বালককে কেহ শিখায় না। সে নিজেই শিখে, শিক্ষক শুধু তাহাকে সাহায্য করেন মাত্র। যদি এইভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবন-সংগ্রামে নিজেদের সমস্যাপূরণে সমর্থ হইবে। ইত্যাদি।

অভ্যর্থনা-সভার প্রজাগণ পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথানুসারে পাঁচটি বৃহৎ পাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া মহারাজাকে উপহার প্রদান করিয়াছিল। তাহার

অধিকাংশই রাজা শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিতে আদেশ দিলেন। পরে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাগণ প্রত্যেকে স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া দুইটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রণামীস্বরূপ অর্পণ করিলেন। এই কার্য্যে দুই ঘণ্টা সময় লাগিল। খেতড়ি-পরিত্যাগকালে মহারাজ স্বামীজিকে তিন সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিলেন, স্বামীজি তৎক্ষণাৎ তাহা মঠে স্বামী সদানন্দ ও বড় সচ্চিদানন্দের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

২০শে ডিসেম্বর স্বামীজি শিষ্যগণের সহিত যে বাংলায় ছিলেন তাহার হলঘরে 'বেদান্তবাদ' সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টা ধরিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। স্থানীয় সমুদয় ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি এবং কয়েক জন ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজাজী সভাপতি হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এখানে কোন সাঙ্কেতিকলিখনবিৎ না থাকাতে সমগ্র বক্তৃতাটি পাওয়া যায় না। তবে স্বামীজির দুই জন শিষ্য সেই সময়ে যে নোট লইয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। সর্ব্বপ্রথমে তিনি গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার তুলনা করিলেন এবং কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতা ইউরোপে পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং মিশরের নিও-প্লেটোনিষ্ট দিগের সাহায্যে স্পেন, জার্ম্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা দেখাইলেন। পরে বেদ ও বৈদিক গাথাসমূহের আলোচনা করিয়া বিভিন্ন ভাব ও সাধনাবস্থার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, সমস্ত ভাবেরই পশ্চাতে এই এক মহাভাব বর্ত্তমান— 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' অনন্তর তিনি অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতভাবের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "বড় বড় ভাষ্যকারেরাও মূলের বিকৃতার্থ করিয়া থাকেন। বড় দুঃখের বিষয়, এদেশের লোক এখন না হিন্দু, না বেদান্তবাদী, না কিছু। তাহারা কেবল ছুঁৎমার্গের অনুসরণ করে। এ ভাবটাকে দূর করিতে হইবে। যত শীঘ্র দূর হয়, ততই ধর্ম্মের পক্ষে

মঙ্গল। উপনিষদের মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচার কর, জ্ঞানের আলো জ্বালাও, আর সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ রহিত কর।"

বলিতে বলিতে দুর্ব্বলতাবশতঃ স্বামীজি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন; কারণ শরীর সুস্থ না থাকায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ শ্রবণেচ্ছায় উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন এবং বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানই যে সকল ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য এইটি বুঝাইয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি রাজাকেও তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামের জন্য এবং পাশ্চাত্যদেশে সনাতনধর্ম্ম-বিস্তারের সহায়তাকরণের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। খেতড়িবাসিগণ এই বক্তৃতায় অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

খেতড়িতে স্বামীজি যে কয়দিন ছিলেন কতকটা বিশ্রাম ও আমোদে কাটাইলেন। সাধারণের কার্য্যে যোগদান ও একটু আধটু বক্তৃতা করিতে হইলেও মোটের উপর অধিকাংশ কাল বন্ধুদিগের সহিত আলাপ, প্রাকৃতিক শোভাসন্দর্শন ও অশ্বারোহণাদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজাজী অনুগত শিষ্যের ন্যায় প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একদিন তাঁহারা উভয়ে অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে স্বামীজি সহসা দেখিলেন রাজার হস্ত হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হইতেছে। একটি কণ্টকময় বৃক্ষশাখা স্বামীজির গমনপথ রোধ করাতে রাজা তাহা স্বহস্তে ধারণ করিয়া একপার্শ্বে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই এবম্প্রকার রক্তপাত হইতেছিল। স্বামীজি রাজাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলে তিনি সহাস্যে বলিলেন, "স্বামীজি, ধর্ম্মের রক্ষাই কি আমাদের চিরদিনকার কর্ত্তব্য নহে?"

খেতড়ি হইতে স্বামীজি পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাজীও জয়পুর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন। সেখানে তাঁহার

সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবালয়ে স্বামীজির এক বক্তৃতা হইল। তাহাতে প্রায় পাঁচশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এখান হইতে স্বামীজি ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল ব্যতীত সমুদয় শিষ্যকে বেলুড় মঠে পাঠাইয়া দিয়া কিষেণগড়, আজমীর, যোধপুর, ইন্দোর, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যোধপুরে তিনি প্রায় দশ দিবস প্রধান অমাত্য রাজা স্যার প্রতাপ-সিংহের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক স্থানেই ষ্টেশনে বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোরের অন্তর্গত খাণ্ডোয়ায় উপস্থিত হইয়া যখন তিনি পূর্ব্বপরিচিত উকীল হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার প্রবল জ্বর। আট-দশ দিনের মধ্যে হরিদাস বাবুর চেষ্টায় জ্বরের উপশম হইলে তিনি পুনরায় যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বদিবস হরিদাস বাবু স্বামীজির চরণ ধারণপূর্ব্বক দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু স্বামীজি বলিলেন, "আমি চেলার দল বাড়াইতে বা গুরুগিরি করিতে চাহি না। যাহারা গুরুগিরি-অভিমান করে তাহাদের দ্বারা দেশের বা নিজের কোন শুভ সাধিত হয় না। তবে এই সোজা সত্য কথাটি মনে রেখো যে, মানুষে যাহা করিয়াছে তাহা সাধন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সর্ব্বশক্তিমত্তার বীজ বর্ত্তমান।" অবশ্য কেন যে তিনি হরিদাস বাবুর ন্যায় সহৃদয় ভক্তের আশা পূরণ করেন তাই তাহা এক্ষণে অনুমান করিতে পারা যায় না। তবে নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় কারণ ছিল। অবশ্য তিনি যে একেবারেই শিষ্যগ্রহণের বিরোধী ছিলেন তাহা নহে, কারণ ইহার পূর্ব্বে এবং পরেও অনেককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তবে বলিবামাত্রই ঐরূপ করিতেন না, প্রত্যেকের রীতি প্রকৃতি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে যেমন পাত্র ও যেরূপ দীক্ষার উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ

দীক্ষা দিতেন এবং সেই আদর্শানুযায়ী জীবন গঠিত করিতে উপদেশ দিতেন। এইরূপে কাহারও নিকট ভক্তির, কাহারও নিকট বা জ্ঞানের আদর্শ প্রধান বলিয়া বর্ণনা করিতেন, কিন্তু সকলকেই বলিয়া দিতেন, 'আত্ম-নির্ভর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সাধন আর নাই।' পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় ভ্রমণকালে তিনি শিষ্য ও সঙ্গীদিগকে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান হইতে এবং আমিষাহার বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "অবিরত বার বছর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধপুরুষ হওয়া যায়।"

খাণ্ডোয়া ত্যাগ করিয়া তিনি রাটলাম জংশন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন কিন্তু অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে, প্রত্যহ রাশি রাশি টেলিগ্রাম ও নিমন্ত্রণ-লিপি আসা সত্ত্বেও গুজরাট, বরোদা ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য স্থানে প্রচারকার্য্যে গমনের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা স্থির করিলেন। পথে জব্বলপুর ষ্টেশনে অনেক লোক তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি আর কোথাও নামিলেন না, বরাবর কলিকাতায় গেলেন।

পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানায় স্বামীজি যেসকল শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সেই সময়কার প্রত্যেক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত করিলাম:

(১) আন্তর্জ্জাতিক বিবাহপ্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদসাধন।

(২) একাধিক বিবাহনিবারণ। তিনি বলিতেন ভিক্ষুকও বিবাহ করিয়া দেশে আরও দশটি ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াইতে ব্যগ্র। এখন অবিবাহিতের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

(৩) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যাপসারণ, জনসাধারণের মধ্যে

শিক্ষাবিস্তার এবং দার্শনিক কূট তর্কের পূর্ব্বে আহারের সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন।

(৪) সুবিবেচনা সহকারে সংস্কৃতবিদ্যার বিস্তার। ইহা দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতিসমূহের সংস্কার মাজ্জিত হইবে। তবে তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা তাঁহাদের নিন্দা গ্লানি প্রচার করিতে নিষেধ করিতেন; কারণ তাঁহারাই এই বিদ্যাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এক্ষণে ভারতের কুত্রাপি সংস্কৃতবিদ্যার অস্তিত্ব থাকিত না।

(৫) যে উপায়ে দেশে দৃঢ়বুদ্ধি ও উচ্চচিন্তাশীল ব্যক্তির সৃষ্টি হইতে পারে সেই উপায়ের প্রবর্ত্তন ও নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন; বলিতেন, 'আমরা এমন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিব যেখান থেকে মানুষ বেরুবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকেরা একত্রে অবস্থান করিয়া আদর্শ জীবন গঠন করিবে।'

(৬) এমন ভাবে লোকচরিত্রের উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে যেন তাহারা ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র সকলের বিশ্বাসভাজন হইতে পারে।

(৭) মতদ্বৈধ সত্ত্বেও সকলের মধ্যে মৈত্রী ও একতা স্থাপন করা আবশ্যক, যেন দেশের সমগ্র শক্তি এক স্থানে সংহত হয়।

(৮) পাশ্চাত্ত্যদেশে হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন প্রচার এবং তদ্বিনিময়ে ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবককে তত্তদ্দেশে প্রেরণ।

দেশের উন্নতি ও ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার-কামনায় স্বামীজি ভারতের জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া যেসকল বক্তৃতা, উপদেশ বা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এইখানেই তাহা পরিসমাপ্ত হইল। অতঃপর তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। জীর্ণ দেহ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া তিনি যে আর অধিক পরিশ্রম করিতে পারিবেন এরূপ আশা রহিল না। তিনি নিজেও তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য এখন প্রাণপণ চেষ্টায়

ভবিষ্যতের কর্ম্মিবৃন্দকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাদের উপর তাঁহার আরব্ধ কার্য্যভার পতিত হইবে তাহাদিগকে আপন আদর্শে গঠিত করিতে লাগিলেন। অবশ্য ভারতকে তিনি যে ভাব দিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক দিন কাটিয়া যাইবে। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে, এমন স্বার্থলেশশূন্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেশনায়কের নেতৃত্ব অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না—ক্ষণপ্রভার ন্যায় আপন প্রভায় দশ দিক উজ্জ্বল করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই তাহা অনন্তে মিশিয়া গেল।

নীলাম্বর বাবুর বাগানে

১৮৯৮ সালের জানুয়ারীর মধ্যভাগে স্বামীজি খাণ্ডোয়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। জানুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। ৩০শে মার্চ্চ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং গমন ও ৩রা মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১১ই মে কয়েকজন গুরুভ্রাতা এবং এদেশীয় ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আলমোড়া-যাত্রা। তথায় ১০ই জুন পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া কাশ্মীরভ্রমণে গমন। কাশ্মীরে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত থাকিয়া ১৮ই অক্টোবর কলিকাতায় পুনরাগমন। এই সময়ে মঠ আলমবাজার হইতে বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যানবাটীতে উঠিয়া যায়।

কলিকাতায় অবস্থানকালে পূর্ব্ববৎ সকলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয়, ধ্যান-ধারণা, অধ্যয়ন, সঙ্কীর্ত্তন ও গল্প-উপদেশাদির দ্বারা স্বামীজি স্বীয় ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্ল পূর্ণিমা তিথিতে তিনি রামকৃষ্ণপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষের নবনির্ম্মিত বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহূত হন।* সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামীজি মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজির পরিধানে

* শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, নবগোপাল বাবুর বাটীতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা ১৮৯৮ সালে নহে, ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে ('স্বামিশিষ্যসংবাদ'—পূর্ব্বভাগ, চতুর্থ বল্লী)।

গেরুয়া রঙের বহির্ব্বাস, মাথায় পাগড়ী, খালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে যাইবেন, সেই পথের দুইধারে অগণ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামীজি "দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীরঘরে" গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন। আর দুই-তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।...লোকে মনে করিয়াছিল—স্বামীজি কত সাজসজ্জা ও আড়ম্বরে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যখন দেখিল তিনি অন্যান্য মঠধারী সাধুগণের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে মৃদঙ্গ ঘাড়ে করিয়া পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন গাহিয়া চলিয়াছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারিল না এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিল 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ,' তখন তাঁহার অমানব দীনতা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া সহস্রমুখে তাঁহার সাধুবাদ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

ক্রমে দলটি নবগোপাল বাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্য হইতে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজি মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানার ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত—মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোসিলেনের প্রতিমূর্ত্তি; হিন্দুর ঠাকুরপূজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন অঙ্গের ত্রুটি নাই। স্বামীজি দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপাল বাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজিকে

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজির মুখে সকল বিষয়ে সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমাদের সাধ্য কি যে, ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ—আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন।"

স্বামীজি তদুত্তরে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমাদের ঠাকুর ত এমন মারবেল পাথর মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেন নি। সেই পাড়াগেঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম। যেন তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন ত আর কোথায় থাকবেন?" সকলেই স্বামীজির কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূষিতাঙ্গ স্বামীজি সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পূজকের আসনে বসিয়া ঠাকুরকে আবাহন করিতে লাগিলেন।

স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামীজির কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতে লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই উহা সম্পাদন করিলেন।

নীরাজনান্তে স্বামীজি পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণতিমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়াছিলেন—

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া পূজা সম্পন্ন করা হইল।

এই বৎসরের প্রারম্ভেই বেলুড়ে গঙ্গাতীরে বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে প্রায় ৪৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। উহার উপর কতকটা ইমারতও ছিল।

মিস্ হেন্‌রিয়েটা মূলার নাম্নী স্বামীজির এক ভক্ত ইহার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজি একদিন গঙ্গার অপর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন, "যেন মনে হচ্ছে, নদীর আর পারে কাছাকাছি কোথাও আমাদের স্থায়ী মঠ হবে।" এতদিন পরে এই কথা সার্থক হইতে চলিল। কিন্তু যদিও ১৮৯৮ সালে জমি খরিদ হয়, তথাপি ১৮৯৯ সালের জানুয়ারীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এস্থানে নৌকা বাঁধা হইত বলিয়া চতুর্দ্দিকের ভূমি খালবিলে পরিপূর্ণ ও অসমান ছিল; আর পুরাতন গৃহাদির সংস্কার, তদুপরি দ্বিতল নির্ম্মাণ ও ঠাকুরঘর করিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। স্বামীজি লণ্ডন হইতে যে অর্থ আনিয়াছিলেন তদ্দ্বারা এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইল; ইহার কিছু পরে স্বামীজি মিসেস্ ওলি বুলের নিকট হইতে মন্দিরনির্ম্মাণ ও মঠের সাধুদিগের সেবার জন্য বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এতদর্থে যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ এক লক্ষেরও অধিক।

শিবরাত্রির পূর্ব্বে নীলাম্বর বাবুর বাগানের মঠ সন্ন্যাসিগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী সারদানন্দ সবে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী শিবানন্দ সিংহলে বেদান্ত প্রচার করিয়া ফিরিয়াছেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষের কার্য্য শেষ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চারি দিবস পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-পূজার দিন সমাগত হইল। জন্মতিথিপূজায় সেইবার বিপুল আয়োজন। স্বামীজির আদেশমত ঠাকুরঘর পরিপাটি দ্রব্যসম্ভাবে পরিপূর্ণ। স্বামীজি স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত, এই উপলক্ষে স্বামীজি শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা অনেকগুলি যজ্ঞসূত্র আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া তিনি শরৎ বাবুকে বলিলেন, "এত পৈতার যোগাড় কেন জানিস?

আজ ঠাকুরের জন্মদিন। যে সব ভক্ত আজ এখানে আসবে তাদের সকলকেই আজ পৈতে পরিয়ে দিতে হবে। দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। এরা সব ব্রাত্য অর্থাৎ পতিতসংস্কার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই আবার উপনয়নসংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। সুতরাং আজই উপবীত গ্রহণ করবার প্রকৃষ্ট দিন।" এই বলিয়া তিনি শরৎ বাবুকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য দ্বিজাতিকে যেরূপ গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া আবশ্যক তাহা শিখাইয়া দিলেন এবং তাহাদের সকলকে পৈতা পরাইয়া দিতে আদেশ দিলেন—বলিলেন, "কালে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের ত কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। শত শত বৎসর ধরে 'ছুঁয়োনা' 'ছুঁয়োনা' বলে আমরাই এদের এত হীন করে ফেলেছি ও দেশটাকে এমন অধঃপাতে এনে দাঁড় করিয়েছি। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে—তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।"

এই উপলক্ষে প্রায় ৫০ জন ভক্ত গঙ্গাস্নান, গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন। আজকালকার মত তখন পৈতাগ্রহণের আন্দোলন ততটা প্রবল হয় নাই; সুতরাং এই কার্য্যের জন্য স্বামীজি ও উপর্যুক্ত ভক্তগণকে সাধারণের নিকট হইতে অনেক বিদ্রূপ ও উপহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের কাহারও সৎসাহসের অভাব ছিল না। স্বামীজির কথা ত ছাড়িয়াই দেওয়া যাউক, কারণ তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না; বলিতেন, 'ব্রাহ্মণত্ব জাতি বা জন্মগত নহে, গুণগত।' পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন বটে,

কিন্তু ধ্বংসনীতির প্রশ্রয় দিতেন না। শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মানুসারে সৎ-প্রথাসমূহের প্রবর্ত্তন ও গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় কালধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে উপায়ে ধর্ম্মরক্ষা এবং সমাজের ও দেশের হিত হয় তাহাই নিজে করিতেন এবং অপরকে করিতে উৎসাহ দিতেন, তাহাতে নিন্দা বা লোকমতকে ভয় করিতেন না। সেই জন্য প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্যে যাহা কিছু ভাল সেগুলিকে তিনি কঠোরভাবে পালন করিতে উপদেশ দিতেন এবং সেইজন্যই শিবরাত্রির দিন মঠের কেহ উপবাস করে নাই দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।

উপনয়ন-কার্য্য সমাপ্ত হইলে স্বামীজির আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং মঠের সন্ন্যাসিগণ স্বামীজির মস্তকে আগুল্‌ফলম্বিত জটাজূট, কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, হস্তে রুদ্রাক্ষবলয় ও ত্রিশূল প্রদান করিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন ও কণ্ঠদেশ ত্রিবলীকৃত বড় বড় রুদ্রাক্ষমাল্যে বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে পিনাকপাণি শঙ্করের সাজে সজ্জিত করিলেন। পরে নিজেরাও ভস্মভূষিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। শরৎ বাবু বলেন, "ঐ সকল পরিয়া স্বামীজির রূপের যে শোভা সম্পাদিত হইল, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে। সেদিন যে যে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—সাক্ষাৎ বালভৈরব স্বামি-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" স্বামীজি পশ্চিমাস্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে তানপুরায় হাত রাখিয়া "কূজন্তং রামরামেতি" স্তবটি মধুর স্বরে গাহিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' উচ্চারণ করিতে করিতে আবিষ্টচিত্ত হইতে লাগিলেন। শরৎ বাবু বলেন, "অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা বিগলিত হইতে লাগিল। স্বামীজির অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র, হস্তে তানপুরার সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধাধিক ঘণ্টা

কাটিয়া গেল। তখন কাহারও মুখে অন্য কোন কথা নাই। কণ্ঠনিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা! শিষ্য ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আজ স্বামীজি শিবভাবে মাতোয়ারা হইয়া রামনাম করিতেছেন। স্বামীজির মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন আজ শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র-প্রান্তে যেন প্রভাতসূর্য্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল দেহ টলিয়া পড়িতেছে! সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে, বুঝাইবার নহে, অনুভূতির বিষয়। দর্শকগণ 'চিত্রাপিতারম্ভ ইবাবতস্থে'!"

রামনাম-কীর্ত্তনান্তে স্বামীজি পূর্ব্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন—'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই'। বাদক ভাল ছিল না বলিয়া স্বামীজির যেন রসভঙ্গ হইতে লাগিল। অনন্তর স্বামী সারদানন্দকে গাহিতে অনুমতি করিয়া নিজেই পাখোয়াজ ধরিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রথমতঃ স্বামীজি-রচিত সৃষ্টিবিষয়ক 'এক রূপ অরূপ নাম বরণ' এই গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেসকল গান গাহিতেন বা ভালবাসিতেন তাহারই কয়েকটি গাওয়া হইল। এমন সময়ে স্বামীজি সহসা সকল ভূষণ নিজ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া গিরিশ বাবুর অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশ বাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ-বলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইলেন দেখিয়া ভক্তগণ অবাক্ হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজি বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, ইনি ভৈরবের অবতার। আমাদিগের সহিত ইঁহার কোন প্রভেদ নাই।" গিরিশ বাবু নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে স্বামীজি তাঁহাকে একখানি গেরুয়া কাপড়

পরাইয়া বলিলেন, "জি সি, তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের কথা শোনাবে। তোরা সব স্থির হয়ে বস।" গিরিশ বাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন, "পরম দয়াল ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলবো? তাঁর অনন্ত দয়া, তা না হলে তোমাদের মত আজন্ম কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধাত্মাদের সঙ্গে আমার মত পাপিষ্ঠকে তিনি একাসনে বসতে দেন?" কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশ বাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না। অনন্তর স্বামীজি কয়েকটি হিন্দী গান গাহিলেন—'চৈঁইয়া না পাকাড়ো মেরা নরম কহলাইয়া' ইত্যাদি।

ইহার কয়েকদিন পরে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক অনাগারিক ধর্ম্মপাল মিসেস্ ওলি বুলকে দেখিতে মঠে আগমন করিলেন। মিসেস্ বুল তখন সগুক্রীত মঠভূমির একটি জীর্ণ কুটীরে বাস করিতেছিলেন। কয়দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। সেদিনও ভয়ানক দুর্য্যোগ। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে যাত্রা করাই স্থির হইল। পথ অতি বন্ধুর ও কর্দ্দমাক্ত। তাহার উপর আবার মাঝে মাঝে শীতল বায়ু বহিয়া অস্থিপঞ্জর কাঁপাইয়া দিতেছিল। স্বামীজির কিন্তু মহা উল্লাস। তিনি হাস্য-কোলাহল ও ঠাট্টা-তামাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যদের কাহারও পায়ে জুতা ছিল না। ধর্ম্মপাল মহাশয়কেও তিনি জুতা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন! কিন্তু তিনি সে কথায় তত কর্ণপাত করেন নাই, তাহার উপর তাঁহার একটি পদ কিঞ্চিৎ খঞ্জ ছিল। হঠাৎ এক স্থানে পা বসিয়া গেল, আর তুলিতে পারেন না। স্বামীজি দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন এবং নিজ স্কন্ধে তাঁহার হস্ত রক্ষা করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে অবশিষ্ট পথ গমন করিলেন।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া সকলেই পদপ্রক্ষালন করিতে গেলেন। স্বামীজি ধর্ম্মপালকে কলসী লইতে দেখিয়া তাঁহার হাত হইতে কলসী কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি আমার অতিথি। অতিথির সেবায় আমার অধিকার" এই বলিয়া স্বয়ং ধর্ম্মপালের চরণ ধৌত করিতে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্মপাল মহা আপত্তি করিতে লাগিলেন। স্বামীজির শিষ্যেরাও তাঁহাদের উপস্থিতিতে স্বামীজি ঐ কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া আপনারা উহা সম্পাদনে ব্যস্ত হইলেন।

ঘটনাটি সামান্য হইলেও স্বামীজি-চরিত্রের অদ্ভুত নিরভিমানিতার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বটে!

২৯শে মার্চ্চ স্বামীজি স্বামী স্বরূপানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দকে সন্ন্যাসধর্ম্মে এবং ইহার চারি দিবস পূর্ব্বে মিস্ মার্গারেট নোবল্‌কে ব্রহ্মচারিণীব্রতে দীক্ষিত করেন। দীক্ষান্তে মার্গারেটের নাম হইল 'নিবেদিতা'। নিবেদিতার দীক্ষা এদেশের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা, কারণ তাঁহার পূর্ব্বে কোন পাশ্চাত্ত্য রমণীই ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই।

এবার কলিকাতায় আসিয়া স্বামীজি ২১শে মার্চ্চ তারিখে বহুবাজারের বিজ্ঞান পরিষদের একটি অধিবেশন ব্যতীত আর কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেন নাই; তবে ১৮ই মার্চ্চ স্বামী সারদানন্দের এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে 'আমেরিকায় আমাদের উদ্দেশ্য' ও ১১ই মার্চ্চ ষ্টার থিয়েটারে ভগ্নী নিবেদিতার 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' নামক দুইটি বক্তৃতায় সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতার বক্তৃতা সাঙ্গ হইলে স্বামীজি ওলী বুল ও মিস্ মুলারকেও দুই চারি কথা বলিতে আহ্বান করিলেন। মিসেস্ বুল বলিলেন, "ভারতের সাহিত্য পাশ্চাত্ত্যবাসীদিগের নিকট একটা জীবন্ত পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি ঘরোয়া কথার মত হইয়া গিয়াছে।"

মিস্ মূলার দাঁড়াইয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'আমার বন্ধু ও স্বদেশীয়গণ' বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চ করতালি-নিনাদ হইতে লাগিল। তারপর বলিলেন, তিনি এবং স্বামীজির অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ শিষ্যেরা ভারতে আগমন করা অবধি ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতেছেন —শুধু যে আধ্যাত্মিক আলোকের দেশ বলিয়া তাহা নহে, কিন্তু স্বজনের বাসস্থান বলিয়া।...স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তিনি বেশী কিছু উল্লেখ করিতে চাহিলেন না; কেবল বলিলেন, সে দেশের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে তিনি যে বিষম পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিয়াছেন তাহার ফল যে কতদূর গড়াইবে তাহা তিনি স্বয়ং এক্ষণে অনুমান করিতে সক্ষম নহেন—ইত্যাদি।

৩০শে মার্চ্চ স্বামীজি দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পূর্ণমাত্রায় চিকিৎসকগণের মতানুবর্ত্তী হইয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না হইতেই সহসা কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাববার্ত্তা শ্রবণে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ত্বরায় কলিকাতায় আগমন করিয়া রোগিশুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে কলিকাতায় বিষম গোলযোগ। গভর্ণমেণ্টের প্লেগসংক্রান্ত নিয়মাবলী জনসাধারণের প্রাণে মহা আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া পলায়নপর। ৩রা মে মঠে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ দিবসই স্বামীজি বাঙ্গালা ও হিন্দীতে দুটী ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন—রামকৃষ্ণ মিশনের লোকের দ্বারা পীড়িতের সেবা করা হইবে ইহাই তাহার স্থূলমর্ম্ম। একজন গুরুভ্রাতা বলিলেন, "টাকা আসিবে কোথা হইতে?" স্বামীজি ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "কেন? দরকার হইলে নূতন মঠের জমি জায়গা সব বিক্রয় করিব। আমরা ফকির, মুষ্টিভিক্ষা করিয়া গাছতলায় শুইয়া দিন কাটাইতে পারি। যদি জায়গাজমি বিক্রয়

করিলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাইতে পারা যায় তবে কিসের জায়গা আর কিসের জমি?" সৌভাগ্যক্রমে এরূপ উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হইল না। চতুর্দ্দিক হইতে অর্থ সাহায্য আসিতে লাগিল। স্থির হইল একখণ্ড ভূমি খাজনা করিয়া লইয়া গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী রোগীদিগের থাকিবার জন্য পৃথক পৃথক আড্ডা করিয়া এমন ভাবে তাহাদের পরিচর্য্যা করা হইবে যে তাহাতে হিন্দুসমাজের লোকের কোন আপত্তির কারণ হইতে না পারে। স্বামীজির শিষ্যগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক লোকও স্বেচ্ছায় এই সেবাকার্য্যে সাহায্য করিতে চাহিলেন। স্বামীজি তাঁহাদিগকে সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসমূহ প্রচার করিতে এবং স্বহস্তে শহরের গলি ঘুঁজি ও ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিতে উপদেশ দিলেন। এইরূপে বহু রোগী সেবা-শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইল এবং স্বামীজির উপর সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। সকলেই দেখিল, তিনি শুধু শুষ্ক দার্শনিক বিচার লইয়া সময়ক্ষেপ করেন না বা মৌখিক উপদেশ মাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, সেই সকল বিচারসিদ্ধ সত্য ব্যবহারিক জীবনে পরিণত করিয়া থাকেন; মুখে যাহা বলেন, কার্য্যেও ঠিক তাহা পালন করিতে পারেন।

প্লেগের প্রকোপ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে এবং গভর্ণমেণ্টের কঠোর বিধিসমূহ রহিত হইলে স্বামীজি পুনরায় হিমালয় অঞ্চলে ভ্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। সেভিয়ারদম্পতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আলমোড়াতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা স্বামীজিকে সেখানে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। তদনুসারে ১১ই মে স্বামীজি স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, মিসেস্ বুল, মিসেস্ প্যাটারসন (কলিকাতাস্থ আমেরিকান কনসাল জেনারেলের পত্নী), ভগিনী নিবেদিতা এবং মিস্ জোসেফিন ম্যাক্লাউড সমভিব্যাহারে কাঠগোদাম ও নাইনিতাল হইয়া

আলমোড়া যাত্রা করিলেন। মিসেস্ প্যাটারসনই পূর্ব্বে এক সময়ে স্বামীজি বর্ণের জন্য আমেরিকার কোন হোটেলে প্রবেশাধিকার পান নাই শুনিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ ও কুপিত হইয়া তাঁহাকে সযত্নে নিজগৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি স্বামীজিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং এক্ষণে নিজ সমাজের মতামত তুচ্ছ করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণকে শিক্ষাপ্রদান

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে মিসেস্ ওলি বুল ও মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্‌লাউড্ নাম্নী স্বামীজির দুইজন শিষ্যা তাঁহাদিগের আচার্য্যদেবের জন্মস্থান সন্দর্শন ও আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার পূতসঙ্গলাভ করিয়া জীবন ধন্য করিবার মানসে সুদূর আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া বেলুড় মঠে পুরাতন বাটীতে বাস করিতেছিলেন। পাঠক ইতোমধ্যেই স্থানে স্থানে তাঁহাদের নমোল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকিবেন। এই বৎসরই ২৮শে জানুয়ারী মিস্ মার্গারেট নোবল্ তাঁহার সমুদয় ইংলণ্ডীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বামীজির আহ্বানে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারব্রতে জীবন সমর্পণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। স্বামীজি ইঁহাদের সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদিগকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য এখন হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে শিক্ষাবিধানের উদ্যোগ করিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে অবস্থানকালে স্বামীজি প্রত্যহ মঠভূমির উপরিস্থিত নদীতীরবর্ত্তী কুটীরে ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহার পদার্পণে সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানি এই সকল ভক্তিমতী রমণীর নিকট যেন তীর্থের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিত। তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তিতে তাঁহারা আপনাদিগকে অপরিসীম সৌভাগ্যের অধিকারিণী বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে তাঁহাদের জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত ধন্য বিশুদ্ধ ও মধুময় জ্ঞান হইল। সেইখানে বৃক্ষসমূহের ছায়াশীতল পাদমূলে বসিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট অজস্র বচনধারায় ভারতবর্ষের গভীরতম তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিতেন। ভারতের আচার, অনুষ্ঠান, ইতিহাস, উপকথা, জাতি, জাতীয় ভাব, রীতিনীতি সকলই আলোচিত হইত। তিনি

এমন অপূর্ব্ব ভাষায় নিপুণ কবি ও নাট্যকারের ন্যায় ঐ সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিতেন যে, মনে হইত যেন ভারতের প্রসঙ্গ একখানি পুরাণ— সকল পুরাণের শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম এবং যেরূপেই উহার আরম্ভ হউক না কেন, উপসংহারে উহা সসীম বস্তুতন্ত্র ছাড়িয়া অসীমের প্রান্তে উপনীত হইত। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীও নূতন ধরণের ছিল। ভারতবর্ষের অনেক কথা তিনি মুখে উল্লেখ করিতেন না বটে, কিন্তু শ্রোতৃবর্গের কল্পনাসাহায্যে যাহাতে সেই অব্যক্ত অংশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাঁহার বর্ণনীয় চিত্রের প্রত্যেকটির মধ্যেই এইরূপ শত শত তুলিকাস্পর্শ থাকিত! তাহাদের ভিতর হইতে ভারতবর্ষের প্রতি একটি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব তাঁহার প্রতি কথায় স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। কখনও কাব্যের দুই-এক পদ, কখনও বা পুরাণের অস্ফুট চিত্রে তিনি তাঁহাদিগের মনে হিন্দুর অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের সনাতন সত্যটি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন—তাহাতে কখনও হরপার্ব্বতী, কখনও কালীতারা, কখনও বা রাধাকৃষ্ণের স্থান থাকিত। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসবশতঃ তিনি সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি যেকোন বিষয়ের অবতারণা করিতেন (কারণ তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই তুচ্ছ, হীন বা অশ্রদ্ধেয় ছিল না), তাহার ভিতর হইতেই আপন অদ্বৈত অনুভূতির সাহায্যে এমন সকল মীমাংসায় উপস্থিত হইতেন যে তদ্দারা তাঁহার শ্রোতারা চরম সত্যের আভাস পাইতেন। সে দৃশ্য দেখিলে মনে হইত যেন আবার প্রাচীন যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে, যেন ব্রহ্মার মানসপুত্রের ন্যায় নির্ম্মলসংস্কার এক অমানব পুরুষ ভারতের ভাগ্যবিধাতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইহার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিবার ইচ্ছায় কতিপয় নির্ব্বাচিত শিষ্যের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে আপন মর্ম্মবাণী ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি পাশ্চাত্য শিষ্যদের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা নির্ম্মমভাবে চূর্ণ করিতে

কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না, অথচ হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে যেসকল বৈষম্য, বিভ্রাট বা আবর্জ্জনা হিন্দুজীবনকে বিষাক্ত ও পর্য্যুষিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারও কঠোর সমালোচনা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার বন্ধনকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন, সে বন্ধনের আকার যেরূপই হউক না কেন। পায়ের শৃঙ্খল ফুল দিয়া ঢাকিলেও শৃঙ্খল ত বটে! দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় তিনি চাহিতেন ধর্ম্মের রাজ্য সকলেরই নিকট সুগম হউক। ইউরোপীয়দিগের মনে হিন্দুধর্ম্মের যে অংশ দুর্ব্বোধ্য বা অসহনীয় বোধ হইত, তিনি সে অংশ তাহাদিগের মুখরোচক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন না, বরং সূক্ষ্ম বিচার ও উদাহরণ দ্বারা সেই সকলের নিগূঢ় ভাব তাহাদের মনে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেন। যে বিষয়টি পাশ্চাত্ত্য ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতগামী, তিনি সর্ব্বাগ্রে সেইটারই যুক্তিযুক্ততা দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। স্বভাবতঃ হিন্দুর ধর্ম্মাদর্শ, উপাসনাপদ্ধতি এবং জীবনের গতি ও তৎসম্বন্ধীয় বিশ্বাস প্রভৃতি শিষ্যদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য মনে হইত, সুতরাং স্বামীজি ঐগুলি যথাসাধ্য পরিষ্কার করিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতেন, তাহাতে কখনও অধীরতা বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ, কিংবা অপ্রাসঙ্গিক ও অকিঞ্চিৎকর মন্তব্যের প্রতি অবহেলা বা ঔদাসীন্য প্রাদর্শন করিতেন না বা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতেন না। পাশ্চাত্ত্যের ভাব প্রাচ্যের ভাব হইতে এতই বিভিন্ন, একের জন্মকর্ম্ম, শিক্ষাদীক্ষা, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অপরের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কার হইতে এতই বিপরীত যে, তিনি প্রত্যেক সামান্য কথাও বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তাঁহার চেষ্টায় প্রাচ্য মনের সহিত পাশ্চাত্ত্য মনের মিলন হইয়াছিল এবং ঐ দেশের শিষ্যেরা এদেশের সতীর্থগণের সহিত অতি সুমধুর

ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই ভ্রাতৃত্বের ভাব সুদৃঢ় করিবার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে এমন আচারের অনুষ্ঠান করিতে হইত যাহা পরম্পরাগত হিন্দু ভাব হইতে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্যযুক্ত। তিনি অনেক সময়ে বহু ব্যক্তির সম্মুখে পাশ্চাত্য শিষ্যদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, পানাহারের সময় অগ্রে তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন, অনেক সময় তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগকে সেইরূপ করিতে উৎসাহ দিতেন। এইরূপে তিনি তাহাদিগের মনে যে সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতার ভাব বহু কাল ধরিয়া দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল, সমূলে তাহার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল সকল শিষ্যকে এক উদার ভ্রাতৃভাবে একীভূত করিবেন। প্রকৃতই তিনি এইরূপে জগতের দুই বিভিন্ন প্রান্ত ও বিভিন্নভাবাভিমুখী মনুষ্যজাতিকে মিলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিষ্যদিগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা কখনও তিনি সঙ্গত মনে করিতেন না। তিনি তাহাদিগকে নিজে নিজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে এবং প্রতিপদে দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিতে, ভুল করিতে ও নিজেদেরই তাহা সংশোধন করিতে উপদেশ দিতেন।

এই সকল পাশ্চাত্য শিষ্যের মন প্রাচ্য ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিবার একটা বিশেষ হেতু ছিল। এ কার্য্যের দায়িত্ব কতদূর গুরুতর স্বামিজী তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, উহাদের দ্বারা এদেশে কোন কার্য্য সম্পাদন করাইতে হইলে এ দেশের প্রতি উহাদের আস্থা ও মমত্ববুদ্ধি জন্মান আবশ্যক। নতুবা উহাদিগের পক্ষে এদেশে কার্য্য করা সম্ভব হইবে না। আর এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি উহাদের আকর্ষণ একটা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস বা অসার ভাবুকতা মাত্র কি না। এখনকার এই অনল-পরীক্ষায় যিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, বুঝা যাইবে তিনিই প্রকৃত

বেদান্তরসজ্ঞ বটে, এবং তাঁহারই শেষ পর্য্যন্ত টি'কিয়া থাকিবার সম্ভাবনা; কারণ দূর হইতে অদ্বৈততত্ত্বের মাহাত্ম্য যতই গৌরবময় ও তাহার জন্য প্রাণ-সমর্পণের ইচ্ছা যতই লোভনীয় হউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দেশের লোকের সংস্পর্শে আসিয়া ও শত সহস্র বাধা, বিঘ্ন, অসুবিধার পরিচয় লাভ করিয়া সেই আদর্শের জন্য প্রাণপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প থাকা বড় সামান্য কথা নহে। স্বামীজি বুঝিয়াছিলেন যে, আদর্শের মহিমা সম্যক্ প্রণিধান করিয়া তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চারিত হওয়া ব্যতিরেকে কিছুতেই বর্ত্তমান মনোভাব স্থায়ী হইবে না। সেইজন্য তিনি এই সকল শিষ্যের অতীত সংস্কাররাশি যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহার স্থানে ভারতীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিলেন। তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে ইউরোপীয়কে যদি ভারতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভারতীয়ভাবে চলিতে হইবে, এমন কি আহার-বিহার, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা প্রত্যেক বিষয়েই হিন্দুভাবাপন্ন হইতে হইবে। ইহার উপর আবার যিনি হিন্দু রমণীর শিক্ষাভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে, কেবল তাঁহার কার্য্য-পরম্পরা ক্ষুদ্র পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া সমগ্র জাতি বা দেশের প্রতি ব্যাপ্ত হইবে। নিবেদিতাকে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, "তোমার এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে। তোমার জীবনকে এখন ভিতরে বাহিরে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। যদি তোমার খুব প্রবল আগ্রহ থাকে তবে উপায় ঠিক জুটিয়া যাইবেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলিতে হইবে—এমন কি তার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত রাখিতে পারিবে না।" বাস্তবিক ভারতীয় সমস্যাগুলি ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে যে এইরূপ

মহতী সাধনারই প্রয়োজন কে তাহা অস্বীকার করিবেন? স্বামীজি বারংবার বলিতেন, এখানকার যে ভাব বা সংস্কারটা হীন বলিয়া মনে হইবে তাহার প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। বলিতেন, যাহার যেখানে আস্থা আছে, সেই দিক দিয়াই তাহার ভাব ধরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণের পক্ষে ভারতীয় প্রথায় আহার বা ভারতীয় রীতিনীতিপালনের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। কিন্তু স্বামীজি তাহা বুঝিতেন এবং সেইজন্য সর্ব্বদাই ঐ সকল বিষয়ের একটা মীমাংসা দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেন। যতই বিসদৃশ ভুল ভ্রান্তি হউক না কেন, ভিতরকার ভাবটা দেখিয়া বাহিরের কাজের একটা সামঞ্জস্য করিয়া দিতেন।

স্বামীজির নিকট ভারতীয় ভাব বা সভ্যতার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার জো ছিল না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বড়াই করিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে করুণার চক্ষে দেখা বা কতকগুলি বাজে তর্ক তুলিয়া তাহাকে খাট করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টার লক্ষণ দেখিলেই তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিতেন, বলিতেন—ভারতকে বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব সংস্কারগুলি একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। যদি কেহ বলিত ভারতীয় জাতি জরাগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে তিনি নানা উদাহরণ দ্বারা দেখাইতেন জাতিটা প্রাচীন হইলেও যুবার ন্যায় সবল ও সতেজ আছে; তাহার প্রমাণ এই, এ দেশের সমাজ যত শীঘ্র বিদেশের সভ্যতাকে আপন শরীরের অংশবিশেষে পরিণত করিয়া লয়, অপর কোন সমাজ তাহা পারে না। ভারতবাসীর ক্ষিপ্রগতিতে ইংরেজী ভাষায় অধিকারলাভ ও অসম্ভব তৎপরতার সহিত বর্ত্তমানযুগোপযোগী সকল বিষয় শিক্ষা করিবার ক্ষমতাই এই জাতির যুবত্বের লক্ষণ। তিনি তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণকে প্রত্যেক ভারতীয় প্রথার উৎপত্তির কারণ কি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। ইহার

ফলে তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিলেন যদিও ভারতবর্ষ দরিদ্র বটে, তথাপি ইহা অতি নির্ম্মল ও পবিত্র; বুঝিলেন যে দেশে ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, সে দেশে দরিদ্রতা পাশ্চাত্ত্যদেশের ন্যায় সর্ব্ববিধ পাপের আকর নহে, বরং সকলেরই আদরণীয়; বুঝিলেন যে দেশে নিত্য স্নান ও নিত্য গৃহদ্বার ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির পরিষ্করণ ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য, সে দেশে বাহ্যশৌচাচার কেন এত বরণীয়। তাঁহারা যখন ভারতীয় জীবনকে তাঁহার চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন তখন ইহার অদ্ভুত মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও মধুর সরলতা বিচিত্রবর্ণসম্পদযুক্ত ছায়ালোকচিত্রের ন্যায় মনোরম বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। রক্তরশ্মি-বিকিরণকারী বালসূর্য্যের দিকে বদ্ধদৃষ্টি, আকটি গঙ্গাবারিতে নিমজ্জিত কৃতাঞ্জলিপুট শতসহস্র নরনারী, মার্জ্জন-সমুজ্জ্বল ভৃঙ্গারহস্তে প্রত্যাবৃত্ত শুচি-স্বরূপিণী কুলরমণীগণ, গোবিন্দনামভজনরত পথের বৈষ্ণব ভিখারী এবং আপাদমূর্দ্ধভস্মাবৃতদেহ নাগা সন্ন্যাসী সবই যেন তাঁহাদিগের চক্ষে চির নূতন ও চিরমাধুর্য্যে অভিষিক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বামীজির শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহারা ক্রমশঃ এই সকলের পশ্চাতে যে নিগূঢ় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবসকল নিহিত ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন।

বাস্তবিক ভারতবর্ষে আগমনের পর হইতে এই সকল বিদেশীয় শিষ্যগণের নিকট স্বামীজি নিজেও একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ পাশ্চাত্ত্যে তাঁহারা তাঁহাকে শুধু ধর্ম্মাচার্য্যরূপেই দেখিয়াছিলেন, ভারতের উন্নতিকামী কর্মিরূপে দেখেন নাই। সেখানে তিনি শুধু জড়-জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিতে, ভোগান্ধ মানবের চক্ষু খুলিয়া দিতে, মানবত্বের মধ্য হইতে দেবত্ব-উপলব্ধির উপায় নির্দ্দেশ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে তাঁহারা এই সমস্ত ব্যাপারের অন্তরালে নিহিত আর একটি

অপ্রত্যাশিত বস্তু দেখিতে পাইলেন—সেটি হইতেছে তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম এবং তজ্জনিত বিষম মর্ম্মযাতনা। ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষাবিধান ও দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্য এক দিকে যেমন তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের বিশ্লেষণ করিতে কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না, অপর দিকে তেমনি ইতিহাস, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও অপর সহস্র স্থল হইতে ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া কেবল ভারতীয় আদর্শসমূহকেই বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। এমন কি বলিতেন, ভারতীয় চিত্রকলার রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে শ্রীহীন মাটির পুতুলকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে, কারণ উহার মধ্যেও আধ্যাত্মিক আদর্শটাই আর একভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে মাত্র। ইহা ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনা, তাহাদের সুবিধা-অসুবিধা-প্রদর্শন ও জগতের ইতিহাসের উপর হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা, পরস্পরের সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ দ্বারা প্রাচ্যের গৌরব কোন্ স্থানে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

সমুদয় ১৮৯৮ সালটা এইরূপ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার ফলে এই আদর্শবিনিময়-কার্য্য এরূপ সুসম্পন্ন হইয়াছিল যে, এই সকল শিষ্যেরা আর কখনও আপনাদিগকে বিদেশীয় বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। ভারতই যেন তাঁহাদের জননী ও ধাত্রী, ভারতের সহিত যেন তাঁহাদের চিরদিনকার শোণিতসম্পর্ক, এইরূপ ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের একজন একবার স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামীজি, কিরূপে আপনাকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিতে পারি?' তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভারতকে ভালবাস।' এই ভারতকে ভালবাসাটাই ক্রমে সকলের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

নাইনিতালে

১৮৯৮ সালের ১৩ই মে স্বামীজি শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে নাইনিতালে উপনীত হইলেন। সমুদয় পথটা ভারতবর্ষসংক্রান্ত বহু শিক্ষাপ্রদ সামাজিক ও ঐতিহাসিক আলোচনায় সুখে অতিবাহিত হইল। এই ভ্রমণ ও তদানুষঙ্গিক শিক্ষাপ্রদানের বিস্তৃত ইতিহাস তাঁহার ধর্ম্মকন্যা নিবেদিতা কর্তৃক অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহার কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম—

"মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত আমরা কি অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়াই না ভ্রমণ করিয়াছি! আর যেমন আমরা একটির পর একটি করিয়া নূতন স্থানে আসিতে লাগিলাম, কি অনুরাগ ও উৎসাহের সহিতই না স্বামীজি আমাদিগকে তত্রত্য প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুটির সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন! ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্য লোকদের অজ্ঞতা এত বেশী যে উহাকে প্রায় নিরেট মূর্খতা বলা চলে—অবশ্য যাঁহারা এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কতক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা প্রাচীন পাটলীপুত্র বা পাটনা হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। রেলযোগে পূর্ব্বদিক হইতে কাশীতে প্রবেশ করিবার মুখে উহার ঘাটগুলির যে দৃশ্য চক্ষে পড়ে, তাহা জগতের দর্শনীয় দৃশ্যগুলির অন্যতম। স্বামীজি সাগ্রহে উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটলীপুত্র ও বারাণসীর অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলেন না। তার পর যখন আমরা লক্ষ্ণৌএ পৌঁছিলাম তখন এখানে যেসকল শিল্পদ্রব্য ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত হয়, তিনি তাহাদিগের নাম ও গুণ

বর্ণনা করিয়া লক্ষ্ণৌ-এর নবাবদিগের অধুনাবিলুপ্ত কীর্ত্তিকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন। কিন্তু যেসকল মহানগরীর সৌন্দর্য্য সর্ব্ববাদিসম্মত ও যাহারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, শুধু যে সেইগুলিকেই তিনি আগ্রহের সহিত আমাদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা নহে, আর্য্যাবর্ত্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তন্ময়তা যেরূপ প্রগাঢ় হইয়া উঠিত, এমন আর বোধ হয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ভাগে জমি চাষের প্রণালী অথবা কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করিতেন—তাহার আবার কোন খুঁটিনাটিটি বাদ যাইত না—যেমন সকালের জলখাবারের জন্য রাত্রি হইতে যে খিচুড়ী উনানে চড়াইয়া রাখা হয় তাহাও উল্লেখ করিতেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নপ্রান্তে যে আনন্দরেখা ফুটিয়া উঠিত, অথবা কণ্ঠ যে আবেগভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্ব পরিব্রাজকজীবনের স্মৃতিবশতঃ। কারণ আমি সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, দরিদ্র কৃষকগৃহে যেরূপ অতিথিসৎকার হয়, ভারতের কুত্রাপি আর তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্য বটে যে, গৃহস্বামিনী তৃণশয্যা ব্যতীত আর কোন উত্তম শয্যা এবং মাটির দেওয়ালবিশিষ্ট একখানি পরচালা ব্যতীত আর কোন উত্তম আশ্রয় অতিথিকে দিতে পারেন না। কিন্তু তিনিই আবার শেষ মুহূর্ত্তে বাটীর আর সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেও নিজে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে একটি দাঁতন ও এক বাটি দুধ সাবধানে এমন একস্থানে রাখিয়া যান যে, অতিথি প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার সময় যেন উহা দেখিতে পান এবং অন্যত্র গমন করিবার পূর্ব্বে উহা গ্রহণ করিতে পারেন।

"সময়ে সময়ে মনে হইত, যেন স্বদেশের অতীত গৌরববোধই স্বামীজির ষোল আনা মনপ্রাণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক স্থান মাত্রেরই ঐতিহাসিক মূল্যবোধ অতি অসাধারণ ভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইত। এই হেতু যখন আমরা বর্ষার প্রাক্কালে একদিন অপরাহ্ণে গুমোটের মধ্য দিয়া তরাইপ্রদেশ অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সময় তিনি আমাদিগকে যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন যে, এই সেই ভূমি—যথায় ভগবান বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত হইয়াছিল। ভারতের প্রতি গ্রাম, প্রতি বৃক্ষ, এমন কি একটা সামান্য প্রাণী পর্য্যন্ত তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেমের ভাব উদ্দীপিত করিত। বন্য ময়ূরগণ হয়ত রাজপুতানা ও তাহার চারণগণের গীত মনে পড়াইয়া দিত, হস্তী বা উষ্ট্রযূথ-দর্শনে হয়ত প্রাচীন রাজাদিগের প্রসঙ্গ, প্রাচীন যুদ্ধবিগ্রহ ও বাণিজ্যসম্পদের কত কথাই আসিয়া পড়িত!...

"কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তিনি আমাদিগকে হিন্দু পরিবারগুলির বিশেষত্বসূচক দ্বারদেশের উপরিভাগে দোদুল্যমান গাঁদাফুলের মালাগুলি দেখাইয়া দিতেন। আবার ভারতবাসিগণ 'সুন্দর' বলিয়া যাহার আদর করেন, গায়ের সেই 'কষিতকাঞ্চন' বর্ণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেন—ইউরোপীয়দিগের আদর্শস্থল যে ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত, তাহা হইতে উহা কত বিভিন্ন! আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া টঙ্গাযোগে যাইবার সময় তিনি অন্য সব ভুলিয়া অক্লান্তভাবে শিবমাহাত্ম্য-বর্ণনেই মগ্ন হইয়া যাইতেন। মহাদেবের লোকসমাগম হইতে অতি দূরে পর্ব্বতশীর্ষে মৌনভাবে অবস্থিতি, তাঁহার মানবের নিকটে কেবল নিঃসঙ্গত্ব-যাচ্ঞা এবং এক অনন্ত ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকা—এই সকল বিষয় বর্ণিত হইত।..."

মনস্বিনী নিবেদিতা পাশ্চাত্যমনের একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ—সে মনে পাশ্চাত্যভাবসমষ্টি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত এবং প্রত্যেক ভাবটি সুপরিপুষ্ট ও

সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত। সেই মনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য অপনোদন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় ভাবের মুদ্রণ-প্রয়াস স্বামীজির পক্ষে যে কিরূপ কঠিন কার্য্য হইয়াছিল তাহা নিবেদিতার নিজ লিখিত বিবরণেই প্রকাশ। আমরা এখানে আর তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি করিব না। তবে কেমন করিয়া একের অদম্য মানসিক শক্তি ও সংস্কারনিচয় অপরের প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে আপনার স্বাভাবিক জন্মগত ভাব পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাপ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে পরভাব আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল, তাহা ভাবিতে গেলে শিক্ষকের অপূর্ব্ব প্রভাব ও বুদ্ধিকৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিক স্বামীজি যদি আর কিছুই না করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও ভারতবর্ষকে যে নিবেদিতার ন্যায় তাঁহার স্বহস্তগঠিত একটি অপরূপ ফল প্রদান করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন ইহাতেই ভারতের লোক তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাইত। কারণ নিবেদিতাকে শুধু স্বামীজির একটি মাত্র শিষ্যারূপে দেখিলে চলিবে না। এক নিবেদিতা সহস্র শিষ্যের সমান কাজ করিয়া গিয়াছেন। দেবোপম চরিত্র, অদ্ভুত গুরুভক্তি ও তিতিক্ষা, অসাধারণ ধীশক্তি ও কার্য্যকারিতা এবং সর্ব্বোপরি এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী লেখনী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বহু দিকে ব্যক্ত হইয়াছিল। স্বামীজির বাণীর সর্ব্বাপেক্ষা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁহার দ্বারাই শুধু পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের মধ্যে নহে, জগতের সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়াছে ; এমন কি ভারতেও ইহা জাতীয়ভাব-উন্মেষণে কম সাহায্য করে নাই।

নাইনিতালে এই সময়ে খেতড়ির রাজা অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণের সহিত রাজার পরিচয় করাইয়া দিলেন। এইখানে একটি মুসলমান ভদ্রলোক (ইনি মনে মনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন) স্বামীজির দর্শনে ও তাঁহার

আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামীজি, যদি ভবিষ্যতে কেহ কখনও আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করে তাহা হইলে মনে রাখিবেন আপনার এই মুসলমান বান্দাই তাহাদিগের সকলের অগ্রণী হইবে।" তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস স্বামীজির মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। ক্রমে এই ব্যক্তি স্বামীজির একজন বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন এবং মহম্মদানন্দ নাম গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

নাইনিতালে অবস্থানকালে আর একটি ঘটনা হইতে স্বামীজির হৃদয়ের বিশালতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐখানে এক স্থানীয় দেবীমন্দিরে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার শ্বেতাঙ্গ শিষ্যেরা দুইজন দেবদাসীকে অজ্ঞতাবশতঃ ভদ্রমহিলাজ্ঞানে তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কথায় কথায় স্বামীজির পরিচয় পাইয়া উক্ত দেবদাসীদ্বয় গৃহগমনকালে তাঁহাদিগের সহিত স্বামীজিকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সমাগত সকলেই ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না, স্বামীজিকে উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু করুণহৃদয় স্বামীজি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন এবং উক্ত নারীদ্বয়কে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। এমন কি তাহাদিগকে ভৎর্সনা বা একটিও পরুষ বাক্য না বলিয়া স্নেহমধুর কণ্ঠে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিলেন এবং গমনকালে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তপোবল-সম্পন্ন মহাপুরুষের ঈদৃশী কৃপা অবলোকন করিয়া সমাগত সকলেরই হৃদয় দয়ায় পূর্ণ হইল।

নাইনিতালের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাভাজন অধিবাসীর সহিত স্বামীজির বিশেষ আলাপ হইল। একদিন তিনি তাঁহাদিগকে প্রথিতযশা রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার দূরদর্শিতা ও উদার

ভাবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আর ওজস্বিনী ভাষায় সেই মহাশয় লোকশিক্ষকের তিনটি ভাবের প্রতি পুনঃ পুনঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন—(১) তাঁহার বেদান্তপক্ষপাতিত্ব, (২) স্বদেশ-পরায়ণতা এবং (৩) হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমান প্রেম। পাঠক দেখিবেন স্বামীজির নিজ চরিত্রেরও সেই তিনটিই বিশেষত্ব।

ধর্ম্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য জনসাধারণের অজ্ঞতা কিরূপ ভয়ানক তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া স্বামীজি নিম্নলিখিত হাস্যোদ্দীপক গল্পটি বলিয়াছিলেন। এক বিশপ একদিন এক কয়লার খনিতে গিয়াছিলেন। সেখানে কুলিমজুরদের সমক্ষে তিনি একটা বক্তৃতা দিয়া বাইবেল শাস্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি খ্রীষ্টকে জান?' তাহাতে তাঁহার শ্রোতৃবর্গের একজন বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত উত্তর করিল, 'আজ্ঞে, তার নম্বরটা কত?'—হায়, বিড়ম্বনা! সে লোকটি মনে করিয়াছিল বুঝি খৃষ্ট তাহাদিগেরই ন্যায় কোন কুলিমজুর হইবে, আর নম্বর জানিলেই তাহাকে চট করিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এই বলিয়া স্বামীজি গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা এশিয়ার লোকের মত ধর্ম্মপ্রাণ নয়। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের চিন্তাই নাই। একজন ভারতবাসী লণ্ডন বা নিউইয়র্কে গেলে প্রথমেই দেখে সেখানকার দুর্নীতিপরায়ণতা তার কল্পিত নরকের চেয়েও বেশী। এশিয়ার লোক যতই অধঃপতিত হউক, লণ্ডনের হাইডপার্কে দিন দুপুরে যেসব কাণ্ড ঘটে দেখলে তারও মনে ঘৃণা হয়।"

তিনি বলিতেন, "পাশ্চাত্ত্য দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু যে তাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ তা নয়, এদিকেও খুব গোঁয়ার এবং অসভ্য। একদিন আমি আমার এই প্রাচ্য পোশাক পরে লণ্ডনের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় এক কয়লার গাড়ীর গাড়োয়ান আমার পোশাকটা

দেখে একটু বোধ হয় আমোদ বোধ করলে। তারপরেই তার হাতটা এমন সুড়সুড় করতে লাগলো যে তৎক্ষণাৎ সে একটা কয়লার চাঁই আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। ভাগ্যক্রমে সেটা আমার গায়ে না লেগে কাণের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

নাইনিতালে তাঁহার সহিত শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দত্ত নামক এক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়। ইনি পূর্ব্বে মেট্রোপলিটান স্কুলে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। যোগেশ বাবু প্রস্তাব করিলেন, "যদি কতগুলি টাকা তুলিয়া এদেশের গ্র্যাজুয়েটদের বিলাতে পাঠাইয়া সিভিল সার্ভিস পড়াইয়া আনা যায়, তাহাতে কিরূপ ফল হয়? তাহারা দেশে ফিরিয়া দেশের অনেক উপকার করিতে পারে না কি?" স্বামীজি উহাতে কোন উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "ওতে কিছুই হবে না হে। ওতে কেবল ছেলেগুলো সাহেবী ঢং শিখে আসবে আর এদেশে এসে সাহেবঘেঁষা হবে। এটা একেবারে ধ্রুবসত্য বলে জেনে রেখে দাও। তারা শুধু নিজেদের উন্নতির চেষ্টা খুঁজবে আর সাহেবদের মত খাবে, পরবে ও চাল চালবে, দেশের কথা মনেও করবে না।" ঐ দিন দেশের উন্নতিচেষ্টায় এদেশের লোকদের আলস্য ও উৎসাহের অভাব স্মরণ করিয়া তিনি এতদূর মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, সত্যই তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। তাঁহার সেই গলদশ্রুপূর্ণ মুখ দেখিয়া সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। এইদিন যোগেশ বাবুর বন্ধু রামপুর ষ্টেট কলেজের অধ্যক্ষ বাবু ব্রহ্মানন্দ সিং এম. এ. (ইনি পরে লক্ষ্ণৌ কাগজের কলের একজন পরিচালক হইয়াছিলেন) এই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। যোগেশ বাবু লিখিতেছেন—

"জীবনে কখনও সে দৃশ্যটি ভুলিব না। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের কথা তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে জাগরূক ছিল। ভারতই তাঁহার প্রাণ, ভারতই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান,

ভারতের কথাই তিনি ভাবিতেন, ভারতের জন্য তিনি কাঁদিতেন, আর ভারতের জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বক্ষের প্রতি স্পন্দনে, ধমনীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে ভারতের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না।"

আলমোড়ায়

নাইনিতাল হইতে আলমোড়া গমন করিয়া স্বামীজি সেভিয়ার-দম্পতির আবাসে এবং তাঁহার শিষ্যগণ আর একটি বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীমতী আনি বেশান্তের সহিত স্বামীজির দুইবার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে বহুক্ষণব্যাপী সুমিষ্ট আলাপে সময় অতিবাহিত করেন। স্বামীজি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া গুরুভ্রাতৃগণের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তারপর মিসেস্ বুলের বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে প্রাতরাশ সমাপন করতঃ অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতেন। এই গল্প শুধু যে হাস্যকৌতুকপূর্ণ অসার কথোপকথনে পর্য্যবসিত হইত তাহা নহে, নানাবিধ সরস আলোচনার সহিত বহু শিক্ষাপ্রদ উপদেশও থাকিত। আমরা এখানে ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত 'স্বামীজির সহিত হিমালয়ে' নামক পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে স্বামীজিকর্তৃক আলোচিত বিষয়ের বিশালতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

"প্রথম দিন প্রাতঃকালে সভ্যতার কেন্দ্রীয় আদর্শ-সম্বন্ধে কথা উঠিল, অর্থাৎ স্বামীজি দেখাইলেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে সত্যানুরাগ এবং প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে সতীত্ব বিদ্যমান। তিনি হিন্দুদিগের বিবাহ-প্রথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, উহা এই আদর্শের অনুসরণ ও স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা—এই দুই-এর সংযোগে উৎপন্ন এবং পরে পরমাত্মতত্ত্বের সহিত সমগ্র বিষয়টির সম্বন্ধ পর্য্যায়ক্রমে প্রদর্শন করিলেন।

"আর একদিন প্রাতঃকালে কথা পাড়িলেন, যেমন মানবজাতি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাতিরও এক একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে; যেমন হিন্দুদিগের জাতীয়

কার্য্য পৌরোহিত্য বা তত্ত্ববিদ্যাদান, রোমকসাম্রাজ্যের কার্য্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহ, বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির কার্য্য হইতেছে বাণিজ্য, এবং সাধারণতন্ত্রের কার্য্য হইবে ভবিষ্যৎ আমেরিকার। এইটুকু বলিয়াই তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া শূদ্রসম্বন্ধীয় সমস্যা—অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাধীনতা ও একযোগে কর্ম্মানুষ্ঠান—আমেরিকা দ্বারাই সাধিত হইবে এবং নিজদেশের আদিমবাসীদিগের উন্নতির জন্য আমেরিকানরা কিরূপ চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিতেছে।

"আর এক সময়ে হয়ত মহা উৎসাহের সহিত ভারতবর্ষের বা মোগল-দিগের ইতিহাস-বর্ণনায় নিযুক্ত হইতেন—এ বিষয়ের মহিমাকীর্ত্তনে তিনি কদাপি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি দিল্লী বা আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজকে বলিয়াছিলেন 'একটা অস্পষ্ট ম্লানিমা—একটা ক্ষীণ আভাস—এবং অদূরে চিরবিশ্রামস্থান।' আর একবার শাহ্‌জাহানের কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ উৎসাহের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 'ওঃ! তিনিই ছিলেন মোগলবংশের কুলতিলক! অমন সৌন্দর্য্যবোধ ইতিহাসে আর দেখতে পাওয়া যায় না। আর নিজেও একজন উৎকৃষ্ট কলাবিৎ ছিলেন—আমি তাঁহার স্বহস্তে চিত্রিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছি—তাহা ভারতীয় শিল্প-ভাণ্ডারের গৌরবস্থল; কি প্রতিভা!' আবার আকবরের সম্বন্ধে আরও বেশী বলিতেন এবং সে সময়ে ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত। আগ্রার সেকেন্দ্রার উন্মুক্ত সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে এই আবেগের হেতু সহজেই উপলব্ধ হইবে।

"কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের যে ভাবগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত, স্বামীজির মধ্যে তাহারও অভাব ছিল না। এক ভাবের উদয়ে তিনি চীনকে জগতের রত্নভাণ্ডার বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং সেখানকার মন্দিরের প্রবেশদ্বারের

উপরিভাগে যে প্রাচীন বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা দেখিয়াছিলেন সে কথা বলিতে বলিতে তাঁহার শরীর যেন হর্ষাবেগে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। প্রাচ্য লোকদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যবাসীদের ধারণা যে শিথিল ও অস্পষ্ট তাহার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, চীনেদের মত অসত্যপরায়ণ জাতি আর দুনিয়ায় নাই। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত, কারণ যুক্তরাজ্যে চীনেরা বাণিজ্য-বিষয়ক সততার জন্য সুপ্রসিদ্ধ, এমন কি ও বিষয়ে তাহাদের কথার মূল্য পাশ্চাত্ত্যদের লেখাপড়ার চেয়েও অনেক বেশী। সুতরাং উপর্য্যুক্ত মন্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং যদিও উহা লজ্জাকর বটে, তথাপি উহার প্রচলন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। কিন্তু স্বামীজির নিকট উহা অসহ্য। অসত্য-পরায়ণতা! সমাজশরীরের কাঠিন্য! এসব কথা কি আপেক্ষিক নয়? আর তা ছাড়া অসত্যপরায়ণতা থাকলে কি ব্যবসায় বা সমাজ কোনটা চলে? মানুষ যদি মানুষকে বিশ্বাস না করে, তা হলে পরস্পরকে সাহায্যকরণ বা একত্র হয়ে কর্ম্মসাধন এসব কি একদিনের জন্যও হতে পারতো? আর পাশ্চাত্ত্যভাবের সঙ্গে ওর পার্থক্যই বা কোথায়? ইংরেজরাই কি সব সময় ঠিক জায়গায় আহ্লাদ বা দুঃখ প্রকাশ করতে পারে? তোমরা হয়ত বলবে 'তবুও একটু পরিমাণের তারতম্য আছে!' হয়ত আছে—কিন্তু সে ওইটুকুই—অর্থাৎ পরিমাণেরই ইতরবিশেষ—আসল জিনিসের কিছু ভেদ নয়।

"কিংবা হয়ত তিনি ইটালীতে চলিয়া গেলেন অর্থাৎ সেই দেশের সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন—'সেই ধর্ম্ম ও শিল্পের দেশ—ইউরোপে যার জুড়ি নেই—সাম্রাজ্যনির্ম্মাণ ও ম্যাটসিনির দেশ—স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ভাবের জননী।'

"কোনও দিন বা শিবাজী ও মারাঠাদিগের কথা এবং কেমন করিয়া তিনি এক বৎসর সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রায়গড়ে প্রত্যাবৃত্ত

হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইত, আর স্বামীজি বলিতেন, 'তাই আজ পর্য্যন্ত ভারতের রাজশক্তি সন্ন্যাসীকে ভীতির চক্ষে দেখেন, পাছে গেরুয়া বসনের ভিতর হইতে আবার একটা শিবাজী বাহির হইয়া পড়ে।'

"কোন কোন সময়ে 'আর্য্যজাতি কাহারা ও কিরূপ?'—এই প্রশ্ন স্বামীজির চিত্ত অধিকার করিয়া বসিত। তিনি বলিতেন, তাঁহারা মিশ্রজাতি, আর মনুষ্যজাতির বিভিন্ন প্রকার নমুনার মধ্যে সাদৃশ্য কতদূর তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেন, সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহার অনেক সময় মনে হইত চীনে রহিয়াছেন—ঐ দুই জাতির মধ্যে সাদৃশ্য এত নিকট। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নরওয়েরও কতক কতক অংশ সম্বন্ধে ঐ কথা খাটে, তারপর বিভিন্ন দেশ ও তদ্দেশীয় অধিবাসীদের মৌখিক আকৃতির সমালোচনা চলিতে লাগিল, আর সেই হাঙ্গেরীয় পণ্ডিতের কথা উঠিল যিনি তিব্বতকে হূনজাতির উৎপত্তিস্থল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে দার্জ্জিলিংয়ের কবরস্থানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন! ইত্যাদি—

"কখনও কখনও স্বামীজি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইতেন, ভারতের ইতিহাস কেবলমাত্র এই দুই জাতির সংঘর্ষের দৃশ্য; আর বলিতেন, ক্ষত্রিয়েরাই বারবার এদেশের লোকের শৃঙ্খল-মোচনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। আবার বর্ত্তমান বাঙ্গালী কায়স্থেরা যে প্রাক্‌মৌর্য্য ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসের কতকগুলি চমৎকার হেতুও তিনি প্রদর্শন করিতেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে তিনি দুইটি বিভিন্নমুখী সভ্যতার স্রোত বলিয়া চিত্রিত করিতেন—একটি চির-প্রচলিত রীতিপদ্ধতি এবং প্রাচীন আদর্শের গভীর খাতে ধীর সন্তর্পণগতিতে প্রবাহিত এবং অপরটি ভাবোচ্ছ্বাসে

উদ্বেলিত, বিশ্বব্যাপী উদার দৃষ্টি লইয়া যুগান্তরের লৌহনিগড় ভগ্ন করিতে উদ্যত এবং সামাজিক বিধানে প্রস্তরস্তূপকে অপসৃত করিয়া তাহার স্থলে নূতন ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক। তিনি বলিতেন, এটি একটি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ধারা যে রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ সকলেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর ব্রাহ্মণের অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য, ব্রাহ্মণত্বের প্রবল প্রতাপের প্রত্যুত্তরপ্রদানের জন্যই জাত্যভিমান চূর্ণ করিবার বিরাট মুদ্গর হস্তে 'ক্ষত্রিয়দিগের উদ্ভাবিত' বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়!

"ধন্য সে মুহূর্ত্ত যখন তিনি বুদ্ধের কথা বলিতেন! কারণ অজ্ঞ বিদেশীয় শ্রোতা হয়ত তাঁহার কোন একটি কথায় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, 'এ কি স্বামীজি, আমি জানিতাম না যে আপনি একজন বৌদ্ধ!' অমনি বুদ্ধের নামে ভাবরাগোজ্জ্বল মুখমণ্ডল প্রশ্নকর্ত্তার দিকে ফিরাইয়া তিনি বলিতেন, 'ভদ্রে, আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাস। তাঁহার সমতুল্য এ পর্য্যন্ত কে হইয়াছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—নিজের জন্য কখনও একটি কাজ করেন নি। বিশাল হৃদয়ের দ্বারা সমগ্র জগৎকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র হইয়াও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—এত করুণা যে একটা ছাগশিশুর জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত, এত প্রেম যে একটা ব্যাঘ্রীর ক্ষুধানিবারণের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—চণ্ডালেরও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, আর বাল্যকালে তিনি এই অধমকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন!'

"বুদ্ধের সম্বন্ধে তিনি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বহুবার এইরূপ বলিতেন। আর একবার তিনি আমাদিগকে অম্বাপালীর কাহিনী শুনাইয়াছিলেন—সেই সুন্দরীপ্রধানা বারনারী যে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইয়াছিল, শুনিয়া আমার মনে পড়িয়া গেল কবি রসেটীর সেই কবিতা—যাহাতে

মেরী মাগদেলীন নামক পতিতা নারী প্রভু যীশুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিতেছেন—

ওগো, ছেড়ে দাও মোরে !
বঁধুর আনন ওই
করে মোরে আকর্ষণ।
ওই মোর হৃদয়-দেবতা
দাঁড়ায়ে দুয়ারে !
কেশপাশে তাঁর মুছাব চরণ,
ধোয়াব নয়নজলে,
আবেগ-কম্পিত অধরের ধারে—
একবার শুধু পরশিব পদ।
ওগো, আর কি এমন হবে ?
আবার কি পাবো
এমন করিয়া ধরিতে হৃদয়ে
ব্যথিত চরণ দুটি ?
ওগো, ছেড়ে দাও মোরে !
ওই প্রভু ডাকিছেন,
ওই তিনি চাহিছেন,
ওই তিনি সোহাগ-বাণীতে
করেন আহ্বান মোরে !
ওগো ছেড়ে দাও !

"কিন্তু কেবল জাতীয় ভাব লইয়াই যে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিত তাহা নহে। মাঝে মাঝে এক একদিন হয়ত অনেকক্ষণ ধরিয়া ভক্তিসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা হইত—যে ভক্তিতে ভক্ত ও ভক্তের দেবতার মধ্যে কোন

ব্যবধান থাকে না, যে ভক্তি রায় রামানন্দের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল, যাহাকে কবির ভাষায় বলা যায়—

'চারি চক্ষে হইল মিল। দুটি প্রাণ এক হয়ে গেল।

আর মনে নাই কে পুরুষ, কেবা নারী,—তিনি কিংবা আমি।

শুধু এই জানি, দুটি ছিল যাহা, প্রেমের পরশে এক হয়ে গেল।'*

"আর একদিন প্রাতঃকালে তুষারমৌলি হিমশিখরের উপর উষার অলক্তকরাগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া স্বামীজি বলিলেন, 'ওই দেখ শিব উমা। ঐ উন্নত ধবলগিরি শুভ্রকান্তি মহাদেবের উরঃস্থল, আর ওই হেমচ্ছটা আনন্দময়ী জগজ্জননীর ভুবনমোহিনী গৌরবিভা।' প্রকৃতই এ সময়ে তাঁহার মনে এই ধারণাই বিশেষ করিয়া প্রবল হইয়াছিল যে জগতের ঈশ্বর জগতের বাহিরেও নহেন, ভিতরেও নহেন, বা এ জগৎ তাঁহার প্রতিবিম্ব নহে, তিনিই স্বয়ং এই জীব-জগদাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

"সারা গ্রীষ্মকালটা তিনি মাঝে মাঝে প্রায়ই আমাদের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভারতের পৌরাণিক কাহিনীসকল বর্ণনা করিতেন, সে-সকল কাহিনী আমাদের দেশের ছেলেভুলান গল্পের মত নহে, বরং অনেকটা প্রাচীন গ্রীসের শৌর্য্যসঞ্চারী উপকথার মত। ইহার মধ্যে শুকদেবের আখ্যানই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় আলমোড়ার দিগন্তপ্রসারী কৃষ্ণ শৈলমালার পরপারে শঙ্করগিরির

---

* পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল
না সে রমণ না হাম রমণী
দুঁহ মন মনোভাব পেশল জানি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ

উপর চাহিয়া চাহিয়া আমরা প্রথম এই গল্প শুনি। সে যে কি মধুর লাগিয়াছিল!

"জননী-জঠর হইতে নির্গত হইলে জননীর মৃত্যু ঘটিবে ইহা জানিতে পারিয়া আদর্শ পরমহংস মহাজ্ঞানী মহাত্মা শুক পঞ্চদশ বর্ষ গর্ভবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পিতা ব্যাসদেব জগজ্জননী উমার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, 'মাগো, তুই যদি ওর মায়ার আবরণ ছিন্ন করতে ক্ষান্ত না হস, তা হলে যে ও ভূমিষ্ঠ হবে না।' তখন মহামায়া এক মুহূর্ত্তের জন্য শুকদেবকে মায়ায় মুগ্ধ করিলেন—সেই শুভক্ষণে ভগবান শুকদেব ভূমিষ্ঠ হইলেন। ষোড়শবর্ষের শিশু পিতামাতা কাহাকেও চিনিলেন না। জন্মগ্রহণমাত্র নগ্নদেহে বরাবর যে দিকে দুই চক্ষু যাইতে লাগিল সেই দিকেই চলিলেন; পিতা ব্যাসদেব পশ্চাতে। অবশেষে এক গিরিসঙ্কটের নিকট উপস্থিত হইয়া শুকের দেহ যেন বায়ুতে মিশিয়া গেল—পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে লয় পাইল। পিতা ব্যাস 'হা পুত্র' রবে রোদন করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোথাও কিছু নাই, শুধু সেই রব পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়া প্রণবধ্বনির সৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন শুকদেব পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করিলেন এবং পিতার নিকট আগমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। পিতা দেখিলেন পুত্র পূর্ণজ্ঞানী, তাহাকে শিখাইবার মত কিছুই আর তাঁহার নিকট নাই। তখন তিনি তাঁহাকে মিথিলারাজ জনকের নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রাসাদের বহির্ভাগে জনকরাজার সিংহদ্বারের নিকট মহাত্মা শুকদেব তিন দিন একভাবে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না, বা তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও করিল না। চতুর্থ দিবসে তাঁহাকে মহাসমারোহে রাজসকাশে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তখনও সেই একভাব—কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই।

"তখন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজার প্রধান মন্ত্রী এক অপরূপদ্যুতিসম্পন্ন মোহিনী স্ত্রী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন—সে রূপ দেখিয়া সভাস্থ সকলেরই চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, কিন্তু মহাযোগী শুকদেব নির্ব্বিকার। তখন মন্ত্রিবর রাজা জনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্, যদি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ থাকেন, তবে ইনিই সেই মহাত্মা।'

"শুকদেবের সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে আদর্শ পরমহংস তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনিই সচ্চিদানন্দ-সাগরের অমৃতবারি এক অঞ্জলি পান করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া স্বামীজি বলিতেন, 'অধিকাংশ সাধু ঐ সাগরের তটাভিঘাতধ্বনিমাত্র শ্রবণ করিয়াই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। কেহ কেহ শুধু দূর হইতে দর্শন মাত্র করিতে পান, আর স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য আরও কম লোকের হয়,—কেবল একমাত্র শুকদেবই ঐ সমুদ্রবারি পান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।'

"বাস্তবিক শুকদেবই স্বামীজির চক্ষে সাধুত্বের আদর্শ বিগ্রহ ছিলেন। যে ব্রহ্মজ্ঞানে ঐহিক জীবন ও জগৎটা বালকের খেলার ন্যায় তুচ্ছ বোধ হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ যদি কাহারও হইয়া থাকে তবে শুকদেবই তাহার উপমাস্থল। বহুদিন পরে আমরা শুনিয়াছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেব নাকি তাঁহাকে 'এই আমার শুক' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আর যে গভীর-আনন্দানুভূতি-জনিত দৃষ্টির সহিত তিনি ভাগবত ও শুকদেবের মাহাত্ম্য-বর্ণনাকল্পে উক্ত 'অহং বেদ্মি, শুকো বেত্তি, ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা' এই শিববাক্য আবৃত্তি করিতেন, তাহা আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।

"আলমোড়ায় আর একদিন তিনি বঙ্গদেশে প্রাচীন হিন্দু রীতিনীতির

উপর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রথম তরঙ্গসংঘাতে যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। নাইনিতালে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন আবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিষয়ে বলিলেন, 'আমার সমবয়স্ক এমন একজন লোকও উত্তরভারতে নাই যাহার উপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব ব্যাপ্ত না হইয়াছে।' এই সকল মহাত্মা যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানের কয়েক ক্রোশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা স্মরণ করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া স্বামীজি বলিলেন, এই মহাবীরই এদেশে বিধবা-বিবাহ-প্রচলন ও বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সেই একটি দিনের গল্প বলিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন, যে দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাতী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যাইবেন কিনা এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহগমনকালে হঠাৎ দেখিলেন তাঁহার আগে আগে একজন স্থূলকলেবর মোগল গদাইলস্কর চালে হেলিয়া দুলিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'হুজুর, আপনার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র আসুন' কিন্তু তৎশ্রবণে মোগল মহোদয়ের পূর্ব্বগতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না, তিনি ঠিক সেই একই গদীয়ানী চালে চলিতে লাগিলেন। ইহাতে সংবাদদাতা বিস্ময়-মিশ্রিত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে মোগল-পুঙ্গব ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, 'কি! পাজী, বেয়াদব, দুই-চারখানা কঞ্চি বাঁকারি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া কি আমি আমার বাপ-পিতামহের চাল ছাড়িব?' এই কথা শুনিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে হইল ঐ ব্যক্তির কথাই ঠিক বটে, এবং তদবধি

তিনি বিলাতী পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে সনাতন ধুতিচাদরকে বহাল রাখাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

"আর একটি চিত্র আমাদের বড় মনে লাগিত—বিদ্যাসাগরজননী বালিকা বিধবাগণের দুঃখে বিগলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—উহাদের বিবাহপ্রদান সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন বিধান আছে কিনা, আর বিদ্যাসাগর একমাস দ্বার বন্ধ করিয়া ক্রমাগত শাস্ত্র ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া অবশেষে আসিয়া বলিলেন, 'না, শাস্ত্র উহার বিরোধী নহেন' এবং তারপর বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ঐ মতের স্বপক্ষে স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তারপর দেশীয় রাজাদিগের চক্রান্তে উক্ত পণ্ডিতগণ ঐ মত প্রত্যাহার করিলে যখন তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার যোগাড় হইল, তখন কেমন করিয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত করিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া স্বামীজি বলিতেন, তবে উহা যে তেমন ভাবে প্রচলিত হইল না তাহার কারণ সামাজিক নহে, আর্থিক অসচ্ছলতা।

"যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নৈতিক বলে সমাজ হইতে বহুবিবাহ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার যে আধ্যাত্মিক শক্তি কতখানি ছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। আবার যখন শুনি, ১৮৬৪ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ নরনারীকে ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া এই মহাত্মাই বিষম আক্ষেপে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'আর ভগবান মানিতে বাধ্য নই, আজ হইতে আমি নাস্তিক', তখন বাহিরের তুচ্ছ মতবাদের উপর ভারতীয়গণের যে কিরূপ অনাস্থা তাহা স্মরণ করিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই।

"বাঙ্গালাদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যেসকল মহাত্মা আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামীজি উক্ত ব্যক্তির সহিত আর এক মহদাশয় ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতেন। ইনি সেই নাস্তিক বৃদ্ধ স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসী

ডেভিড হেয়ার—কলিকাতায় পাদরীগণ যাঁহাকে গির্জ্জাপ্রাঙ্গণে সমাহিত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইনি এক পুরাতন ছাত্রের ওলাউঠা হইলে তাহার শুশ্রূষা করিতে গিয়া মারা যান। খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদনে বিমুখ হইলে তাঁহারই আশ্রিত ও পালিত শত শত ছাত্র আসিয়া তাঁহার মৃতদেহের সংকার করে এবং তদবধি সেই স্থান এদেশের লোকের নিকট পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এখন সেই স্থান কলিকাতার শিক্ষাকেন্দ্র কলেজ স্কোয়ারে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে সগৌরবে বিরাজ করিতেছে।

"যে সময়ের কথা হইতেছিল তখন এদেশে খ্রীষ্টান মিশনরীগণের খুব প্রাদুর্ভাব। সুতরাং আমরা এই প্রসঙ্গে স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে কখনও প্রভাবিত হইয়াছিলেন কিনা। আমরা যে সাহস করিয়া ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহাতে স্বামীজি একটু আমোদ বোধ করিলেন, তারপর গৌরবের সহিত বলিলেন, 'আমার খ্রীষ্টান পাদরীদিগের সংস্পর্শে আসা মানে শুধু একজনের সংস্পর্শে আসা। তিনি ছিলেন আমার পুরাতন শিক্ষক মিঃ হেষ্টী।' এই কোপনস্বভাব বৃদ্ধের প্রয়োজন অতি সামান্য ছিল এবং তাঁহার গৃহে ছাত্রদিগের অবাধে যাতায়াত চলিত। এ অধিকার তিনি নিজেই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজিকে প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারতবাসের শেষ সময়ে প্রায় বলিতেন, 'হাঁ, বৎস, তোমরাই ঠিক বুঝিয়াছ—তোমরাই ঠিক বুঝিয়াছ—সব ভগবান, এ কথাই সত্য।' স্বামীজি বলিতেন, 'তাঁহার কথা বলিতে আমি গৌরব অনুভব করি, কিন্তু তাই বলিয়া মনেও করিও না তিনি আমাকে খ্রীষ্টানী ভাবে একটুও ভাবিত করিতে পারিয়াছিলেন।'

"আবার অন্যান্য বিষয়ে অনেক কৌতুককর গল্পও তাঁহার নিকট শুনিতে পাওয়া যাইত। যেমন একবার আমেরিকার এক শহরে তিনি বাসা লইয়াছিলেন, সেখানে তাঁহাকে প্রত্যহ স্বহস্তে নিজের খাদ্য পাক করিতে হইত, আর সেই সময়ে এক অভিনেত্রী (সে বড় টর্কীভাজা খাইতে ভালবাসিত), আর একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষের সহিত তাঁহার দেখা হইত। ইঁহারা দুই স্বামি-স্ত্রী—ভূত দেখাইয়া জীবিকা-অর্জ্জন করা ইহাদের ব্যবসায় ছিল। স্বামীজি একদিন যখন ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া বলিতেছিলেন, 'দেখ, এরূপভাবে লোককে ঠকান বড় অন্যায়, তুমি ও ব্যবসায় ছাড়িয়া দাও' তখন তাহার স্ত্রী আসিয়া বলিল, 'ঠিক বলিয়াছেন মহাশয়, আমিও ওঁকে ঐ কথা বলি; কারণ ওতে লাভ কি, উনি দেখান ভূত—আর পয়সা পেটেন মিসেস্ উইলিয়ামস্—এতে লাভ কি?'

"আর একবার, স্বামীজি গল্প করিতেন, একজন শিক্ষিত যুবক ইঞ্জিনিয়ার তাহার মৃত মাতার আত্মা দেখিতে চাহিলে উক্ত স্থূলকায় মিসেস্ উইলিয়ামস্ একটা পর্দার আড়াল হইতে দেখা দেন। এখন ও লোকটির মা ছিলেন খুব রোগা। কাজেই যুবক আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, 'আহা মাগো! প্রেতলোকে গিয়ে তুমি কি মোটাই হয়েছ?' স্বামীজি বলিতেন, এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল, তিনি তখন সেই যুবকটিকে ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ, একটা গল্প বলি শোন। এক রাশিয়ান চিত্রকর এক চাষার মৃত পিতার চিত্র আঁকিবার ভার পাইয়াছিল। পিতার আকৃতি কিরূপ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে চাষা বলিয়াছিল, 'আঃ হা, বলেইছি ত তাঁর নাকের ওপর একটা আঁচিল ছিল।' কাজেই চিত্রকর একটা বৃদ্ধ চাষার মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার নাকের উপর প্রকাণ্ড এক আঁচিল বসাইয়া সেই চাষাকে গিয়া বলিল যে ছবি প্রস্তুত, সে যেন একবার নিজে আসিয়া দেখিয়া যায়। চাষা আসিয়া ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়াই

ভাবে গদগদ হইয়া বলিল—'বাবা! বাবা! যেদিন তোমায় শেষ দেখা দেখি তারপর থেকে তুমি কতই যে বদ্‌লে গেছো!' এই গল্প বলার পর সেই ইঞ্জিনিয়ার ছোকরা আর স্বামীজির সহিত বাক্যালাপ করিত না। ইহাতে বুঝা যায় অন্ততঃ গল্পটার সাদৃশ্য বুঝিবার মত বুদ্ধি তাহার ছিল।

* * *

"৯ই জুন বৃহস্পতিবার দিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। স্বামীজির (এবং তিনি যে হিন্দু শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাহার) এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি একদিন একটা ভাব গ্রহণ করিয়া দিব্য একটি ছবি মনের সামনে ফুটাইয়া তুলিলেন, বেশ আনন্দ পাওয়া গেল, আবার পরদিন হয়ত তাহাকে নির্ম্মমভাবে বিশ্লেষণ ও ছিন্নভিন্ন করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। এদেশের অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহারও বিশ্বাস ছিল যে, কোন একটা ভাব আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া যদি ঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় ও তাহার সহিত অন্য বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকে তাহা হইলে উহার বাস্তব সত্যতা লইয়া মারামারি করিবার কোন প্রয়োজন নাই, এইভাবে দেখিতে তিনি প্রথম তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট শিক্ষা করেন। একবার নাকি তিনি তাঁহার নিকট কোন পৌরাণিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরমহংসদেব বলেন, 'কি! যাদের প্রাণ থেকে এইসব ভাব বেরিয়েছে তারা যে তাই ছিল তা বুঝতে পারিস না?'

"সাধারণ ভাবে খ্রীষ্টের ন্যায় কৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও স্বামীজি সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, ধর্ম্মশিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধ ও মহম্মদেরই 'শত্রু মিত্র' ছিল, অর্থাৎ তাঁহাদের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ অকাট্য। আর সব যেন ছায়ায় ঘেরা—বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ। কবি, দার্শনিক, যোদ্ধা, রাখাল, রাজা, সব একত্র হয়ে গীতাহস্তে এক অপূর্ব্ব

চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে—তাঁরই নাম শ্রীকৃষ্ণ। 'কিন্তু এখন কৃষ্ণই সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ'—এই বলিয়া তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সেই অদ্ভুত চিত্র আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধরিলেন—সারথি কৃষ্ণ রথবাহী অশ্বগণকে সংযত করিবার জন্য রশ্মি আকর্ষণ করিয়া সমরক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, তারপর অর্জ্জুনকে বিষাদমগ্ন দেখিয়া গীতার গভীর তত্ত্ব বুঝাইতেছেন।

"... স্বামীজি আর একটি কথা বলিতে বড় ভালবাসিতেন। সেটি এই—গীতিকাব্যে বিরহ, পূর্ব্বরাগাদি যতপ্রকার ভাবসমাবেশ সম্ভব, কৃষ্ণ-উপাসকেরা তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই।

"১০ই জুন বৈকালে আলমোড়ায় শেষ কথাবার্ত্তা হয়—সেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পীড়ার বিষয় বলিয়াছিলেন। কেমন করিয়া ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার পীড়াকে সাংঘাতিক ও সংক্রামক বলায় শিষ্যদিগের সকলের ভাবনা হইয়াছিল এবং সেই ভাবনা দূর করিবার জন্য স্বামীজি ঐ কথা শুনিবামাত্র স্বহস্তে পরমহংসদেবের ভুক্তাবশিষ্ট ক্ষতনিঃসৃত পুঁজাদিমিশ্রিত সুজির পায়েস নিঃশেষে চুমুক দিয়া পান করিয়াছিলেন, এই সব কথা হইয়াছিল।"

এই সকল গল্প-গুজবের মধ্যেও সময়ে সময়ে মনুষ্যজীবনের দুর্ব্বিষহ কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন এবং হঠাৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাইতেন। নির্জ্জনতার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ অধীর হইয়া উঠাতে ২৫শে মে তারিখে তিনি বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া কয়েক দিনের জন্য একাকী আলমোড়া হইতে কিছু দূরে সীয়াদেবী নামক এক নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু তখনও লোকের ভিড় থাকাতে তাঁহার ভাবভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং তিনি

দিনকয়েকের জন্য মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারকে সঙ্গে লইয়া মঠের জন্য স্থানাদি অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে আলমোড়া হইতে কিছু দূরে এক নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। এই সময়টা তাঁহার মনে আবার পূর্ব্বকার ন্যায় স্বল্পাহারী, শীতাতপসহিষ্ণু, নির্জ্জনচারী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ৫ই জুন, রবিবার, সন্ধ্যাকালে উক্ত নির্জ্জনবাস হইতে আলমোড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দুইটি নিদারুণ শোক-সংবাদ প্রাপ্ত হন—একটি পরমহংস পওহারী বাবার দেহত্যাগ, অপরটি তাঁহার প্রিয় শিষ্য গুডউইন সাহেবের পরলোকগমন। পওহারী বাবাকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন, সুতরাং উক্ত মহাত্মার তিরোভাব যে তাঁহার নিকট কষ্টকর হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তিনি বলিতেন, রামকৃষ্ণদেবের পরই পওহারী বাবার স্থান; কিন্তু গুড্উইনের মৃত্যুতে স্বামীজি বিশেষ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গুড্উইন আলমোড়ায় ছিলেন। সেখান হইতে তিনি মান্দ্রাজে গমন করিয়া 'মান্দ্রাজ মেল' নামক সংবাদপত্রের অফিসে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া উতকামন্দ গমন করেন এবং সেইখানেই ২রা জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। এই শোক-সংবাদ প্রথম দিন কেহ স্বামীজিকে জানাইতে সাহস করে নাই। দ্বিতীয় দিন মিসেস্ বুলের বাংলাতে এই সংবাদ ধীরে ধীরে তাঁহাকে প্রদত্ত হইলে তিনি অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত উহার আঘাত সহ্য করিলেন; কিন্তু বেশীদিন আর ঐ স্থানে থাকিতে পারিলেন না। একদিন বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বাহিরে ভক্তিময় হইলেও ভিতরে প্রকৃত জ্ঞানময় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ বাহিরে জ্ঞানের ভাব থাকিলেও ভিতরটা বড়ই কোমলতাপূর্ণ। গুড্উইনের মৃত্যুতে তিনি যে কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়।

কয়েক ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমার একটা মস্ত দুর্ব্বলতা হয়েছে—গুড্‌উইনের মূর্ত্তিখানা কেবলি মনের ভিতর জাগছে। এটা ত ভাল নয়—মানুষের পক্ষে মাছ বা কুকুরের স্বভাব ছাড়তে না পারা যেমন অগৌরব, স্মৃতির দাস হওয়াও তেমনি। মানুষকে এ ভ্রান্তির মোহ কাটিয়ে উঠতে হবে, বুঝতে হবে মৃতেরাও ঠিক আগেকার মত আমাদের আশে পাশে আছে, কোথাও যায় নি। তারা যে নেই, তাদের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ হয়েছে এইটে ভাবাই ভুল—এইটেই কল্পনা।" তারপর বলিলেন, "কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাতে এই জগদ্ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে এটা মনে করাই আহাম্মকি। তা যদি হত তা হলে গুড্‌উইনকে হত্যা করার জন্য এরকম ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করে তাকে নিহত করাই উচিত হত না কি? বল দিকিন, গুড্‌উইন বেঁচে থাকলে কত কাজ করতে পারত!"

এই সময়ে একদিন তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একজন গুড্‌উইন সাহেবের মৃত্যুতে একটি বিলাপ-সঙ্গীত লিখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজি সেইটি সংশোধন করিতে গিয়া তাহার আদ্যোপান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া 'সে শান্তিতে থাকুক' (Requiescat in Pace) শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র ইংরেজী পদ্য রচনা করিয়া গুড্‌উইনের শোকসন্তপ্তা জননীর নিকট পুত্রের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। গুড্‌উইনের সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছিলেন—"গুড্‌উইনের ঋণ অপরিশোধনীয়। আর যাঁহারা মনে করেন আমার কোন চিন্তা দ্বারা তাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে তাঁহার প্রত্যেক কথাটি শ্রীমান গুড্‌উইনেরই স্বার্থলেশহীন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে আমি এমন একজন অকপট বন্ধু, ভক্তিমান্ শিষ্য ও অদ্ভুত কর্ম্মীকে হারাইয়াছি, যে জানিত না ক্লান্তি কাহাকে বলে। পরার্থে যাহারা জীবনধারণ করেন

এরূপ লোক জগতে অতি অল্প। সেই অত্যল্প সংখ্যারও আর একটি হ্রাস পাইল।"

ইহার পর হইতে লোকের সঙ্গ স্বামীজির নিকট দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি এস্থান ত্যাগ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে, যাহা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে স্বামীজির ভাব-অবলম্বনে ও তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যগণের অর্থ-সাহায্যে রাজাম্ আয়ার নামক একজন শক্তিশালী মান্দ্রাজী যুবক লেখকের সম্পাদকতায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত সম্পাদকের পরলোকপ্রাপ্তিতে কাগজখানি উঠিয়া গিয়াছিল। স্বামীজি ইহাতে একটু দুঃখ অনুভব করেন, কারণ তিনি এই কাগজখানিকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণের দ্বারা ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় কতকগুলি শিক্ষাপ্রদ সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এমন কি একখানি দৈনিক পত্র পরিচালন করিবার সঙ্কল্পও বহুদিন হইতে তাঁহার মাথায় ছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে মিঃ সেভিয়ার ঐ কাগজখানি পুনরায় চালাইবার জন্য আবশ্যকানুযায়ী ব্যয়ভার বহন করিতে রাজী হইলেন। স্থির হইল, স্বরূপানন্দের সম্পাদকত্বে ঐ কাগজখানি অনতি-বিলম্বে আলমোড়া হইতে প্রকাশিত হইবে এবং সেভিয়ার সাহেব তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ হইবেন। এই বন্দোবস্তে স্বামীজি আনন্দিত হইয়া ১১ই জুন তারিখে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

কাশ্মীরে

১২ই জুন (১৮৯৮) স্বামীজি স্বদলে ভীমতালে বিশ্রাম করিয়া রাওলপিণ্ডি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পাঞ্জাবে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিখ গুরুদিগের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন।[১] শিখদিগের অতুল বীরত্ব ও সমরনাদ 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে', তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রন্থ্ সাহেব এবং শিখগুরুদিগের অসাধারণ ত্যাগ ও মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাঁহারা বেদান্তের শ্রেষ্ঠভাবগুলি সাধারণের মধ্যে এরূপভাবে প্রচার করিয়াছেন যে, আজও পর্যন্ত কৃষককন্যার চরকা হইতে 'সোহহম্' 'সোহহম্' শব্দ নির্গত হয়। পরে সেকন্দরশাহের পাঞ্জাব

১। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন:—"পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমরা গুরুদেবের স্বদেশপ্রেমের গভীরতম পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যদি কেহ তাঁহাকে সে সময়ে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ধারণা করিয়া বসিতেন যে, স্বামীজি এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি উহার সহিত আপনাকে এত অভেদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হইত যেন তিনি ঐ দেশের লোকের সহিত বহু প্রেম ও ভক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন; যেন তিনি উহাদের নিকট পাইয়াছেনও অনেক, এবং দিয়াছেনও অনেক। কারণ তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ছিলেন, যাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতেন যে, তাঁহাতে তাঁহারা গুরু নানক ও গুরু-গোবিন্দের (অর্থাৎ তাঁহাদের প্রথম ও শেষ গুরুর) অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সন্দেহপ্রবণ, তাঁহারা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। আর যদি তাঁহারা তাঁহার আশ্রিত ও অন্তরঙ্গশ্রেণীভুক্ত ইউরোপীয় শিষ্যগণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে বা তাঁহার ন্যায় উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তিনি এই উদ্দামহৃদয় লোকগুলিকে তাহাদের মতের অপরিবর্ত্তন এবং অটুট কঠোরতার জন্য যেন আরও অধিক ভালবাসিতেন।"

আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ও বৌদ্ধসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং গান্ধারের ভাস্করশিল্পের সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, ইউরোপীয় সাহেবরা আবার বলে যে আমরা নাকি গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পকলা শিক্ষা করিয়াছি!

রাওলপিণ্ডি হইতে সকলে টঙ্গা করিয়া মরিতে পৌঁছিলেন; এখানে তিন দিন থাকিয়া কতক টঙ্গা ও কতক নৌকার সাহায্যে ২২শে জুন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। পথে কোহালা হইতে বারামুল্লা পর্য্যন্ত তিনি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অধঃপতন ও ধর্ম্মের নামে বামাচারাদি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুযোগ করিলেন।

পথের দৃশ্য অতি রমণীয়! কোথাও কৃষক আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে, কোথাও সাধুসন্ন্যাসীরা আঁকাবাঁকা পথ দিয়া দেবমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। পর্ব্বত-সানুদেশে শত শত আইরিস্ পুষ্প ফুটিয়াছে। মধ্যে শ্যামল উপত্যকা ও শস্যক্ষেত্র, চতুর্দ্দিকে তুষারাবৃত শুভ্রশীর্ষ পর্ব্বতমালা। কাশ্মীরের শৈলগাত্রক্ষোদিত প্রাচীন কাহিনী, ধ্বংসস্তূপ ও অসরল গিরিসঙ্কটসমূহ স্বামীজির স্মৃতিপথে উদিত হইল।

তিনি যেখানে যাইতেন সেখানকার ভাব গ্রহণ এবং রীতিনীতির ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেন। কাশ্মীরে পৌঁছিয়াও কাশ্মীরিদের সামাবার হইতে চা পান ও তাহাদের চাটনি, মোরব্বা প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে চাকর না আনাতে নিজেকেই আহারাদির তত্ত্বাবধান ও সকলের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইল। এ সকল কাজ চিরদিনই তিনি আগ্রহ সহকারে করিতেন। বারামুল্লায় পৌঁছিয়া তিনডোঙ্গাবিশিষ্ট একটি হাউসবোট ভাড়া করিলেন এবং তৃতীয় দিবসে শ্রীনগরে পৌঁছিলেন। পরদিবস বিতস্তা নদীর ধারে ভ্রমণ

করিতে করিতে একস্থানে নৌকা বাঁধিয়া সঙ্গীদিগকে লইয়া মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রমে একটি খামারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে একটি সুশ্রী বর্ষীয়সী মুসলমান রমণী চরকায় পশম কাটিতেছিলেন এবং তাঁহার নিকটে তাঁহার দুই পুত্রবধূ ও তাহাদের ছেলেমেয়েরা তাঁহার কাজে সাহায্য করিতেছিল ও খেলা করিতেছিল। স্বামীজি সঙ্গীদিগের নিকট ইহাদের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে গত বৎসর তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ইহাদের নিকট একটু জল চাহিয়াছিলেন এবং জলপান করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?" তখন উক্ত বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক গর্ব্বোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর করিয়াছিলেন, "ধন্য খোদা, খোদার অনুগ্রহে আমি মুসলমানী।" এবারও এই ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবার স্বামীজি ও তাঁহার বন্ধুদিগকে যথেষ্ট খাতির করিলেন।

২২শে জুন হইতে ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত ডোঙ্গায় ডোঙ্গায় শ্রীনগরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ হইতে লাগিল। স্বামীজির মুখের বিশ্রাম নাই—গল্প উপদেশাদি সমভাবে চলিতেছে। কাশ্মীরে কত ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; অশোক হইতে কনিষ্কের আমল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের কত উন্নতি, অবনতি ও ক্রমবিস্তৃতি হইয়াছে, শৈবোপাসনার ইতিহাস, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন। একদিন দিগ্বিজয়ী চেঙ্গীস খাঁর রাজ্যজয় সম্বন্ধে বলিলেন যে, তিনি নীচ লোকের ন্যায় পরপীড়ক বা রাজ্যলিপ্সু ছিলেন না, নেপলেয় ও সেকন্দর বাদশাহের সহিত একাসনে স্থান পাইবার যোগ্য—জগতে বৈষম্যের মধ্যে সাম্যস্থাপন ইঁহারও লক্ষ্য ছিল। আবার বলিলেন, হয়ত একই আত্মা ঘুরিয়া ফিরিয়া এই তিন বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভক্তি, ধ্যান, প্লেটোর দর্শন, লীলাবাদ, টমাস এ কেম্পিস, তুলসীদাস, পরমহংসদেব ইত্যাদি অনেক বিষয়েরই আলোচনা হইল।

গীতা সম্বন্ধে বলিলেন, 'সেই অদ্ভুত কাব্য—যাহাতে দুর্ব্বলতার ছায়া মাত্র নাই।'

বিতস্তাতীর দিয়া গমনকালে তাঁহার মনোমধ্যে পূর্ব্ব স্মৃতিসমূহ প্রবলভাবে জাগিতে লাগিল। ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে প্রেমের দ্বারা কেমন করিয়া অসৎকে জয় করা যায় তৎপ্রসঙ্গে একদিন নিজের এক বাল্যবন্ধুর গল্প করিলেন। বলিলেন, এই বন্ধুটি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া কোন এক অনির্দ্দেশ্য পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। ডাক্তার-বৈদ্যেরা কিছুই করিতে পারিল না। তখন তিনি জীবনে হতাশ হইয়া ঐ রকম অবস্থায় সাধারণতঃ লোকে যাহা হয় তাহাই হইলেন অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়ে বীতরাগ হইলেন। তারপর স্বামীজির কথা শুনিতে পাইয়া এবং তিনি একজন যোগী পুরুষ—হয়ত তাঁহার পীড়া আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন এই মনে করিয়া একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামীজি তাঁহার আহ্বানে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ এই শ্রুতিবাক্যটি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—'ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ' (বৃহদারণ্যক) অর্থাৎ 'যিনি মনে করেন তিনি ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিভূত হন; যিনি মনে করেন তিনি ক্ষত্রিয় হইতে ভিন্ন, তিনি ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক অভিভূত হন, এবং যিনি মনে করেন তিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তৃক অভিভূত হন।' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রোগীর নিকট উহা বলিবামাত্র ঠিক যেন মন্ত্রবৎ কার্য্য হইল। শ্লোকটির আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহার মর্ম্মপরিগ্রহ করিয়া শরীরে বিশেষ বলানুভব করিলেন এবং তারপর অতি অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হইলেন। গল্পটি শেষ করিয়া স্বামীজি বলিলেন, "সুতরাং দেখিতেছ,

যদিও আমি সময়ে সময়ে বেয়াড়া রকম কথাবার্ত্তা বলি এবং রাগিয়াও কথা বলি, তথাপি মনে রাখিও আমার হৃদয়ের ভিতর সত্য সত্য ভালবাসা ছাড়া আর অন্য কিছু নাই। যেদিন আমরা ঠিক বুঝিব যে, আমরা জগৎকে ভালবাসি সেদিন সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

দেশাচারেব কথা বলিতে বলিতে উল্লেখ করিলেন যে, দেশাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রথম অভ্যুত্থান পঞ্চম বৎসর বয়সে: আহারের সময়ে দক্ষিণহস্তের পরিবর্ত্তে বামহস্তে ঘটি ধরিয়া জলপান করিলে ঘটির গায়ে ভাত লাগে না, সুতরাং ঐরূপ করাই ভাল—এই বলিয়া তিনি মাতার সহিত তর্ক করিতেন। কিন্তু মা গোঁড়া হিন্দুর মেয়ে, ওকথা কানেই তুলিতেন না।

আবাল্যবর্দ্ধিত শিবানুরাগ এই সময়ে তাঁহার মনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কখনও শিবমাহাত্ম্য-বর্ণনে ক্লান্তিবোধ করিতেন না। বলিতেন, "হাঁ, এই শান্ত সুন্দর তাপস-মূর্ত্তিই আমার আরাধ্য হৃদয়দেবতা।" হরগৌরীর অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, এই পৌরাণিক ধারণার মূলে দুইটি বিভিন্ন ভাব নিহিত আছে। একটি, সর্ব্বত্যাগ ও সন্ন্যাসের ভাব; অপরটি, বিশ্বব্যাপী প্রেমের ভাব। এই কোমলে কঠোর সম্মিলনই জগত্তত্ত্ব বুঝিবার গূঢ় প্রণালী। তাই মহাকাল শ্মশানেশ্বরের ভৈরবরুদ্র মূর্ত্তির সহিত জগজ্জননীর মধুর মাতৃমূর্ত্তির মিলন। আর এক দিন বলিলেন, "এই গ্রীষ্মেই প্রথম বুঝিলাম মহাদেবের জটায় গঙ্গাফেনলেখার অর্থ কি। মহাদেবের জটাকলাপের মধ্য হইতে কল কল ধ্বনি করিয়া গঙ্গা ভূতলে প্রবাহিতা হইতেছেন কথাটা ঠিক, কারণ আমি এ কলনাদের অর্থ বুঝিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি, শেষে বুঝিয়াছি শত শত জলপ্রপাত শুধু 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি করিয়া আকুলভাবে শৈলমালার মধ্য দিয়া নৃত্য করিতে করিতে জগতের পানে ছুটিয়াছে।"

এই সময়ে নিবেদিতা একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা, কালীঘাটে দেখিয়াছি শত শত লোক দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিতেছে, ইহার অর্থ কি?" স্বামীজি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "এই হিমগিরির পদপ্রান্ত চুম্বন করা আর দেবীর সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ড চুম্বন করা কি একই জিনিস নহে?"

কাশ্মীরে আসার এক সপ্তাহ পরেই স্বামীজি জনসঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে একাকী কোথায় চলিয়া যাইতেন। ফিরিয়া আসিলে সকলে লক্ষ্য করিতেন এক অপরূপ স্বর্গীয় দীপ্তিতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সময়ে সময়ে বলিতেন, 'দেহের বিষয় চিন্তা করাও পাপ,' কখনও বলিতেন, 'শক্তি প্রদর্শন করা অনুচিত,' কখনও বা বলিতেন, 'কোন জিনিসই আগের চেয়ে ভাল হয় না, জিনিস যা তাই থাকে, শুধু আমরাই বদলে যাই, আগের থেকে ভাল হই।' তিনি মনুষ্যজীবনকে প্রায়ই ভগবৎশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এ সময়ে সমাজের সংস্পর্শে যেন তাঁহার যন্ত্রণাবোধ হইত, আগেকার মত সন্ন্যাসীর শান্ত ও নিরাবলম্ব জীবনই ভাল লাগিতেছিল এবং গোড়া হইতে মতলব আঁটিয়া কোন কাজ করা দিন দিন অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই স্পষ্ট বুঝা যাইত যে নির্জ্জনবাস ও মৌনাবলম্বনই আত্মোন্নতির প্রধান উপায়। স্বামীজি নিজেও বলিতেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাবে কত প্রভেদ দেখ! ও দেশের লোক মনে করে বিশ বছর একলা বাস করলে লোক ক্ষেপে যায়, আমাদের দেশে কিন্তু সংস্কার যে অন্ততঃ বিশ বছর নির্জ্জনে না থাকলে কোন লোক আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"

শ্রীনগর থেকে মাঝে মাঝে এদিক-ওদিকেও যাওয়া হইত। ২৯শে জুন তখ্‌ত্‌-ই-সুলেমানের মন্দির দেখিতে যাওয়া হইল। তিন হাজার

ফুট উঁচু একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ার উপর এ মন্দির। এখান থেকে সমুদয় কাশ্মীরটা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীজি বলিলেন, "দেখ, মন্দিরের জায়গানির্ব্বাচনবিষয়ে হিন্দুদের কি দক্ষতা! মন্দিরগুলি সবই প্রায় এমন জায়গায় যেখানটা দেখতে খুব চমৎকার।" উদাহরণস্বরূপ তিনি হরিপর্ব্বত ও মার্ত্তণ্ডমন্দিরের কথা উল্লেখ করিলেন। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ হরিপর্ব্বত উঠিয়াছে, যেন মুকুট পরিয়া একটি অর্দ্ধশায়িত সিংহ অবস্থিত, আর মার্ত্তণ্ডমন্দিরের পাদমূলে একটি উপত্যকা বিরাজমান।

৪ঠা জুলাই স্বামীজি একটু ছোট রকমের কৌতুকের আয়োজন করিলেন। ঐ তারিখে অমেরিকা স্বাধীন হইয়াছিল, সুতরাং এটি আমেরিকার একটি জাতীয় উৎসবের দিন। স্বামীজি তাঁহার আমেরিকান শিষ্যদিগকে কিছু না বলিয়া একটি ব্রাহ্মণ দরজীর সাহায্যে গোপনে খাবার নৌকার দরজার উপর তুলা দিয়া ডোরা দাগ ও তারকাচিহ্ন-অঙ্কিত আমেরিকার একটি জাতীয় নিশান প্রস্তুত করাইয়া টাঙ্গাইয়া দিলেন এবং 'এভার গ্রীন' গাছের ডালপালা দিয়া নৌকার দরজা সাজাইলেন। সেখানে চা-পানের আয়োজন হইল। তিনি নিজে '৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেটি আবৃত্তি করা হইল। ঐ কবিতায় তিনি যে স্বাধীনতার বিরাম নাই সেই শেষ স্বাধীনতার বিজয়গাথা গাহিয়াছিলেন। প্রকৃতই চারি বৎসর পরে ঠিক ঐ দিনে (অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই তারিখে) তিনি সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই অনন্ত স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করিলেন।

কবিতাটির অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"ঐ দেখ কৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলি অন্তর্হিত হইতেছে, রজনীতে পুঞ্জীকৃত হইয়া তাহারা ধরাপৃষ্ঠ কি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল! তোমার

ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে জগৎ জাগরিত হইতেছে। বিহঙ্গগণ সমস্বরে গান করিতেছে ; কুসুমনিচয় তাহাদের শিশির-খচিত তারকা-প্রতিম মুকুটগুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া তোমাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে, বাপীসকল প্রেমভরে তাহাদের শত সহস্র কমলনয়ন বিস্ফারিত করিয়া তোমাকে হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে অভিবাদন করিতেছে।

"হে ত্বিষাম্পতে, স্বাগত! আজ তোমাকে নূতন করিয়া সম্ভাষণ করিতেছি। হে তপন! আজ তুমি স্বাধীনতা বিকিরণ করিতেছ। ভাব দেখি, জগৎ কিরূপে তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছিল, কত দেশদেশান্তর যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তোমার সন্ধান করিয়া আসিয়াছে?—কেহ কেহ বা গৃহপরিজন ছাড়িয়া ভীষণ জলধি ও গহন অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রতি পাদক্ষেপে জীবনমরণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অন্বেষণে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে!

"তারপর এক শুভ দিনে সেই শুভ কর্ম্মের ফল ফলিল, এবং উপাসনা, প্রেম ও ত্যাগব্রত সর্ব্বাঙ্গ হইয়া উদ্‌যাপিত এবং গৃহীত হইল। আর তখন তুমি প্রসন্ন হইয়া মানবজাতির উপর স্বাধীনতালোক বিকিরণ করিবার জন্য উদিত হইলে!

"চল প্রভো, তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে অমোঘ গতিতে চলিতে থাক, যত দিন না তোমার মধ্যাহ্ন কিরণ সমগ্র পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলে, যতদিন না নরনারী নিজ নিজ দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচিত দেখিতে পায়, এবং সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া অনুভব করে যে, তাহাদের মধ্যে যে নব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, উহা নব জীবনেরই সঞ্চার!"

শ্রীনগর হইতে ডালহ্রদের পথে এই উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীনগরে ফিরিবার সময়ে স্বামীজি বৈরাগ্যের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা সংসারকে সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাঁহাদের

উদ্দেশে অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "জনক রাজার কথা সকলেই বলে! জনকরাজা হওয়া, অনাসক্ত হয়ে রাজত্ব করা কি মুখের কথা! ধন, যশ, স্ত্রী-পুত্র কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নেই এমন ভাবে সংসার করা বড় সহজ নয়! ওদেশে সকলেই বলতো যে তার জনক রাজার অবস্থা লাভ হয়েছে। আমি বলতুম, 'এদেশের কথা কি? ভারতবর্ষেই জনকের মত লোক জন্মায় না!'" অন্যদিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, "মধ্যাহ্ন সূর্যের সঙ্গে জোনাকির, অনন্ত সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের, মেরুপর্ব্বতের মধ্যে একটা সরষে-দানার যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও সেই প্রভেদ।"* শেষে বলিলেন, "যারা সাধুতার ভান করে, তাদিগকেও তিনি আশীর্ব্বাদ করে থাকেন, কারণ তারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করছে, এবং নিজেরা না পারলেও অন্যের কৃতকার্য্যতার পথ পরিষ্কার করছে। যদি সন্ন্যাসের নিদর্শন 'গেরুয়া' না থাকতো, তাহলে বিলাসিতা ও সাংসারিকতা মানুষকে একেবারে অপদার্থ বর্ব্বর পশু করে ফেলতো।"

১৮ই জুলাই সকলে ইসলামাবাদ যাত্রা করিলেন। পরদিন অপরাহ্নে তাঁহারা বিবস্তাতটবর্ত্তী এক জঙ্গলের মধ্যে একটি পঙ্কিল পুষ্করিণীতে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় 'পাণ্ড্রেস্থান' ('পাণ্ড্রেস্থান'=পাণ্ডবদিগের স্থান?) মন্দির দর্শন করিলেন। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীজি সহযাত্রিগণের নিকট ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং সেই মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ সূর্য্যচক্র, সর্পবেষ্টনাবদ্ধ নরনারীমূর্ত্তিসমূহ ও অন্যান্য ভাস্কর্য্যাদি কিরূপে নিরীক্ষণ করিতে হয় তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মন্দিরের বাহিরে বুদ্ধের দণ্ডায়মান অবস্থার একটি সুন্দর মূর্ত্তি এবং তদীয় জননী মায়াদেবীর একটি ভগ্নমূর্ত্তি ছিল। মন্দিরটি বৃহদাকার প্রস্তর-নির্ম্মিত

* মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

এবং দেখিতে পিরামিডের ন্যায় ক্রমসূক্ষ্ম। ইহা মার্ত্তণ্ডমন্দির অপেক্ষা প্রাচীন, সম্ভবতঃ কণিষ্কের সমসাময়িক (১৫০ খৃঃ অঃ)।

স্বামীজির চক্ষে স্থানটি অতি মধুর পূর্ব্বকথার উদ্দীপনা করিয়া দিল। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ এবং তিনি ইতঃপূর্ব্বে কাশ্মীরের ইতিহাসকে যে চারিটি ধর্ম্মযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদেরই অন্যতম—

(১) বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ—এই সময় হইতেই নাগ-শব্দান্ত কুণ্ডনামগুলির প্রচলন, যথা 'বেরনাগ' ইত্যাদি; (২) বৌদ্ধধর্ম্মের যুগ, (৩) সৌর উপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের যুগ, এবং (৪) মুসলমানধর্ম্মের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্কর্য্যই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ শিল্প এবং সূর্য্যচিহ্নিত চক্র অথবা পদ্ম ইহার খুব সাধারণ কারুকার্য্যস্থানীয়। সর্পসম্বলিত মূর্ত্তিগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেকার যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে ভাস্কর্য্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, এইজন্য সূর্য্যমূর্ত্তিটি নৈপুণ্যবর্জ্জিত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে নৌকায় ফিরিলেন। সেই নির্জ্জন দেবমন্দির ও বুদ্ধের প্রশান্ত দেবমূর্ত্তি-দর্শনে স্বামীজির প্রাণ ভাবপ্রবাহে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সেদিন সন্ধ্যায় তিনি অবিশ্রান্ত নূতন নূতন ঐতিহাসিক তুলনাসমূহের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সহিত রোমান ক্যাথলিকদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাদৃশ্য দেখাইয়া বলিলেন, ক্যাথলিকরা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও রোমান ক্যাথলিকদের mass (পূজাপ্রকরণ) আছে, যেমন দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যাদি-ভোজ্য-নিবেদন, আবার উহাদের Blessed Sacrament (স্বর্গীয় প্রভুর ভোজ) আমাদের 'প্রসাদ'—তফাতের মধ্যে আমরা হাঁটু না গেড়ে বসে নিবেদন করি (গরমদেশের

ধারাই ঐ!) তবে তিব্বতের লোকে হাঁটু গাড়ে। তারপর বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপদান বাদ্যসঙ্গীত ইত্যাদি সবই আছে। এমন কি tonsure (মস্তকমুণ্ডন) পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তার সাক্ষী এখনও এদেশের মুণ্ডনপ্রথা। আর রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে monk (সন্ন্যাসী) আর nun (ব্রহ্মচারিণী)-এর মত এদেশেও বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব থেকেই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ছিল। তারপর বলিলেন, ইউরোপের লোকেরা Thebaid (প্রাচীন মিশরদেশীয় থীবেস শহরের অধিবাসী)-দের কাছ থেকে এই সন্ন্যাস জিনিসটা শিখিয়াছে।

স্বামীজির বিশ্বাস ছিল খ্রীষ্টান ধর্ম্মটা সবই আর্য্যধর্ম্মের ছায়ামাত্র—ভারতীয় ও মিশরীয় ভাবের সহিত ইহুদী ও গ্রীক ভাবের সংমিশ্রণ। যীশুর ঐতিহাসিকতাও ক্রীটের স্বপ্নের পর হইতে তিনি সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে বলিতেন, "সেণ্ট পলের অস্তিত্বসম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তিনিও কিছু স্বচক্ষে যীশুকে দেখেন নি, তবে যেন তেন প্রকারেণ লোককে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া ভাল মনে করে পুরানো ন্যাজারীন (Nazarene) ধর্ম্মসম্প্রদায়টাকে জাগিয়ে তুলে খ্রীষ্ট বলে একটা জিনিস খাড়া করলেন, যাকে অবলম্বন করে উপাসনা চলতে পারে। আর যীশুর নামে যত উপদেশ বেরিয়েছে তার উৎপত্তিস্থল ইহুদী পণ্ডিত হিলেল। তাঁরই উপদেশ যীশুর নামে চালান হয়েছে। আর 'পুনরুত্থান' ব্যাপারটা বাসন্তিক দাহ (Spring Cremation) নামক একটি প্রাচীন প্রথার নব সংস্করণমাত্র।

কিছুদিন হইল অক্সফোর্ডের ফ্রেড সি কনিবিয়ার এম এ, এফ বি এ প্রণীত 'দি হিস্টরিক্যাল ক্রাইষ্ট' নামক পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের (যথা, জে এম বরার্টসন, ডাঃ এ ড্রুস, প্রফেসর ডবলিউ বি স্মিথ) যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবিকল স্বামীজির মতের অনুরূপ।

স্বামীজি বলিতেন, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদের অস্তিত্ব-বিষয়ক ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। বুদ্ধসম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মনুষ্যজাতির মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কখনও নিজের জন্য একটি নিশ্বাস গ্রহণ করেন নি, কিংবা কখনও বলেন নি 'আমার পূজা কর'।" তিনি বলিতেন, "বুদ্ধ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট লোক নয়—একটা অবস্থা মাত্র। আমি দরজা খুঁজে পেয়েছি। তোমরা সব ভিতরে প্রবেশ কর।"

পরদিন নৌকায় যাইতে যাইতে অবন্তীপুরের দুইটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির তাঁহাদিগের নেত্রপথবর্ত্তী হইল।

২২শে তারিখে তাঁহারা ইস্‌লামাবাদে পৌঁছিলেন। পথে যাইতে যাইতে স্বামীজি বলিলেন, "গ্রীকই বল আর যাই বল, কোন জাতিই আজ পর্য্যন্ত জাপানীদের চেয়ে বেশী স্বদেশপ্রেম দেখাতে পারে নি। তারা কথা কয় না, কিন্তু কাজে দেখায়—কি করে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। জাপানী যুদ্ধের সময় জাপানের একটা লোকও স্বদেশদ্রোহী বলে ধরা পড়ে নি।"

যদিও স্বামীজি সাধারণতঃ গভীরভাবপূর্ণ কথাই বলিতেন, তথাপি তাঁহার বালকবৎ সরল হৃদয়ে উচ্ছল হাস্যকৌতুকের অভাব ছিল না। দিনরাত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না, কারণ তাঁহার স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন ছিল। তিনি কখনও গম্ভীর, কখনও বা রহস্যময় আমোদপ্রিয়—এই উভয় প্রকার ভাবের সমাবেশই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা কিন্তু ইহা আদৌ পছন্দ করেন না। ধর্ম্মোপদেষ্টা যে আবার ফষ্টিনষ্টি বা চাপল্য প্রকাশ করিবে ইহা তাঁহাদের একেবারে অসহ্য। তাঁহাদের একজন একবার স্বামীজিকে বলিয়াওছিলেন, "আপনি সাধারণ লোকের মত হাসি ঠাট্টা করেন, এটা কি ভালো?" স্বামীজি তাহাতে জবাব

দিয়াছিলেন, "আমরা জ্যোতির সন্তান, আনন্দের তনয়, আমরা কেন মুখ অন্ধকার করে থাকবো ?"

২৩শে তাঁহারা মার্ত্তণ্ডমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলেন। মন্দিরটির গথিক ধরণের নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়া স্বামীজি পূর্ত্তশিল্প-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকে মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে তাঁহারা ২৫শে অচ্ছাবল (অক্ষয় বল) নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এখানে স্বামীজি দুই-তিন সহস্র যাত্রীকে অমরনাথ গমন করিতে দেখিয়া স্বয়ং সেখানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যার সময় নৌকায় পৌঁছিয়া জিনিস-পত্র গোছান ও পত্রাদি লেখা হইল।

পরদিন বৈকালে সকলে বাওয়ান যাত্রা করিলেন। অমরনাথের দুর্গম পথে নিবেদিতা ব্যতীত স্বামীজির শিষ্যাগণের মধ্যে আর কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন না। স্থির হইল যতদিন স্বামীজি ফিরিয়া না আসেন ততদিন তাঁহারা পহলগামে অবস্থান করিবেন।

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী

হিমালয়ের তুষারাবৃত পথের মধ্য দিয়া শত শত যাত্রী অমরনাথ গুহাভিমুখে চলিয়াছে—সে এক অপরূপ দৃশ্য! হঠাৎ এক দিন দেখা গেল পাহাড়ের মাঝখানে নানা আকারের শত শত তাঁবু পড়িয়াছে, তার সঙ্গে দোকান-বাজার, ক্রেতা-বিক্রেতা—আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপে যেন একদিনে একটা শহর তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে। আবার তার পরদিন সকালে সব ফাঁক—কোথাও কিছু নাই। যাত্রীরা আবার চলিয়াছে। বড় মধুর যাত্রা। গৈরিক ছত্রের নিম্নে ভস্মাবৃতকলেবর সাধুর দল, সামনে ধুনি জ্বলিতেছে; কেহ ধ্যানে নিমগ্ন, কেহ শাস্ত্রালাপে রত, কেহবা একেবারে মৌন। কত বিভিন্ন রকমের বেশ, কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। কত দেশের কত প্রকারের নরনারী ও বালকবালিকা; কোথাও শিঙ্গা বাজিতেছে, কোথাও শাঁখ বাজিতেছে, কোথাও পাক হইতেছে, কোথাও অন্ধকার ভেদ করিয়া মশালের আলো জ্বলিতেছে। কেহ আনন্দে চীৎকার করিতেছে, কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে, কাহারও মুখে 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি। ভারতবর্ষ ছাড়া জগতের আর কোথাও এমন অদ্ভুত, পবিত্র, মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবতার দর্শনলাভের জন্য এমন ব্যাকুলতা, এমন কষ্টস্বীকার, এমন উন্মত্ততা অন্য কোন দেশে নাই। এইখানেই বুঝিবে হিন্দুর হিন্দুত্ব—এইখানেই বুঝিবে এত ঝড় ঝাপ্‌টা সহ্য করিয়াও কেন এ জাতি আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছে —এ শুধু ধর্ম্মবলে। ভক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম্মপ্রাণতা ইহাই এ জাতির বিশেষত্ব।

পরমহংসদেবের নিকট স্বামীজি ধর্ম্মাচরণের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রতি

খুঁটিনাটি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সব কাজ যাহাতে শাস্ত্রানুযায়ী বা পরম্পরাগত প্রথানুযায়ী সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। তীর্থযাত্রাকালে তিনি স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় গঙ্গাস্নান করিয়া, ফলফুল লইয়া অভুক্ত অবস্থায় পূজাদি শেষ করিয়া বিগ্রহের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন এবং মালাজপ বা প্রদক্ষিণাদি কোন কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিতেন না। ইহাতে অবশ্য অনেকে, বিশেষতঃ তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যেরা অনেক সময় আশ্চর্য্য বোধ করিতেন। তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না যে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের পক্ষে পূজাপ্রদক্ষিণাদি নিম্নাঙ্গের অনুষ্ঠানসমূহের আবশ্যকতা কি? কিন্তু তিনি গড়া জিনিস ভাঙ্গিতে ভালবাসিতেন না। শত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে ভাবে, যে সকল আচরণ বা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কোটি কোটি হিন্দুর ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তিনি অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। এ সকল ধর্ম্মের বহিরঙ্গ হইলেও তাঁহার নিকট অবহেলা বা অবজ্ঞার বিষয় ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি বুঝিতেন যে, এই সকল নিয়ম পালন দ্বারা তাঁহার পক্ষে এদেশের নরনারীর হৃদয়স্পর্শ করা যত সহজ হইবে, ইহাদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করিয়া শুধু বড় বড় জ্ঞানের কথা প্রচার করিলে তাহার শতাংশের একাংশও হইবার সম্ভাবনা নাই। আর তা ছাড়া যাঁহারা চরম অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল বাহ্যপূজাদি বিশেষ উপযোগী। তাঁহাদিগের মনে যাহাতে এই সকলের উপর শ্রদ্ধা শিথিল না হইয়া দৃঢ় হয় তজ্জন্যও তিনি ঐ সকল নিজে অনুষ্ঠান করিতেন।

এবারেও তাহাই হইল। প্রথম হইতেই ইউরোপীয়েরা স্বামীজির ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন তিনি অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের ন্যায় সকল প্রকার কঠোর আচরণ পালন করিতেছেন—একসন্ধ্যা আহার,

বাক্‌সংযম, একান্তে অবস্থান, মালাজপ ও ধ্যান এই সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগী।

সন্ন্যাসিগণের উপরও স্বামীজির প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। প্রথমে অবশ্য তাঁহারা তাঁহার সঙ্গের বিদেশী লোকগুলিকে দেখিয়া নানা ওজর আপত্তি করিতেছিলেন। প্রধান আপত্তি এই যে, হিন্দুযাত্রীদের তাঁবুর নিকট ম্লেচ্ছ শ্বেতাঙ্গদের তাঁবু পড়িবে কেন?—উহারা তফাত যাউক। সঙ্কীর্ণতা স্বামীজি কোন কালেই দেখিতে পারিতেন না, সুতরাং প্রথম প্রথম এ সকল কথা গ্রাহ্য করিলেন না, ইচ্ছা করিয়াই সকলের মাঝখানে আপনাদের তাঁবু ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে একজন নাগা সাধু আসিয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "স্বামীজি, স্বীকার করি আপনার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তাহা দেখান কি উচিত?" স্বামীজি কথাটা বুঝিলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁবু সরাইবার আদেশ দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরদিবস হইতে সাধুদের সব আপত্তি চলিয়া গেল, তাঁহারা সসম্মানে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ও নিবেদিতার তাঁবু সকলের অগ্রে উত্তমস্থান দেখিয়া স্থাপিত হইতে লাগিল। ইহার পর অবশিষ্ট পথ, দলে দলে সাধু আসিয়া তাঁহার তাঁবু ঘিরিয়া ফেলিত ও তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আনন্দে অতিবাহিত করিত। অনেকে তাঁহার উদার ভাব ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতি বুঝিতে পারিতেন না। একজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর (তহশীলদার) উপর এই তীর্থযাত্রার সকল ভার অর্পিত ছিল। তিনি এবং তাঁহার অধীনস্থ অন্যান্য কর্ম্মচারীরা স্বামীজির ব্যবহারে এত প্রীত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কথা শুনিতে ও খবর লইতে আসিতেন, এবং শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও আপন সৌজন্য ও মধুর প্রকৃতিতে

শীঘ্রই সাধুদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের সহানুভূতি ও কৃপালাভে সমর্থ হইলেন।

চন্দনবাড়ীতে পৌঁছিয়া স্বামীজি নিবেদিতাকে একটি তুষারনদী খালি পায়ে হাঁটিয়া পার হইতে বলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। ইহার পরেই একটা কয়েক হাজার ফুট উঁচু চড়াই পড়িল। তারপর আর একটা চড়াই। উঠিতে উঠিতে সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অতি কষ্টে টানা হিঁচড়া করিয়া ১৮০০০ ফুট উপরে উঠিয়া তুষারশৃঙ্গের মধ্যে তাঁহাদের ছাউনী পড়িল। পরদিবস সকালে আবার চড়াই ভাঙ্গিতে হইল। অবশেষে তাঁহারা এমন স্থানে পৌঁছিলেন যেখান হইতে 'লিডার' নদীর উৎপত্তিস্থল ৫০০ ফুট নীচে পড়িয়া গেল। সে স্থানটি বরফের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। পরদিন হিমশৃঙ্গ ও হিমনদী অতিক্রম করিয়া যাত্রিদল 'পঞ্চতর্নী' (পাঁচটি নদীর সম্মিলন) নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এখানে প্রত্যেক নদীতে স্নান করার বিধি। সুতরাং স্বামীজিও সশিষ্য সেই ভয়ানক শীতেও ভিজা কাপড়ে এক নদী হইতে আর এক নদীতে গিয়া স্নান করিতে লাগিলেন।

২রা আগষ্ট অমরনাথের দিন। একটা প্রকাণ্ড চড়াইয়ের পর আবার উতরাই। এক পা এদিক ওদিক হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু। যাত্রীরা হিমনদীর ধার দিয়া বহু ক্রোশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি খরস্রোতা গিরিনদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এইখানেই স্নান করিয়া আর একটা চড়াই ভাঙ্গিতে হয়, তারপর গুহার দ্বারদেশে পৌঁছান যায়। স্বামীজি পিছনে পড়িয়াছিলেন। নিবেদিতা আগে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে অগ্রসর হইতে বলিয়া নিজে স্নান করিতে গেলেন, এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহাটি প্রকাণ্ড। তাহার মধ্যে

অন্ধকারময় একস্থানে বিরাট তুষারবিগ্রহ। স্বামীজির সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখা, পরিধানে মাত্র একটা কৌপীন। মুখমণ্ডল ভক্তিভাবে প্রোজ্জ্বল। তিনি সাষ্টাঙ্গ হইয়া দেবতা প্রণাম করিলেন। গুহামধ্যে শত শত কণ্ঠে দেবতার স্তুতিনিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিয়া এবং শুভ্রস্বচ্ছ বিগ্রহের পবিত্র ও জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া তিনি ভাবে তন্ময় হইয়া প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সহসা ধর্ম্মরাজ্যের এক গূঢ় দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ইহার সম্যক্ বিবরণ তিনি কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। শুধু বলিয়াছিলেন যে স্বয়ং অমরনাথ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয় শিবের কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় যে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছিল, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া পূর্ব্বোক্ত সহৃদয় নাগাসন্ন্যাসী ও নিবেদিতার সহিত জলযোগ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ কি আনন্দই লাভ করিয়াছি! এই তুষার-লিঙ্গরূপী শিবমূর্ত্তি ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ। এখানে চোর নাই, ব্যবসাদার নাই, আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই এত আনন্দ পাই নাই।" অন্যান্য শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদিগকেও তিনি পরে প্রায়ই এই চিত্ত-বিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন। উহা যেন তাঁহাকে একেবারে আপন ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এই অনুভূতির প্রভাব তাঁহার দুর্ব্বল শরীরের উপর এতটা অবসন্নতা আনিয়াছিল যে তিনি পরে বলিতেন, পাছে তিনি গুহামধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এইজন্য অতি সাবধানে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এরূপ অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন, "ঐ দিন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতি একেবারে

রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া উহার আয়তনটি চিরদিনের মত বাড়িয়া গিয়াছে।”

দেবতার সাক্ষাৎকার তাঁহার অন্তঃকরণের উপরও এতদূরপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে শিব ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ ছিল না। অনন্তের ধ্যানমগ্ন মহাযোগী শিব চিরদিনই তাঁহার আদর্শ উপাস্য—অমরনাথে সেই ভাবের চরম অনুভূতি।

অতঃপর অমরনাথ হইতে তাঁহারা নীচে নামিতে লাগিলেন। ৮ই আগষ্ট পহলগাম হইয়া শ্রীনগরে পৌঁছিলেন ও ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সেখানে রহিলেন। পহলগামেই অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীনগরে স্বামীজি পূর্ব্ববৎ নৌকায় বাস করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনতার আকাঙ্ক্ষায় শিষ্যদিগের নৌকার নিকট হইতে নিজের নৌকা সরাইয়া অনেক দূরে লইয়া যাইতেন। কারণ এই কালে তাঁহার ধ্যানের গভীরতা ও অন্তর্লীন অবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। মাঝে মাঝে যখন শিষ্যদিগের নিকট ফিরিতেন তখন আবার তাঁহাদিগকে উপদেশাদি দিতেন ও নানাপ্রকার সরস আলাপে তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। একদিন বলিলেন, স্বদেশ এবং উহার ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সমন্বয়মূলক, তবে তাঁহার নিজের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা এইটুকু যে হিন্দুধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় না হইয়া সক্রিয় হউক এবং ছুঁৎমার্গকে পরিহার করুক। এতদ্ব্যতীত যদি অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার ইহার সামর্থ্য থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। তৎপরে তিনি গভীর ভাবের সহিত যাঁহারা খুব প্রাচীনপন্থী তাঁহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে বলিলেন যে, ভারতের এখন চাই কর্ম্মতৎপরতা, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাতন চিন্তাশীলতাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। চাই উভয়ের সম্মিলন। উদাহরণস্বরূপ বলিলেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভিতরের

অন্তস্তম তত্ত্বগুলির পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিতেন; তথাপি বাহিরে তিনি পুরাদস্তুর কর্ম্মতৎপর ও কর্ম্মপটু ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে 'সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার' হওয়াই আদর্শ। ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিক আলোচনা, স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা, আবার তুরীয় অবস্থা প্রভৃতি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রসঙ্গও হইত। একদিন মধ্যাহ্নভোজনে শিষ্যদিগের ক্ষুদ্র ছাউনীটিতে আসিয়া দেখিলেন, নিকটে একখানি টডের 'রাজস্থান' পড়িয়া রহিয়াছে। উহা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "বাংলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত হইয়াছে।" তারপর মীরাবাঈ, প্রতাপসিংহ, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতির গল্প করিতে লাগিলেন। মীরাবাঈসম্বন্ধে এই গল্পটি বলিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন,—মীরাবাই বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসি-শিষ্য, বাঙ্গলার নবাবের ভূতপূর্ব্ব উজীর সনাতন দাসকে নিমন্ত্রণ করেন। বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত স্ত্রীগণের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এই কারণে তিনি যাইতে অস্বীকার করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল তখন মীরাবাঈ—"বৃন্দাবনে কেহ পুরুষ আছে তাহা জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে এখানে বিরাজ করিতেছেন।" এই বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং যখন বিস্মিত সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি 'নির্ব্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর?'—এই বলিয়া স্বীয় অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিও মাতা যেরূপ সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করেন, সেইরূপে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মীরাবাঈয়ের দৈন্য, প্রার্থনাপরতা, সর্ব্বজীবসেবা-প্রচার এবং রাজ্ঞী হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমে রাজপদ ত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ স্বামীজিকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল।

মীরাবাঈয়ের এই গানটি আবৃত্তি করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন এবং তাহা অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন—

হরিষে লাগি রহোরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই।
সুগা পড়ায়কে গণিকা তারে তারে মীরাবাঈ॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা বনিয়া বৈল চরাই।
এক বাতকা টাণ্টা পড়েতো খোঁজ খবর না পাই॥
ঐসী ভক্তি ঘট্ ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দি ঔর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই॥

অর্থাৎ লাগিয়া থাক ভাই, হরিপাদপদ্মে লাগিয়া থাক। সেই অঙ্কা বঙ্কা নামক দস্যু ভ্রাতৃদ্বয়, সেই নিষ্ঠুর কসাই সুজন এবং যে খেলার ছলে তাহার টিয়া পাখীকে কৃষ্ণনাম শিখাইয়াছিল সেই গণিকা, ইহারা যদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবে সকলেরই আশা আছে। টাকা কড়ি সংসার এক কথায় সব উড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ছল চাতুরী ছাড়, ভক্তিই সার কর। সেবা, বন্দনা আর আত্মসমর্পণ হইতেই রঘুমণি ধরা দিবেন।

কাশ্মীরে আসার পর স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গীরা শ্রীনগরের মহারাজের নিকট হইতে যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন। বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা প্রায়ই তাঁহার ডোঙ্গায় আসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ ও অন্যান্য গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। স্বামীজি মহারাজের বিশেষ আহ্বানে কাশ্মীরে একটি মঠ ও সংস্কৃত-অধ্যাপনার স্থান নির্ব্বাচন করিতে গমন করিয়াছিলেন। নদীতীরে ইউরোপীয়দিগের শিবিরসংস্থাপনের জন্য একটি সুন্দর স্থান ছিল। স্বামীজি এই স্থানটি মনোনীত করিয়াছিলেন এবং মহারাজও তাঁহাকে উহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে অনেকেই ধ্যানধারণা-অভ্যাসের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় স্বামীজি তাঁহাদিগকে প্রস্তাবিত মঠের জায়গায় গিয়া ধ্যানধারণাদিতে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে তাঁহাকে সরকার হইতে জানান হইল যে, ঐ স্থান মঠ বা সংস্কৃত বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য দেওয়া হইবে না, কারণ রাজ-দরবারে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র রেসিডেন্ট ট্যালবট সাহেব দুই দুই বার উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন ও শেষবারে উহা একেবারে নামঞ্জুর করিয়াছেন। সুতরাং উহার ভালমন্দ-বিচার সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। স্বামীজি প্রথমতঃ এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার মনে হইল যখন সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা, তখন যাহা হইয়াছে তাহা ভালর জন্যই হইয়াছে। মোটের উপর বুঝিলেন কাশ্মীর বা অন্য কোন দেশীয় রাজার রাজ্যে কার্য্যারম্ভ সুবিধাজনক হইবে না, বরং সকল দিক হইতে বিবেচনা করিলে বাঙ্গালাদেশ, বিশেষতঃ রাজধানী কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানই তাঁহার কার্য্যের কেন্দ্রস্থল হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

২০শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার কন্সাল জেনারেল ও তৎপত্নীর আমন্ত্রণে তিনি দুই দিন ডালহ্রদের তটে রহিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার মন শিবভাবের পরিবর্ত্তে শক্তিভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার মুখে সদাসর্ব্বদা রামপ্রসাদী সঙ্গীত শুনা যাইত। যখন তিনি তাঁহার মুসলমান মাঝির চারিবৎসরবয়স্কা শিশুকন্যাকে উমারূপে পূজা করিতেন তখন দর্শকদিগের হৃদয় ভাবে দ্রবীভূত হইত। একদিন তিনি শিষ্যদের বলিলেন, "যে দিকে ফিরিতেছি কেবল মার মূর্ত্তি দেখিতেছি। তিনি যেন আমাকে ছোট ছেলের মত হাত ধরিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন।" একদিন তিনি আপন নৌকা সরাইয়া একটি নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন। এই সময়ে

একজন ব্রাহ্ম ডাক্তার ব্যতীত আর কাহারও তাঁহার নিকট যাইবার আদেশ ছিল না। এই ব্যক্তি স্বামীজিকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সংবাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু স্বামীজিকে প্রায়ই ধ্যানস্থ দেখিতে পাইতেন বলিয়া কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে নৌকা হইতে চলিয়া যাইতেন। স্বামীজি তখন জগজ্জননীর ধ্যানে চব্বিশ ঘণ্টা বিভোর। মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝড় বহিতেছে। এ অবস্থায় হয় তত্ত্বপ্রকাশ, না হয় মনের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

একদিন সন্ধ্যায় তাহাই হইল। বহুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে যে অবস্থা হইয়াছিল, এদিনও সেই অবস্থা হইল। জগৎসংসার সব উড়িয়া গেল। অন্তররাজ্য স্তব্ধ, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ যেন বিদ্যুদ্বেগে ঘন ঘন কম্পমান। জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালে যে দুর্জ্ঞেয় শক্তি বিরাজমানা তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তিনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন, সে দর্শনে বিশ্ব-কাব্যের অনন্তরাগিণী হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল, বিশ্বতত্ত্বের অমল আলোকরশ্মি তাঁহার প্রতি দ্বার উদ্ভাসিত করিল। তিনি যেন কিছু লিখিবেন বলিয়া হাত বাড়াইয়া কলমের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই অবস্থায় 'Kali the Mother' (মৃত্যুরূপা মাতা) নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটি যন্ত্রচালিতবৎ লিখিয়া গেলেন। লেখা শেষ হইলে কলমটি হাত হইতে পড়িয়া গেল। তিনিও ভাবসমাধিস্থ হইয়া মূর্ছিতের ন্যায় গৃহতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

অমরনাথ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামীজি প্রায় মাতৃভাবের সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন; বলিতেন, তিনি কাল, তিনি পরিবর্ত্তন, তিনি অনন্ত শক্তি। মা যে শুধু দয়াময়ী সুখবিধায়িনী নহেন, তিনি যে ভীমা মৃত্যুরূপা দুঃখদাত্রী রোগশোকসন্তাপের জননী—এইভাবে মাকে ধারণা করিতে তিনি পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "ভীমার

উপাসনা দ্বারাই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর; লোলরসনা করালিনীকে ধ্যান কর। মা-ই স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁহার অভিশাপও আশীর্ব্বাদ। হৃদয়টাকে শ্মশান করিয়া ফেল। তবে মার দেখা পাইবে।" তাঁহার 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটিতেও এই ভাবই পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত-বিহঙ্গম সঙ্গীত-সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার ॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্নতপনজ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো ॥
সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর, দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা ॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়া দেয় বাঁশী ॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী, তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া ॥"

বাস্তবিক জীবমাত্রেই সুখের জন্য পাগল। সুখদুঃখমিশ্রিত এই পরীক্ষাগারে দুঃখ ছাড়িয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত শুধু সুখ-মদিরার সন্ধানেই ফিরিতেছে—জানে না যে, 'দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি-চিতামাঝে' দুঃখও তাঁহারই দান, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাই স্বামীজি তাঁহাকে বলিতেছেন—'মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে।' আর সুখমৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ, দুঃখ-ভীত বঙ্গীয় যুবকগণকে জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"ভাঙ্গ বীণা, প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া ॥"

এই সময়ে এবং পরেও অত্যন্ত পীড়া বা শারীরিক যন্ত্রণার সময় তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন, 'তিনিই ইন্দ্রিয়, তিনিই কষ্ট, আবার তিনিই কষ্ট দিচ্ছেন। কালী, কালী, কালী।' বলিতেন, "ভয় ত্যাগ কর। কিসের ভয়! ভিক্ষা নয়—জোর করে নিতে হবে। যারা প্রকৃত মার ভক্ত তারা পাথরের মত শক্ত, সিংহের মত নির্ভীক। বিশ্বসংসার যদি রেণু রেণু হয়ে পায়ের তলায় চূর্ণ হয়ে পড়ে, তবুও ভক্ত টলে না। মাকে তোমার কথা শুনতে বাধ্য কর। তাঁর কাছে খোশামোদ কি? জবরদস্তি। তিনি সব করতে পারেন। নোড়ানুড়ির ভেতর থেকেও মহাবীর্য্যবানের সৃষ্টি করতে পারেন।

"যে হৃদয়ে ভয় নেই, সেইখানেই তিনি আছেন। যেখানে ত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, মরণকে আলিঙ্গনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—সেইখানেই 'মা'।"

৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামীজি আবার সহসা অদৃশ্য হইলেন। বলিয়া গেলেন, কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ না করে। তিনি ক্ষীরভবানীর বিচিত্রবর্ণশোভিত নির্ঝরিণী দেখিতে গিয়াছিলেন, ৬ই অক্টোবরের পূর্ব্বে সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। দেবীর সম্মুখে তিনি প্রত্যহ হোম করিতেন এবং এক মণ দুগ্ধ হইতে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তণ্ডুল, বাদাম প্রভৃতির সহিত ভোগ দিতেন এবং বহুক্ষণ বসিয়া সাধারণ ভক্তের ন্যায় মালাজপ করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিশুকন্যাকে কুমারী উমারূপে পূজা করাও তাঁহার উপাসনার বিশেষ অঙ্গ ছিল। এখানে কয়দিন স্বামীজি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকার জন্য কর্ম্মাসক্তির যে একটা পর্দা তাঁহার মনের উপর পড়িয়াছিল সেটাকে তিনি যেন ছিন্ন করিতে চাহিতেছিলেন। এখন আর তিনি কর্ম্মী, উপদেষ্টা বা জননায়ক নহেন। এখন তিনি শুধু সন্ন্যাসী—মার নিকট ছোট ছেলেটি।

যেদিন স্বামীজি শ্রীনগরে প্রত্যাগমন করিলেন সেদিন তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ও পবিত্রতা নিরীক্ষণ করিয়া শিষ্যগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মধ্যে আরও মহত্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি হস্তপ্রসারণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নৌকায় প্রবেশ করিলেন এবং মার প্রসাদী গাঁদাফুলের মালা প্রত্যেক শিষ্যের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, "এখন আর 'হরি ওঁ' নয়—এখন শুধু 'মা'। আমি বড় অন্যায় করিয়াছি! মা আমায় বল্লেন, 'বিধর্ম্মী বা বিশ্বাসহীনেরা যদি আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার মূর্ত্তি কলুষিত করে তাতেই বা কি—তোর তাতে কি? তুই আমায় রক্ষা করছিস, না আমি তোকে রক্ষা করছি?' সুতরাং আর আমার স্বদেশের ভাবনা ভাবার কি দরকার? আমি ত ক্ষুদ্র শিশু মাত্র।" যে ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি এই কথা বলিলেন সে ঘটনাটি এই—ক্ষীরভবানীর মন্দিরে একদিন তিনি মুসলমানদিগের অত্যাচারে বিধ্বস্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও প্রতিমার দুর্দ্দশাদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, 'কেমন করে লোকে এসব অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে? প্রতীকারের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি! আমি যদি সে সময়ে থাকতুম, কখনও এরকম হতে দিতুম না। প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা করতুম।' ঠিক সেই সময়ে উপরোক্ত দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হয়। কিঞ্চিৎ পরে তিনি আবার আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি তিনি নিজে একটি নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন তাহা হইলে বড় সুখের বিষয় হইত। আবার সহসা মার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিলে, স্পষ্ট শুনিলেন মা বলিতেছেন, "বৎস! আমি মনে করিলে অসংখ্য মন্দির ও মঠ স্থাপন করিতে পারি। এই মুহূর্ত্তেই এখানে প্রকাণ্ড সপ্ততল সুবর্ণ-মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে।" এই দৈববাণী-শ্রবণাবধি স্বামীজি মন হইতে সকল

সংকল্প পরিত্যাগ করেন, বুঝিলেন মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। শিষ্যেরা এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে নিঃশব্দে উপবিষ্ট রহিলেন, সমুদয় স্থানটি যেন কিয়ৎক্ষণ এক মৌন চিন্তায় নিমগ্ন রহিল। স্বামীজি বলিলেন, "এখন আর এর বেশী কিছু বলতে পারছি না। বলার আদেশ নেই।"*

এখন হইতে যদিও শিষ্যেরা বরাবর স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার চেষ্টা করিতেন, তথাপি তাঁহাকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। তিনি প্রায়ই একাকী চিন্তামগ্ন অবস্থায় বহুক্ষণ ধরিয়া নদীতটে ভ্রমণ করিতেন। এরূপ তন্ময় থাকিতেন যে, অনেক সময়ে নৌকার ছাদে উপবিষ্ট শিষ্যগণকে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেন না। একদিন হঠাৎ মস্তক মুণ্ডন করিয়া সামান্য সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া হাজির হইলেন, মুখে তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। 'Kali the Mother' (মৃত্যুরূপা মাতা) হইতে আবৃত্তি করিতে করিতে বলিলেন, 'এর প্রত্যেক কথাটি সত্য। আর আমি তা কাজেও প্রমাণ করেছি—দেখ আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।'

১১ই অক্টোবর সকলে বারামুল্লায় ফিরিয়া আসিলেন ও পরদিন লাহোর যাত্রা করিলেন। স্বামীজি এখান হইতে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণ উত্তরভারতের অন্যান্য স্থান দর্শন করিবার জন্য এখানে স্বামী সারদানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামী

---

* ক্ষীরভবানীতে গভীর অন্ধকার রাত্রে উগ্র তপস্যা করিতে করিতে স্বামীজির আরও যেসকল অদ্ভুত দর্শন ও অনুভূতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস তিনি দুই-এক জন গুরুভ্রাতাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের সেসকল নিগূঢ় রহস্য সর্ব্বসাধারণের গোচর করা অনুচিত বিবেচনায় তাহা গোপন করা হইয়াছে। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্বামীজির সমুদয় প্রকৃতি এই সময়ে মায়িক সংস্কারসমূহের উর্দ্ধে উঠিবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতেছিল।

সারদানন্দ স্বামীজির সহিত কাশ্মীরে মিলিত হইবার জন্য ২৭শে সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বামীজি এক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একজন মুসলমান ফকিরের কোন চেলা মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট আসিত। একদিন তাহার ভয়ানক জ্বর ও শিরোবেদনা হইয়াছে শুনিয়া স্বামীজি দয়ার্দ্র হইয়া তাহার মাথায় আঙ্গুল দিয়া কয়েক মিনিট টিপিয়া ধরিলেন, তাহাতে সে ব্যক্তির অসুখ সারিয়া যায়। লোকটি ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সেই হইতে ঘন ঘন তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করে ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। ইহাতে তাহার গুরু সেই মুসলমান ফকির চেলা বেহাত হইয়া যায় ভাবিয়া স্বামীজি সম্বন্ধে অনেক কটূক্তি করেন এবং শিষ্যকে স্বামীজির নিকট যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। এতদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ফকির স্বামীজিকে নানাপ্রকার গালি দেন এবং নিজের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন যে, কাশ্মীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই স্বামীজি বিষম বমন ও শিরোঘূর্ণন-রোগে আক্রান্ত হইবেন। প্রকৃতই তদ্রূপ হইল। স্বামীজি ইহাতে বড় বিরক্ত হইলেন—ফকিরের উপর নহে, কিন্তু নিজের উপর। বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমার কি করলেন? বেদান্ত-প্রচার আর অদ্বৈতানুভূতি করেও যদি একটা বাজীওয়ালার কবল থেকে নিজেকে রক্ষে করতে না পারলুম, তবে আর কি হল?" কিন্তু স্বামীজি বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যকেও কাপালিকের হস্তে এবং স্বয়ং পরমহংস-দেবকেও হলধারীর হস্তে ঠিক এইরূপ নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছিল।

বেলুড় মঠ-প্রতিষ্ঠা

১৮৯৮ সনের ১৮ই অক্টোবর স্বামীজি বেলুড় মঠে ফিরিলেন। মঠের কেহ তাঁহার আগমনসংবাদ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই প্রথমে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার শরীরের অবস্থাদর্শনে সে আনন্দ শীঘ্রই বিষাদে পরিণত হইল।

স্বামীজি ভগ্ন দেহ লইয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মালোচনা, শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা, প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল এবং মঠবাসীদের জীবনগঠনের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। তিনি মঠে সন্ন্যাসীদের জন্য অনেকগুলি নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিলেন এবং পড়াশুনা সাধনা প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

১২ই নভেম্বর ৺কালীপূজার দিন স্বয়ং মাতাঠাকুরাণী কয়েকজন মহিলাভক্তসঙ্গে মঠের জায়গা দেখিতে আসিলেন, সাধুরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং পূজা ও ভোগের বিস্তৃত আয়োজন হইয়াছিল। বৈকালে মা-ঠাকুরাণী, তাঁহার সহযাত্রী মহিলাগণ, স্বামীজি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং সারদানন্দ কলিকাতায় ফিরিয়া বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদান করিলেন। মা-ঠাকুরাণী এই বিদ্যালয়ের উপর ভগবতীর মঙ্গলাশিস প্রার্থনা করিলেন।

নিবেদিতা এই সময় হইতে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

৯ই ডিসেম্বর মঠস্থাপনা উপলক্ষে উৎসব হইল, স্বামীজি স্বয়ং প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় বিল্বদল ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যান-পূজাবসানে স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি লইয়া অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ সহ শঙ্খঘণ্টারোলে গঙ্গাতট মুখরিত করিয়া নূতন মঠভূমিতে উপনীত হইলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই যাবো ও থাকবো। তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি!' সে জন্যই আজ আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্য্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।" তারপর বলিলেন, "এই যে আমাদের মঠ হচ্ছে, এতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে; এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।" নূতন মঠভূমিতে উপস্থিত হইয়া তিনি স্কন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন। অনন্তর স্বামীজি পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সাহায্যে স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। তারপর সাদরে অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল বহুজনসুখায় বহুজন-হিতায় এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়কেন্দ্র করিয়া রাখেন।" সকলেই করযোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলে স্বামীজি শিষ্য শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ঐ কৌটা উঠাইয়া পুনরায় নীলাম্বর বাবুর বাগানে লইয়া যাইতে বলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলেই এই কার্য্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামীজি শরৎ বাবুকে বলিলেন,

"ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল। আমার মনে এখন কি হচ্ছে জানিস? এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মত ধার্ম্মিক গৃহস্থেরা ইহার চারদিকের জমিতে ঘরবাড়ী করে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে। এরূপ হলে কেমন হয় বল দেখি?" শরৎ বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা।" তদুত্তরে স্বামীজি বলিলেন, "কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আমি ত পত্তন করে দিচ্ছি। এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাব, আর তোদের ভিতর নানা ভাব দিয়ে যাব। তোরা পরে সেসব কাজে পরিণত করবি। বড় বড় তত্ত্ব কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে কার্য্যতঃ দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? সেগুলি আগে বুঝতে হবে—তারপর জীবনে ফলাতে হবে। বুঝলি? একেই বলে কর্ম্মজীবনে পরিণত ধর্ম্ম।"

এই সালের এপ্রিল মাস হইতে মঠের গৃহাদি-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নামক ঠাকুরের একজন ভক্ত ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইনি পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন) এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। যদিও ৯ই ডিসেম্বর (১৮৯৮) ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হইল এবং কয়েক জন সন্ন্যাসী এখন হইতেই মঠের নূতন বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন, তথাপি পর বৎসর জানুয়ারী পর্য্যন্ত মঠ নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতেই রহিল।

রোগবৃদ্ধি

স্বামীজির শরীর ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। হাঁপানীর টানে তিনি বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। ২৭শে অক্টোবর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর এল দত্তের নিকট তাঁহার বক্ষ পরীক্ষা করান হইল। তিনি ও কবিরাজগণ সকলেই বলিলেন যে, খুব সাবধানে না থাকিলে পীড়া সাংঘাতিক হইবার সম্ভাবনা। এ সময়ে স্বামীজির চিত্ত বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই হয় ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন, দশ-বার বার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইলেও হয়ত তিনি পুনরায় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেন; উত্তর তাঁহার কর্ণেও পৌছাইত না।

কাশ্মীর হইতে ফিরিবার দুই-তিন দিন পরে স্বামিশিষ্য-সংবাদ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন মঠে আসিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে স্বামীজির সহিত দেখা করিতে ও যাহাতে স্বামীজি উচ্চ ভাবভূমি হইতে কিঞ্চিৎ নামিয়া আসেন তাহার জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। শরৎ বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্বামীজি পূর্ব্বাস্য হইয়া আসনে উপবিষ্ট, মন অন্তর্মুখী। স্বামীজি তাঁহার গৃহপ্রবেশ প্রথমে লক্ষ্যই করেন নাই। শরৎ বাবু দেখিলেন তাঁহার বামচক্ষুর একস্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি করিয়া হইল। স্বামীজি বলিলেন, "ও কিছু নয়। হয় ত ক্ষীরভবানীতে একটু জোরে তপস্যা করার দরুণ হয়েছে।" তাঁহার মনকে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে শরৎ বাবু তাঁহাকে তীর্থযাত্রার গল্প শুনাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। ইহাতে স্বামীজির যেন অনেকটা বাহ্য চৈতন্য হইল। তিনি গল্প করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অমরনাথ থেকে আসা অবধি শিব মাথায়

চড়ে বসেছেন, কিছুতেই সেখান থেকে নড়তে চাচ্ছেন না।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "অমরনাথে যাবার সময় এমন সব উঁচু উঁচু জায়গায় উঠেছিলুম, যেখানে কোন যাত্রীরা যায় না। সেই নির্জ্জন পথে হাঁটবার জন্য আমার কেমন একটা ঝোঁক চেপেছিল। সে সময় শরীরবোধ ছিল না। মনটা কেবল শিবময় হয়ে গেছলো। সেই গুরুতর পরিশ্রমে শরীরটা জখম হয়েছে। সেখানে এত শীত যে গায়ে যেন হাজার হাজার ছুঁচ ফুটিয়ে দিত। যাবার সময় কিন্তু শীত গ্রীষ্ম কিছু বোধ ছিল না। সর্ব্বাঙ্গে ছাই মেখে একখানা কৌপীন এঁটে গুহার মধ্যে ঢুকেছিলুম। কিন্তু যখন বেরিয়ে আসি তখন শীতে হাত পা একেবারে অসাড়।"

শরৎ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "শোনা যায় যে অমরনাথের গুহায় এক রকম সাদা পায়রা আছে, তাদের যারা দেখতে পায় তাদেরই তীর্থযাত্রা সফল হয় ও সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আপনি কি ওরকম কোন পায়রা সেখানে দেখেছিলেন?" স্বামীজি বলিলেন, "হাঁ হাঁ, জানি। আমি ৩।৪টা সাদা পায়রা দেখেছি, কিন্তু তারা মন্দিরের ভিতর থাকে, কি কাছাকাছি পাহাড়ে থাকে তা বলতে পারি না।"

তারপর ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দৈববাণীর কথা উঠিল। শরৎ বাবু বলিলেন, "সম্ভবতঃ উহা আপনার নিজেরই চিন্তার প্রতিধ্বনিমাত্র—সম্পূর্ণ ভেতরের জিনিস, বাইরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।" স্বামীজি উত্তর করিলেন, "আমার ভেতর থেকেই হোক বা বাহির থেকেই আসুক কিন্তু তুমি যদি স্বকর্ণে শোন (যেমন এখন আমার কথা শুনছ) যেন একটা শব্দ আকাশ থেকে আসছে, অথচ কোন লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে কি তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতে পার?"

পরে শরৎ বাবু স্বামীজিকে 'ভূতযোনি দেখিয়াছেন কিনা' জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজি উত্তর দেন যে মাঝে মাঝে একজন আত্মীয়ের প্রেতাত্মা

তাঁহাকে দর্শন দিতেন ও দূরের সংবাদাদি আনিয়া দিতেন, কিন্তু সব সময় তাঁহার কথা সত্য প্রমাণ হইত না। একবার কোন তীর্থে স্বামীজি উক্ত প্রেতাত্মার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেন। তার পর হইতে আর তাহার দর্শন পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে স্বামীজিকে চিকিৎসার জন্য প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত। অসুখে ভুগিয়াও এখানে তাঁহাকে অনেক লোকের সহিত বকিতে হইত! ইহাতে আহারাদির অনিয়ম হইতে লাগিল। গুরুভ্রাতা ও শিষ্যেরা এইজন্য আগন্তুকদিগের জন্য একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে স্বামীজিকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে হৃদয় চিরদিন পরের জন্য উন্মুক্ত—তাহাতে নিয়ম-কানুনের বাঁধন সহিবে কেন? তিনি উত্তর দিলেন, "এরা আমায় দেখবার জন্য, কি দুটো কথা শোনবার জন্য কত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছে, আর আমি শরীর খারাপ হবে ভেবে এখানে বসে তাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারব না?"

একদিন যোগানন্দ স্বামী ও শরৎ বাবুকে সঙ্গে লইয়া তিনি আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিতে গেলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় রামব্রহ্ম সান্যাল বাহাদুর তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত সমস্ত পশুশালায় ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ পশুপক্ষী দেখাইলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে রাম-ব্রহ্ম বাবু ব্যাঘ্র ও সিংহদিগকে আহার দিবার আজ্ঞা দিলেন। স্বামীজি উহাদিগের ভোজন দেখিয়া আমোদ বোধ করিলেন। তারপর সর্প দেখিয়াও বড় খুসী হইলেন এবং কি করিয়া সরীসৃপজাতির ক্রমবিকাশ হয় তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর বানরশালায় প্রবেশ করিলেন। বানর দেখিলেই (এদেশ ও পাশ্চাত্যদেশে) তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "ওহে, তোমরা এ শরীরে কেন প্রবেশ করিলে? আর জন্মে কি কর্ম্ম করিয়াছিলে যাহার ফলে এদেহ ধারণ করিতে হইয়াছে?"

রামব্রহ্ম বাবু কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। জলযোগান্তে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রামব্রহ্ম বাবু উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও জন্তুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামীজি বলিলেন ডারউইনের মতবাদ কতকদূর পর্য্যন্ত সত্য বটে। কিন্তু অনেক জিনিস আছে যেখানে উহা খাটে না; আর 'জীবন-সংগ্রামে প্রতিযোগিতা,' অথবা 'যৌননির্ব্বাচন' অপেক্ষা পতঞ্জলির মতে 'প্রকৃত্যা পূরণাৎ' যে 'জাত্যন্তর-পরিণামের' কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠতর। অনেক তর্কবিতর্কের পর রামব্রহ্ম বাবু স্বামীজির কথার সারবত্তা স্বীকার করিলেন ও বলিলেন, "যদি আপনার মত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় বিদ্যায় অভিজ্ঞ লোক এইভাবে আমাদের শিক্ষিত সমাজের ভ্রম অপনোদন করেন তবে দেশের বড় উপকার হয়।" ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা শরৎ বাবু ও অন্যান্য কয়েকজনের অনুরোধে বলরাম বাবুর বাটীতে স্বামীজি রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, পশু ও প্রাণিজগতের কতকদূর পর্যন্ত ডারউইনের মতবাদ খাটে, কিন্তু মানবজগতে—যেখানে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা ও স্বাধীন চিন্তার স্থান আছে—উহা খাটে না। আমাদের দেশের সাধু ও আদর্শচরিত্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতার নামগন্ধও নাই বা অপরকে বিনাশ করিয়া নিজে বড় হইবার প্রবৃত্তি নাই। বরং সেখানে আত্মত্যাগই দেখা যায়। যে যত নিজেকে বলি দিতে পারে সেই বেশী বড় হয়। একজন প্রশ্ন করিলেন, "তবে আপনি আমাদিগকে শারীরিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে বলেন কেন?"

আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া স্বামীজি বলিলেন, "তোরা কি আবার মানুষ? পশুর চেয়ে তোরা শ্রেষ্ঠ কিসে? শুধু আহার, নিদ্রা, ভয় আর বংশবৃদ্ধি এই নিয়ে আছিস্। যদি একটু বুদ্ধিবৃত্তি না থাকতো

তবে এতদিনে চতুষ্পদে পরিণত হতিস্। নিজেদের আত্মসম্মানবোধ নেই, কেবল পরস্পরের হিংসা নিয়ে আছিস, তাতেই তো আজ বিদেশীর কাছে তোদের এত লাঞ্ছনা! বাজে বড়াই ছেড়ে রোজ কিভাবে জীবন কাটাচ্ছিস্ সেইটে ভাব দেখি। আমি এই পশুত্ব তোদের ভেতর দেখছি বলেই শিক্ষা দিচ্ছি—প্রথমে জীবনসংগ্রামে একটু প্রতিযোগিতার চেষ্টা কর। শরীরটাকে শক্ত করতে শেখ। শরীর জোরালো হলে তবে মন জোরালো হবে। যাদের শরীরে জোর নেই তাদের আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব। যখন একবার মনটা বশে আসবে, আর আপনার ওপর প্রভুত্ব করতে পারবি, তখন শরীর থাকল আর গেল দেখবার দরকার নেই, কারণ তখন ত আর শরীরের দাস নস্।"

এই সময় স্বামীজির চক্ষে নিদ্রা ছিল না। রাত্রির অধিকাংশ সময়ই তিনি জাগিয়া কাটাইতেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা হইত যাহাতে একটু নিদ্রা হয়। বলরাম বাবুর বাড়ীতে একদিন আহারাদির পর শরৎ বাবু তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন, সহসা শঙ্খঘণ্টা বাজিতে লাগিল। সেদিন সূর্য্যগ্রহণ। স্বামীজি বলিলেন, "গেরণ লেগেছে, এইবার একটু ঘুমুই।" খানিক পরে যখন চারিদিক বেশ অন্ধকার হইল, তিনি "এই ঠিক গেরণ" বলিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই ভাল ঘুম হইল না। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বালকের ন্যায় শিষ্যকে বলিলেন, "লোকে বলে গেরণের সময় যা করা যায় তার শতগুণ ফল হয়। ভাবলুম যদি এই সময় একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যায় তবে এর পর হয়ত ভাল ঘুম হবে। কিন্তু তা হবার নয়। মিনিট পনেরো ঘুমিয়েছি বটে, কিন্তু মা আমার কপালে সুনিদ্রা লেখেন নি।"

এই সময়ে একটি ঘটনায় স্বামীজি বড় সন্তোষ লাভ করিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা বাহির হয়। ১৪ই

জানুয়ারী একটি ছাপাখানা ক্রয় করা হইল। স্থির হয়, মাসে দুইবার পত্রিকা বাহির হইবে। কি করিয়া কাগজখানি চালাইতে হইবে স্বামীজি সেই সম্বন্ধে উপদেশাদি দিলেন।

১৯শে ডিসেম্বর ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজি ৺বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলেন এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন হাঁপানি বড় প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে। অনেক সময় দম বন্ধ হইয়া আসিত। তিনি প্রায় অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে কাটাইতেন। একটু পড়াশুনা, চিঠিপত্র লেখা ও ভ্রমণ ইহাই তাঁহার প্রাত্যহিক কর্ম্ম ছিল। সময়ে সময়ে এত শ্বাসকষ্ট হইত যে, মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিত, সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ হইত এবং উপস্থিত সকলে মনে করিতেন বুঝি প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। স্বামীজি বলিতেন, এ সময় তিনি একটি উঁচু তাকিয়ার উপর ভর দিয়া বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেন, আর ভিতর হইতে যেন ক্রমাগত 'সোঽহম্' 'সোঽহম্' নাদ উত্থিত হইত,—যেন কর্ণে উপনিষদের এই মন্ত্র বাজিতে থাকিত, 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'।

এইখানেই একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি দেখিলেন, একটি লোক ভীষণ আমাশয়রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তার ধারে শীতে কাঁপিতেছে ও যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে—পরিধানে একখানি ধূলিধূসরিত ছিন্নবস্ত্র। তিনি পরের বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রথমে কি করিয়া গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে সে ব্যক্তিকে তথায় লইয়া যান ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় শুনিল না—গুরুভাইয়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে রোগীকে দাঁড় করাইলেন এবং দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে প্রিয় বাবুর বাটীতে আনিলেন। সেখানে একটি ঘরে তাহাকে রাখিয়া তাহার অঙ্গমার্জ্জনা করিলেন, তাহাকে একখানা কাপড় পরাইলেন

ও আগুনের সেঁক দিতে লাগিলেন। শুশ্রূষা করিতে করিতে লোকটি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিল। প্রিয় বাবু ইহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন যে, বিবেকানন্দ শুধু মানসিক বলে বলীয়ান্ নহেন, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতাও অসীম।

এই সময়ে যে সকল খ্যাতনামা ভারতবাসী স্বামীজিকে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য ধনকুবের স্যার জামসেদ্‌জী টাটার নিম্নলিখিত পত্রখানি উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয় স্বামীজি ইহার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে পাওয়া দুঃসাধ্য।

এস্‌প্লানেড্ হাউস, বম্বে
২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ,

আমার বিশ্বাস, জাপান হইতে চিকাগো যাইবার পথে সহযাত্রিরূপে আমাকে আপনার মনে আছে। ভারতে সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রসার ও উহাকে নষ্ট না করিয়া কার্য্যকর পথে পরিচালিত করিবার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আপনার অভিমত এখন আমার বেশ স্মরণ হইতেছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার সম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার এই ভাবগুলি মনে স্বতঃই উদিত হইতেছে; আপনি নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধে শুনিয়াছেন বা পড়িয়া থাকিবেন। আমার মনে হয় এই সন্ন্যাসধর্ম্মকে অধিকতর সুষ্ঠুরূপে কাজে লাগান যাইতে পারে, যদি ত্যাগব্রতীদের জন্য মঠ অথবা আবাসগৃহ নির্ম্মিত হয় যেখানে তাঁহারা সাধারণ চরিত্রনীতি মানিয়া চলিবেন এবং জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও লোককল্যাণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। আমার মত এই যে এরূপ সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুকূলে যদি কোন সুযোগ্য নেতা আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির ত্যাগধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সুখ্যাতির প্রভূত সহায়তা হয়।

আমার বিবেচনায় বিবেকানন্দই এই আন্দোলন-পরিচালনের একমাত্র যোগ্যতম অধিনায়ক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগুলিকে জাতীয়জীবনে ফলপ্রসূ করিবার মহান্ ব্রতে আপনি নিযুক্ত হইবেন কি? এ বিষয়ে দেশবাসিগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য একখানা উদ্দীপনাপূর্ণ পুস্তিকা-প্রচারের দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ। পুস্তিকা-প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার আমি সানন্দে বহন করিব। আমার শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি

ভবদীয় একান্ত বিশ্বস্ত

জামশেদজি এম্ টাটা

কর্ম্মব্রতে দীক্ষাদান

পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, এত কঠিন ও ক্লেশদায়ক পীড়া সত্ত্বেও স্বামীজি মুহূর্ত্তের জন্য কর্ম্মে বিরত ছিলেন না। দেশে পুরাতন আদর্শকে মাজিয়া ঘষিয়া নূতন করিয়া স্থাপন করিতে হইবে এবং সকল লোককেই কর্ম্মঠ ও উৎসাহশীল করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এদেশের বায়ুতে চিন্তাপরায়ণ দার্শনিক বড় সহজে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কর্ম্মনিষ্ঠ ও উদ্যমশীল লোকের একান্ত অভাব। আমরা অনেক দিন হইতে 'জগৎটা কিছু না' বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া আছি। তাহার ফলে আজ আমরা মৃতকল্প জড় হইয়া দাঁড়াইয়াছি। স্বামীজি দেখিলেন যে, এই আত্মপ্রবঞ্চনায় দেশের ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। কর্ম্মের আদর্শ, কর্ম্মের গৌরব, কর্ম্মের উপকারিতা দেশে গ্রাহ্য না হওয়ায় দেশ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। সেই জন্য তিনি মঠের সন্ন্যাসীদিগকে প্রথমে লোকশিক্ষা দিবার উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে লাগিলেন। একদল লোকের হস্তে এই শিক্ষাভার না থাকিলে চলে না। তিনি দেখিলেন, যাহারা সন্ন্যাসী হইতে আসিতেছে তাহারাই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র। কারণ তাহারা স্বভাবতঃ সংসারাসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, পরের জন্য খাটিতে প্রস্তুত ও পরিবার-প্রতিপালনভার হইতে মুক্ত। সেই জন্য তিনি যুবক সন্ন্যাসীদিগকে কর্ম্মমার্গের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীও অতি সুন্দর ছিল। নিবেদিতা বলিয়াছেন, 'তিনি আজন্মই শিক্ষক।' কথাটা অতি সত্য। তিনি শুধু সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেই অর্দ্ধেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কাহাকেও হয়ত নিজের রন্ধনভার প্রদান

করিতেন, কাহাকেও বা বক্তৃতাদি দিতে অভ্যাস করাইতেন। যে যেমন কার্য্যের উপযুক্ত তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। কাজের মধ্যে ছোট বড় ছিল না। যখন যাহার দ্বারা যে কাজ করাইবেন মনে করিতেন, তখনই তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইত; না করিলে নিস্তার নাই। তিনি বলিতেন, "যে কাজই হউক, খুব মনোযোগের সহিত করা চাই। যে ঠিক ভাবে এক ছিলিম তামাক সাজতে পারে সে ঠিক ধ্যান-ধারণাও করতে পারে। আর যে রান্নাটাও ভাল করে করতে পারে না সে কখনও পাকা সাধু হতে পারে না। শুদ্ধমনে একান্তচিত্তে না রাঁধলে খাদ্যদ্রব্য সাত্ত্বিক হয় না।" শিষ্যদিগকে যখন বক্তৃতা দিতে শিক্ষা দিতেন তখন কেহ কেহ লজ্জাবশতঃ অগ্রসর হইতেন না, কিন্তু তিনি সহজেই তাঁহাদের লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিতেন—বলিতেন, "দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাকে লজ্জা দূর করবার বড় একটা সুন্দর উপায় বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যখন লোক দেখে লজ্জা হবে তখন মনে করবি 'লোক না পোক'।" একবার এই প্রকারে লজ্জা দূর হইলেই শিষ্যেরা অনেক সময়ে জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ত্যাগ বা শাস্ত্র সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনিও 'বেশ হচ্ছে' 'বাহবা' প্রভৃতি বাক্যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। শুদ্ধানন্দ স্বামীর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "চেষ্টা করলে কালে এ খুব ভাল বক্তা হবে।"

তাঁহার শিক্ষার আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, যেকেহ তাঁহার নিকট থাকিত তাহারই মনে হইত যেন সে অসামান্য ব্যক্তি, বিরাট শক্তির আধার, যত শক্ত কাজই হউক না কেন, করিতে সমর্থ। কেহ কৃতকার্য্য হউক বা না হউক, কখনও তাঁহার নিকট হইতে প্রশংসা ও উৎসাহ ভিন্ন ভর্ৎসনা লাভ করিত না। লোক বিচার করিবার সময় তিনি দেখিতেন না, কে কতটা কাজ করিল, দেখিতেন কাহার মনের ভাব কত দৃঢ়।

সাধ্যমত চেষ্টা করিলেই তিনি যথেষ্ট বোধ করিতেন। অকৃতকার্য্য হও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু চেষ্টা করা চাই—উদ্যম চাই, উৎসাহ চাই। তিনি যেন শিষ্যদের ডুব জলে ছাড়িয়া দিয়া ভাবিতেন, যে যতটা পারে হাত পা ছুঁড়িয়া সাঁতার শিখুক। সেই সময়ে স্বামী সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নির্ম্মলানন্দের উপর দর্শনাদি-অধ্যাপনার ভার ছিল এবং সকলেই ধ্যানের সময় তাঁহাদিগের সহিত ঠাকুরঘরে যাইতেন। কিন্তু কাজকর্ম্মের ভার ছেলেদের হাতে ছিল। স্বামীজি বলিতেন, "ওদেরও একটু স্বাধীনতা থাকা চাই। ওদেরও দায়িত্ববোধ হওয়া চাই। না হলে এর পর বড় বড় কাজ করবে কি করে?"

সন্ন্যাসীর জীবন কিরূপ হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে স্বামীজি প্রায়ই উপদেশ দিতেন। সময়ে সময়ে মঠের সকল সন্ন্যাসীকে নিজের কাছে ডাকিয়া সন্ন্যাস-জীবনের গুরুত্ব ও সন্ন্যাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিতেন—বলিতেন, "ব্রহ্মচর্য্য প্রতি শিরায় শিরায় আগুনের মত জ্বলবে।" কখনও বলিতেন, "মনে রাখবি, এই হচ্ছে আদর্শ—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" সন্ন্যাস বলিতে তিনি বুঝিতেন বিশ্বের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিতে করিতে সান্তকে অনন্তের মধ্যে হারাইয়া ফেলা। আদর্শগুলিকে তিনি কার্য্যে এমন ভাবে পরিণত করিয়াছিলেন যে, কখনও সেগুলিকে theoretical abstractions বা কল্পনার বিজৃম্ভন বলিয়া মনে হইত না। নিজের উপর বিশ্বাস থাকিলে কোন কাজই অসম্ভব নহে এই তাঁহার ধারণা ছিল।

তিনি বলিতেন, "জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান লোকের ইতিহাস। বিশ্বাসই ভিতরকার দৈবীশক্তিকে জাগ্রত করে। বিশ্বাসবলে মানুষ যা খুসী করতে পারে। কেবল সেই সময় মানুষ অকৃতকার্য্য হয় যখন সে অনন্ত শক্তিবিকাশের চেষ্টা বর্জ্জন করে। যে

মুহূর্ত্তে একটা মানুষ বা একটা জাত নিজের উপর বিশ্বাস হারায় সেই মুহূর্ত্তে সে মরে। প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর, তারপর ভগবানে বিশ্বাস। একমুটো শক্তিমান লোক জগৎটা টলমল করে ফেলতে পারে। আমাদের চাই অনুভব করবার হৃদয়, চিন্তা করবার মস্তিষ্ক, আর কাজ করবার হাত।"

রন্ধন, সঙ্গীত, উদ্যানরচনা, পশুপালন প্রভৃতি ব্যতীত আর একটি জিনিসের উপর স্বামীজি খুব জোর দিতেন। সেটি হইতেছে—শরীরের দৃঢ়তা-সাধন। তিনি দাঁড়টানার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; বলিতেন— "আমি চাই ধর্ম্মপথের একদল কর্ম্মঠ সৈনিক। অতএব বালকগণ, তোমাদের পেশীগুলিকে দৃঢ় করিবার কাজে লাগিয়া যাও। সন্ন্যাসীদের পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধন ভাল বটে, কিন্তু কর্ম্মীদের জন্য প্রয়োজন সুগঠিত দেহ, লৌহবৎ দৃঢ় পেশী ও ইস্পাতের ন্যায় শক্ত স্নায়ু।" সন্ন্যাসীদের পক্ষে অধ্যয়নও তিনি বিশেষ আবশ্যক মনে করিতেন। কারণ তদ্দ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, ধারণা ও নিষ্ঠা দৃঢ় হয় এবং সমাজ ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসা করা ও দেশকালপাত্র-বিবেচনায় বিধিব্যবস্থা ও নিয়মাদি সৃজন করার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। ত্যাগ ও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যই যে চরম জ্ঞানলাভের একমাত্র সোপান ইহা তিনি মঠের সন্ন্যাসীদিগের চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন। আর ত্যাগশব্দের অর্থ শুধু কর্ম্মে নয়, মন হইতে ত্যাগ। তিনি বলিতেন, "সন্ন্যাসীর জীবন অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে একটা তুমুল সংগ্রাম। সুতরাং যদি জয়ের আশা করিতে চাও, তবে কঠোর তপস্যা, আত্মনিগ্রহ ও ধ্যান-ধারণায় লাগিয়া যাও।"

সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম অবস্থায় গুরুর শাসনাধীনে বা বিধিনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করিতেন, বিশেষতঃ আহারাদি সম্বন্ধে। ১৬ই ডিসেম্বর বৈদ্যনাথ যাইবার পূর্ব্বে তিনি মঠে

অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করেন এবং আহারাদি বিষয়ে নবীন সন্ন্যাসীদিগকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়া বলেন যে, রাত্রিতে অল্প ভোজন ভাল। আহারের সহিত মনের যে কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, "আহারসংযম ব্যতীত চিত্তসংযম অসম্ভব। অতিভোজন থেকে অনেক অনর্থ হয়। ওতে শরীর ও মন দু-ই জাহান্নমে যায়। তা ছাড়া প্রথম অবস্থায় হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়া বিঘ্নকর। গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা ভাল নয় বটে, তবে প্রথম প্রথম নিষ্ঠাবান হওয়া খুব ভাল এবং দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা দরকার। তার পর যা খুসী কর। ইচ্ছা করলে পুরো সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পার, আবার মঠ ছেড়ে চলে যেতেও পার। তবে একথাটা ভুলো না যে, যখন দেখবে সন্ন্যাস-আদর্শ থেকে পিছিয়ে পড়ছ, এ কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অনুপযুক্ত, তখন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করা বরং ভাল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম কলুষিত করা অনুচিত। সকালে উঠবে, ধ্যানজপ করবে আর খুব তপস্যা লাগাবে, স্বাস্থ্য আর সময়মত খাওয়াদাওয়ার উপর খুব নজর রাখবে। আর কথাবার্ত্তা কইবে শুধু ধর্ম্মসম্বন্ধে। শিক্ষাবস্থায় এমন কি খবরের কাগজ পড়া বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাও ভাল নয়।"

এ বিষয়ে একদিন তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "মঠের ব্যাপারে গৃহস্থদের কোন কর্তৃত্ব চলবে না। সন্ন্যাসীরাও টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। গরিবদের সঙ্গেই তাদের কারবার। গরিবদেরই যত্ন করবে, ভালবাসবে ও যথাসাধ্য সেবা করবে। এদেশের প্রত্যেক মঠ ও সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বড় মানুষের দাসত্ব করাতে ও তাদের দয়ার উপর নির্ভর করাতেই উচ্ছন্ন গেছে। প্রকৃত সন্ন্যাসী তাদের ত্রিসীমানায় যাবে না। কামকাঞ্চনের দাস যারা, তারা কি করে কাম-কাঞ্চনত্যাগীর প্রকৃত শিষ্য হতে পারে?"

বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অল্পবয়স্ক শিষ্যদের জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেগুলির উদ্দেশ্য—যাহাতে তাহাদের মনে সংসারীর বিন্দুমাত্র ছায়াও না পড়ে। যতই আলাপ পরিচয় থাক, গৃহস্থের পক্ষে সাধুর বিছানায় শয়ন, উপবেশন বা তাঁহাদের সহিত একত্র ভোজন করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মঠের অল্পবয়স্ক যুবকগণের পক্ষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবার জন্যও তাঁহার কলিকাতার আশ্রমবাটীতে থাকা নিষেধ ছিল, কারণ শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী সকলের নিকট অতিশয় পূজনীয়া হইলেও ঐ আশ্রমে অন্যান্য অনেক স্ত্রীভক্ত তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেন বা সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপদেশাদি লইতে আসিতেন। কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া একটি নিষ্কলঙ্কচরিত্র যুবক সন্ন্যাসীকে ঐ আশ্রমের তত্ত্বাবধান-কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া স্বামীজি ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্থলে একজন প্রাচীন অথচ কর্ম্মঠ শিষ্যকে নিযুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ হইতে কেহ যেন মনে করিবেন না যে, তিনি গৃহস্থ বা স্ত্রীলোকগণকে ঘৃণা করিতেন। তবে দুর্ব্বলতা সাধারণ নরনারীর স্বভাবগত ধর্ম্ম এবং সুযোগ পাইলে পাপ অলক্ষ্যে কোন্ পথে প্রবেশ করে তাহা কেহ বলিতে পারে না; এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন, যেন পাপ বা দুর্ব্বলতা মস্তক উত্তোলন করিবার অবসর বা উপযুক্ত ক্ষেত্র না পায়। নতুবা প্রকৃত গার্হস্থ্যাশ্রমেও যে অতি উচ্চ আদর্শ ও মহদ্ধর্ম্মপালনের উপায় আছে তাহা তিনি বেশ জানিতেন এবং গৃহস্থদিগের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষকে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করিতেন। এমন কি, অনেক সময়ে সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া তাঁহাদের উদাহরণ দিতেন। পাঠক পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এইরূপ একজন মহাপুরুষকে দেখিবেন।

অনেক সময় লোকের ব্যবস্থায় বিরক্ত হইয়া তিনি বলিতেন, "তোদের দেশে কি করে কাজ করবো বল্? এখানে সকলেই কর্ত্তা হতে চায়, কেউ কারুকে মানতে চায় না। বড় কাজ করতে গেলে সর্দ্দারের হুকুম চোখ বুজে মানতে হয়। আমার গুরুভাইরা যদি আজ আমায় বলে, আজ থেকে শেষদিন পর্য্যন্ত আমায় মঠের নর্দ্দমা সাফ করতে হবে, ঠিক জানিস্ আমি দ্বিরুক্তি না করে এখনি তাই করতে থাকবো। যে হুকুম তামিল করতে পারে সেই সর্দ্দার হয়।"

একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে একজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "শোন, শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের জন্য এসেছিলেন আর জগতের জন্য প্রাণটা দিয়ে গেলেন। আমিও প্রাণটা দেব, তোদেরও সকলকে দিতে হবে। এখন যা হচ্ছে দেখছিস এ শুধু আরম্ভ। তবে ঠিক জানিস, এই যে আমার হৃদয়ের রক্ত পাত করে যাচ্ছি এর ফলে এমন সব বীর উৎপন্ন হবে, ভগবানের কাজের জন্য এমন সব মহারথী বেরুবে যারা সমস্ত পৃথিবীটা ওলট পালট করে ফেলবে।" প্রায়ই তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন, "কিছুতেই যেন ভুলিসনি যে জগতের সেবা এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তিই হচ্ছে সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাতেই লেগে থাকবি। সন্ন্যাসমার্গের মত কোন পথে এত সাক্ষাৎ ফল হয় না। সন্ন্যাসী ও পরমাত্মার মাঝখানে অন্য কোন দেবতা নেই। সন্ন্যাসী বেদের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন।"

স্বামীজির বড় ইচ্ছা ছিল মঠে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদির রীতিমত অধ্যাপনা হয়। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানে মঠ উঠিয়া যাওয়া অবধি গুরুভাইদের সাহায্যে বেদ, উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র, গীতা ও ভাগবত পাঠের জন্য নিয়মিত বৈঠক বসিত। তিনি স্বয়ংও কিছুদিন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়াইয়াছিলেন এবং এখনও সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রপাঠে অনেক

সময় ব্যয় করিতেন। এই সময় তিনি 'ওঁ হ্রীং ঋতং' ও 'আচণ্ডালা-প্রতিহতরয়ঃ' নামক স্তোত্র দুইটি রচনা করেন। যেদিন প্রথম স্তোত্রটি রচিত হয় সেইদিন স্বামীজি শিষ্য শরচ্চন্দ্রের সহিত দুই ঘণ্টা সংস্কৃতে আলাপ করিয়াছিলেন। শরৎ বাবু বলেন, "বোধ হইতেছিল যেন বাগ্দেবী স্বামীজির কণ্ঠাগ্রে অবস্থান করিতেছিলেন। আর তাঁর ভাষা কি সতেজ, কি মনোমুগ্ধকর, কি অনর্গল! আমি আগে কি পরে আর কখনও বড় বড় পণ্ডিতদের মুখেও এমন লালিত্যপূর্ণ ভাষা শুনি নাই।" শরৎ বাবু সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ। শ্লোকগুলি রচিত হইলে স্বামীজি উপরোক্ত শিষ্যের হস্তে সেইগুলি সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এগুলো পড়ে দেখ, ছন্দে কোন দোষ হয়েছে কি না। আমার মাথায় যখন ভাব আসে তখন ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে হয় ত সব সময় ব্যাকরণের খেয়াল থাকে না। যেখানে দরকার বোধ করবি বদলে ঠিক করে দিবি।" শিষ্য বলিলেন, "আপনার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য কে না জানে! ভাষাকে ভাবের অনুগামী করবার জন্য প্রয়োজনমত বদলাবার অধিকার আপনার আছে। আর আপনার যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয় তাকে আর্ষপ্রয়োগ বলে ধরে নিতে পারা যায়।" শুধু সংস্কৃত বলিয়া নহে, স্বামীজি ইংরেজীতেও যেসকল বক্তৃতা দিতেন বা যাহা লিখিতেন, বলা বা লেখা শেষ হইলে আর তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিতেন না। যাহাদের কাছে খসড়া থাকিত তাহাদের বলিতেন, "তোমরা যেমন খুশী বদলে দিও। আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমি আর ওসব পুনরায় দেখতে পারবো না।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ভাব ঠিক থাকিত ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাষার পরিবর্ত্তনে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। কবিতা সম্বন্ধে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ, কবিতার পদ-মিলানো যেন ছোটছেলের আধ আধ কথার মত। যেন নাকি

সুর ভাঁজা—ভাবটা কবিতায় প্রকাশ করলেই হলো। রূপ নিয়ে অত মারামারি কেন ?"

উপরোক্ত শিষ্যকে তিনি প্রায় বলিতেন, "দেখ্, যা লিখবি তাতে যেন ভাবপ্রবণতা মোটে না থাকে। এদেশের লোকে যা লেখে তাতেই ভাবুকতার ছড়াছড়ি। ফলে দেশটা মেয়েলী ভাবে বোঝাই হয়ে উঠেছে। শক্তি চাই রে! শক্তি চাই! কাজে কর্ম্মে লেখায় একটা পৌরুষভাব থাকা চাই। আজকালকার দিনে ও জিনিসটার বড় অভাব। তাই আমি নিজে এক নতুন ধরণে জীবন্ত ভাবে বাংলা লিখবো মনে করছি।" যাঁহারা স্বামীজির 'বর্ত্তমান ভারত,' 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই 'নতুন ধরণের' বাংলার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। আমরা এখানে উদাহরণ-স্বরূপ 'বর্ত্তমান ভারতের' শেষ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটুও লাগে, দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত! চতুর্দ্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্য গৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্ত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদন-কারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্য জাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!!

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার

লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও মা—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত,—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর; আমায় মানুষ কর।"

পূর্ব্বে শীলেদের বাগানে যেমন দিনরাত লোক যাতায়াত করিত—আর ধর্ম্ম, সমাজ, দেশের উন্নতি অবনতি নানা বিষয়ে আলোচনা হইত, এখনও তেমন হইতে লাগিল।

স্বামীজি ও নাগমহাশয়

এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের ভক্তশ্রেষ্ঠ নাগমহাশয়[১] তাঁহার জন্মস্থান সুদূর দেওভোগ হইতে স্বামীজিকে দর্শন করিতে মঠে আসিয়াছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড়ই অপরূপ হইয়াছিল। একজন প্রাচীন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, আর একজন নবীন সন্ন্যাসমার্গের জ্বলন্ত ছবি; একজন ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা, আর একজন মানুষের মধ্যে প্রসুপ্ত ভগবানকে জাগ্রত করিবার চিন্তায় আত্মহারা; তবে ত্যাগ, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি ও আত্মদর্শন—এসকল বিষয়ে উভয়েই একরূপ।

স্বামীজি নাগমহাশয়কে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে নাগমহাশয় বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করিতে আইলাম! জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হইল।" স্বামীজি তাঁহাকে বসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বামীজি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর কেমন আছে?" কিন্তু যিনি দৈবক্রমে অপরের বিরুদ্ধে মুখ দিয়া একটি কথা নির্গত হওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ

---

১ নাগমহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন গৃহী শিষ্য। ইঁহার অদ্ভুত ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ঠাকুরের প্রসাদ বলিয়া দেওয়াতে ইনি একবার ভোজ্যের সহিত কলাপাতা পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়াছিলেন এবং পিতৃবাক্যের মর্য্যাদারক্ষার্থ উলঙ্গ হইয়া মৃত ভেক চর্ব্বণ করিয়াছিলেন। জিহ্বার সুখেচ্ছা হইবে বলিয়া সন্দেশ বা কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন না, অথচ অতিথিসৎকারের জন্য গৃহের খুঁটি জ্বালাইয়া পাক করিয়াছিলেন এবং একটিমাত্র গৃহ থাকাতে অতিথিকে স্বীয় শয়নগৃহে স্থান দিয়া সপত্নীক সমস্ত রাত্রি ঘোর দুর্য্যোগে গৃহের বাহিরে কাটাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'সাধু নাগমহাশয়' নামক পুস্তকে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

আপন শিরে প্রস্তরাঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছিলেন এবং মাসাবধি ক্ষতযন্ত্রণায় ভুগিয়া বলিয়াছিলেন, "বেশ হইয়াছে, যে যেমন পাজি, তাহার সেইরূপ শাস্তি হওয়া দরকার"—সেই আত্মবিস্মৃত পুরুষ কি কোনদিন দেহের কোন সংবাদ রাখিতেন? তাহার উপর আবার যাঁহাকে সাক্ষাৎ শিবাবতার জ্ঞান করিতেন তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, এ অবস্থায় কি আর শরীরের কথা মনে আছে? স্বামীজির প্রশ্নের উত্তরে "ছাই হাড়-মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম"—এই কথা বলিয়া তিনি স্বামীজির পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত হইলেন। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "ও কি কচ্ছেন!"

নাগ মহাশয় বলিলেন, "আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ!" এই বলিয়া অতৃপ্ত-নয়নে স্বামীজিকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজি নাগমহাশয়ের শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখেছিস্, ঠিক ঠিক ভক্তিতে মানুষ কি হয়! নাগমহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন—দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে। এমনটি আর দেখা যায় না।" তারপর তিনি প্রেমানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া নাগমহাশয়ের জন্য প্রসাদ আনিতে বলিলেন। প্রসাদের কথা শুনিয়া নাগমহাশয় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজির দিকে ফিরিয়া করযোড়ে) আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।"

এই সময়ে মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতে-ছিলেন। কিন্তু নাগমহাশয়ের শুভাগমনে স্বামীজি তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। সকলে আসিয়া নাগমহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য ঘিরিয়া বসিলে স্বামীজি বলিলেন, "দেখছিস্! নাগমহাশয়কে দেখ্; ইনি গেরস্থ বটে,

কিন্তু জগৎটা আছে কি না সে বোধ নেই; সর্ব্বদা তন্ময় হয়ে আছেন!” তারপর নাগমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এইসব ব্রহ্মচারী ও আমাদের সকলকে ঠাকুরের কথা কিছু শুনান।”

নাগ মঃ— ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি বলব? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝবে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজি— আপনিই তাঁকে ঠিক চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মলুম।

নাগ মঃ— ছি, ছি, ও কি কথা বলছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—এ পিঠ আর ও পিঠ। যার চোখ আছে, সে দেখুক।

স্বামীজি— এই যে মঠ ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে?

নাগ মঃ— আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করবেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

এই সময়ে অনেকে নাগমহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ-মহাশয় মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তখন স্বামীজি সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, “যাতে এঁর কষ্ট হয়, তা করো না।” তারপর নাগমহাশয়কে বলিলেন, “আপনি মঠে এসে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা কত জিনিস শিখবে!”

নাগ মঃ— ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাতে তিনি বললেন, “গৃহেই থেকো।” তাই গৃহেই আছি, মধ্যে মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্য হয়ে যাই।

স্বামীজি— আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগমহাশয় আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, “আহা! এমন দিন কি

হবে? আপনার পায়ের ধুলো পড়লে দেশ কাশী হয়ে যাবে—কাশী হয়ে যাবে! সে সৌভাগ্য কি আমার অদৃষ্টে আছে?"

স্বামীজি— আমার ত ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগ মঃ— আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝবে? দিব্যদৃষ্টি না খুললে ত চিনবার জো নাই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কিন্তু কিছু বোঝে না।

স্বামীজি— এখন আমার একটি ইচ্ছে আছে, শুধু দেশকে জাগান। সমস্ত দেশটা বৃহৎ অজগরের মত আপনার শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই—যেন মরেই গেছে। যদি একবার কোনরূপে তাকে জাগিয়ে তার সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কি শক্তি আছে জানিয়ে দিতে পারি, তবে বুঝবো ঠাকুর ও আমাদের আসা বৃথা হয় নি। শুধু এই একটিমাত্র ইচ্ছে আছে—মুক্তি ফুক্তি এর কাছে তুচ্ছ। আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃতকার্য্য হই।

নাগ মঃ— ঠাকুর আপনাকে নিয়ত আশীর্ব্বাদ করছেন! আপনার ইচ্ছার গতিরোধ কে করে? যা ইচ্ছা করবেন তাই হবে।

স্বামীজি — কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছে ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগ মঃ— তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে; আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজি— কাজ করতে গেলে মজবুত শরীর চাই; এই দেখুন এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নেই; ওদেশে বেশ ছিলুম।

নাগ মঃ— ঠাকুর বলতেন দেহে থাকতে হলে টেক্স দিতে হয়। রোগ শোক সেই টেক্স। কিন্তু আপনার দেহ যে মোহরের বাক্স; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই; কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজি— মঠের এরা আমায় খুব যত্নে রাখে।

নাগ মঃ— যাঁরা যত্ন করছেন, তাঁদেরই কল্যাণ—বুঝুন আর নাই বুঝুন। সেবার কমতি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামীজি— নাগমহাশয়! কি যে করছি, কি না করছি—কিছু বুঝতে পারছি নে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মত কাজ করে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে।

নাগ মঃ— ঠাকুর যে বলেছিলেন, "চাবি দেওয়া রইল।" তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

স্বামীজি একদৃষ্টে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগমহাশয় ও অন্যান্য সকলকে দিলেন। নাগমহাশয় দুই হস্তে প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া মহাহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে স্বামীজি একখানি কোদাল লইয়া পুকুরের একধারে আস্তে আস্তে মাটি কাটিতেছিলেন। তদ্দর্শনে নাগমহাশয় তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "আমরা থাকিতে আপনি ও কি করেন?" অগত্যা স্বামিজী কোদাল ফেলিয়া মাঠে বেড়াইয়া বেড়াইয়া গল্প করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন—

"ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুনলুম, নাগমহাশয় চার-পাঁচ দিন উপোস করে তাঁর কলকাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন। আমি, হরিভাই ও আর কে একজন মিলে ত নাগমহাশয়ের কুটীরে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বললুম, আপনার এখানে আজ ভিক্ষে পেতে হবে। অমনি নাগমহাশয় বাজার থেকে চাল, হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁধতে শুরু করলেন। আমরা মনে করেছিলুম—আমরাও

খাবো, নাগমহাশয়কেও খাওয়াবো। রান্নাবান্না করে ত আমাদের দেওয়া হল ; আমরা নাগমহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বসলুম। আহারের পর যেই ওঁকে খেতে অনুরোধ করা, অমনি ভাতের হাঁড়ি আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে কপালে আঘাত করে বলতে লাগলেন, 'যে দেহে ভগবানলাভ হলো না, সে দেহকে আবার আহার দেবো?' আমরা ত দেখেই অবাক! অনেক করে পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে আসি।"

সন্ধ্যার সময় নাগমহাশয় স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

এই চিত্রে দুইটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক, নাগমহাশয়ের অপূর্ব্ব দীনতা ও স্বামীজির প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ; আর এক, নাগমহাশয়ের প্রতি স্বামীজির গভীর শ্রদ্ধা। উভয়েরই উভয়ের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা ছিল। যে বিশ্ববিজয়ী পুরুষ জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার মতকে চিরদিন অকাট্য বলিয়া ধারণা করিয়া আসিয়াছিলেন, অটল আত্মশক্তিতে অবস্থিত হইয়া যিনি সত্য ব্যতীত কাহারও নিকট কখনও অবনতমস্তক হন নাই, এবং দেশোন্নতিকল্পে আপনার জীবনব্যাপী আয়োজনকে একদিনও যাঁহার উন্মার্গগমন বলিয়া বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই, সেই তেজস্বী বীরহৃদয় বিবেকানন্দ আপনার আরব্ধ কার্য্য সম্বন্ধে সরলবুদ্ধি, গ্রাম্য, ক্ষ্যাপাটে (!) নাগমহাশয়ের মতামত গ্রহণ করা অনাবশ্যক মনে করেন নাই। ইহাতে তাঁহার আত্মকার্য্যের উপর বিশ্বাসের অল্পতা বা সন্দেহ সূচিত হইতেছে না, পরন্তু নাগমহাশয়ের অন্তর্দৃষ্টি, বিবেচনাশক্তির মূল্য ও তাঁহার প্রতি স্বামীজির অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নাগমহাশয়ের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।" বাস্তবিক নাগমহাশয়ের ন্যায় ঈশ্বরনিষ্ঠা ও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শুষ্ক, কর্কশ মূর্ত্তির

অন্তরালে যে একখানি সরল হৃদয় ভগবৎ-প্রেমের অমল দীপ্তিতে স্নিগ্ধমধুর ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হইয়া শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে বিরাজ করিতেছিল, সাধারণ লোকে হয়ত তাহার খবর রাখিত না, কিন্তু স্বামীজি রাখিতেন। তাই তিনি সন্ন্যাসগৌরবের অভ্রভেদী শিখর হইতে অবতরণ করিয়া এই দীন গৃহস্থের নিকট আশীর্ব্বাদ যাজ্ঞা করিয়াছিলেন! আর তাঁহার গুরুভাইরাও দেখিলেন, স্বামীজির ইচ্ছা ও ঠাকুরের ইচ্ছার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

* * *

এই সময়ে একদিন সুপরিচিতা শ্রীমতী সরলাদেবী স্বামীজি সুন্দর রন্ধন করিতে পারেন শুনিয়া ভগিনী নিবেদিতার নিকট উহার উল্লেখ করেন। স্বামীজি জানিতে পারিয়া একদিন দুই জনকেই আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং স্বহস্তে কয়েকটি ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। মহিলাদিগের সহিত কথা বলিতে বলিতে স্বামীজি অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় নিবেদিতাকে তাঁহার জন্য এক কলিকা তামাক সাজিতে বলিলেন। নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া আনন্দের সহিত তামাক সাজিয়া আনিলেন এবং স্বামীজির সেবা করিবার অধিকার লাভ করিয়া আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ প্রস্থান করিলে স্বামীজি গুরুভাইদের বলিলেন, নিবেদিতাকে দিয়া তামাক সাজাইবার উদ্দেশ্য এই যে তিনি শুনিয়াছিলেন এ দেশের কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধারণা, তিনি নাকি শ্বেতাঙ্গদের স্তুতি ও ছন্দানুবর্ত্তন দ্বারা তাহাদিগকে আপন শিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে একজন পাশ্চাত্ত্য রমণীকে আপন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তিনি দেখাইলেন ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

আবার সমুদ্রযাত্রা

১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মের প্রথমেই স্বামীজির স্বাস্থ্য অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িলে তাঁহার ভক্ত নড়াইলের জমিদারগণ গঙ্গায় মুক্তবায়ুসেবনের উদ্দেশ্যে তাঁহার জন্য একটি বজরার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেক সময় বজরার ছাদে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকিতেন, কখনও বা বালকের ন্যায় সরল সহাস্যবদনে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতেন। সাধারণতঃ বজরা উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে যাইত। গোধূলির আলো বা রাত্রের অন্ধকারে সেইস্থান দিয়া যাইবার সময় তিনি প্রায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। সারাদিন শিক্ষা ও প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যার সময় ঐরূপ জলভ্রমণ তাঁহার নিকট অতিশয় প্রীতিপ্রদ বোধ হইত।

শরীরের অবস্থা যেমনই হউক, তিনি কখনও পরের জন্য পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না। ডাক্তাররা একবাক্যে তাঁহাকে সাধারণ্যে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি ২৬শে ফেব্রুয়ারী ভগিনী নিবেদিতার 'দি ইয়ং ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট' নামক বক্তৃতায় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং মিশনের রবিবাসরীয় বৈঠকে কখনও অনুপস্থিত থাকিতেন না। এই সময়ে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ধনিকগণের অনেকে তাঁহাকে আপন আপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন। ১৭ই জুন শেষবার তিনি এইরূপ নিমন্ত্রণরক্ষার্থ মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহার 'রাজযোগ'-গ্রন্থপাঠে অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একান্তে ঐ বিষয় সম্বন্ধে স্বামীজিকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

চিকিৎসক ও বন্ধুদিগের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে স্বামীজি পুনরায়

পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে গমন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। স্থির হইল, স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁহার বালিকাবিদ্যালয়সংক্রান্ত কার্য্যানুরোধে ইংলণ্ডে গমন করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিও স্বামীজির সহিত একত্র যাত্রা করিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। বাস্তবিক স্বামীজির বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাকে একাকী বিদেশে যাইতে দিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। যাত্রার এক মাস পূর্ব্ব হইতে দর্শক ও ভক্তবৃন্দে মঠ দিবারাত্র পরিপূর্ণ থাকিত। স্বামীজি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা, স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি এবং আরও বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেন; মাঝে মাঝে ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠে গান গাহিতেন। যাত্রার পূর্ব্বদিন ফটোগ্রাফ তোলা হইল এবং রাত্রে মঠে একটি ক্ষুদ্র বৈঠক বসিল। মঠের যুবক ব্রহ্মচারীরা স্বামীজিকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে বিদায়কালীন অভিনন্দন প্রদান করিলেন। তাঁহারাও অল্প কথায় উত্তর দিলেন। স্বামীজি সন্ন্যাসের আদর্শ ও ত্যাগ-অভ্যাস সম্বন্ধে বলিলেন, "সন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভয় করিবে না। পরের জন্য নিজ জীবন তুচ্ছ করিবে। সংসারী লোক ভালবাসে বাঁচিতে, সন্ন্যাসীকে ভালবাসিতে হইবে মৃত্যু। আহার দ্বারা শরীর পুষ্ট করিয়া কি লাভ, যদি উহা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? সেইরূপ অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি করিয়াই কি লাভ, যদি তাহা অপরের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে না পারি? সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ, তুমি আমি তাহার এক নগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটি কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্য্য—না করাই অস্বাভাবিক। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি স্মরণ নাই?—

'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥'

মরিতেই যখন হইবে—মরণ অপেক্ষা ধ্রুবসত্য যখন আর কিছুই নাই—তখন কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করাই কি শ্রেয় নহে? মৃত্যুতেই স্বর্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত, আর বিপরীত বস্তুতে সমুদয় অকল্যাণ ও আসুরিক ভাব নিহিত।" তারপর বলিলেন, "এই আদর্শটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় কি জানিতে হইবে, খুব একটা বড় বা অসম্ভব রকমের আদর্শে কোন কাজ হয় না। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কারকগণের ঐ বিপদ হইয়াছিল। আবার অতিমাত্রায় কাজের লোক হওয়াও ভাল নয়। দুটি প্রান্ত এক করিতে হইবে। দুটি 'অত্যন্ত'কে ছাড়িতে হইবে। প্রবল ভাবপরায়ণতার সঙ্গে প্রবল কার্য্যকারিতা যোগ করিতে হইবে। এই হয়ত গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমুহূর্ত্তেই মঠের মাটি কোদলাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই হয়ত শাস্ত্রের জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইল, আবার পরক্ষণেই এই জমির ফল-ফুলুরী, শাকসবজী, মাথায় করিয়া বাজারে বেচিয়া আসিতে হইল। দরকার হইলে খুব সামান্য কাজ—এমন কি পায়খানা সাফ পর্য্যন্ত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে মঠের উদ্দেশ্য—আদর্শ মানুষ প্রস্তুত করা। প্রাচীন ঋষিগণ এখন নাই—গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিবার সময়ও এখন চলিয়া গিয়াছে। তোমাদিগকে এই নবযুগের ঋষি হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্যাণ ত্যাগ করিয়া পরের জন্য অম্লানবদনে আত্মপ্রাণ বলি দিতে হইবে। সে-ই প্রকৃত মানুষ যে স্বয়ং শক্তিমানের মত শক্তিশালী, অথচ যাহার প্রাণটা রমণীর প্রাণের মত কোমল, পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতাপ্রিয়, অথচ এরূপ আজ্ঞাবহ যে অধ্যক্ষের আদেশে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও অকম্পিতহৃদয়।"

এদেশে লোক নিজ নিজ মতপ্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ ব্যগ্র এবং সামান্য মতের বিভিন্নতার জন্য এত সহজে এক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া আর এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে যে, এখানে কোন সম্প্রদায়ই অধিক দিন স্থায়ী হয় না, বা স্থায়ী হইলেও তাহার মূল লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারে না। স্বামীজি সেইজন্য এই নবপ্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসিসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই; যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতারহিত হইয়া দূর করিয়া দাও—বিশ্বাসঘাতক যেন কেহ না থাকে। বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ এই লতা ও কুকুরের ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও।"

যাইবার দিন (২০শে জুন, ১৮৯৯) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কলিকাতার বাটীতে স্বামীজি, তুরীয়ানন্দ ও মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানদের প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইলেন। অপরাহ্ণে তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া দুই গুরুভ্রাতা প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে চলিলেন। সেখানে তাঁহাদিগকে ও নিবেদিতাকে বিদায় দিবার জন্য অনেক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল। সকলেরই মুখে একটা বিষাদের রেখা। স্বামীজি বাহিরে বেশ প্রফুল্ল ছিলেন এবং সকলেই উৎসাহ দিতেছিলেন। তবে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল, তখন প্রত্যেকেরই প্রাণের বেদনা মুখাবয়বে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তিনি যে তাহাদের বড় আদরের 'স্বামীজি'!—আর তুরীয়ানন্দ? —সেই সরল, সদাপ্রফুল্ল, হাস্যবিকশিতনয়ন, একনিষ্ঠ বাল-ব্রহ্মচারী— স্বামীজি যাঁহাকে বলিয়াছেন 'জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা'—তিনিও তাহাদের কম স্নেহ ভালবাসার পাত্র নহেন! এই আজন্মসংযমী, কঠোরতপস্বী ও শুদ্ধাচারী মহাত্মা প্রথমে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিতে সম্মত ছিলেন না, কিন্তু স্বামীজির সকাতর অনুরোধ ও স্নেহের আব্দারে তাঁহাকে পরিশেষে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি গঙ্গাজল সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিয়াছিলেন। আর প্রচারকার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া ইচ্ছা ছিল

বেদান্তদর্শন ও অন্যান্য কয়েকখানি প্রধান প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্গে লইবেন। কিন্তু স্বামীজি নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'বিদ্যের চচ্চড়ি আর পাঁজিপুঁথি তারা যথেষ্ট দেখেছে। ক্ষাত্র-শক্তির পরিচয় খুব করে পেয়েছে, এখন দেখাতে চাই 'ব্রাহ্মণ'।' অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনের জন্য যুক্তিতর্কের বাহুল্য ও পরপক্ষনির্ণয়ের অসাধারণ শক্তি তাহারা স্বামীজির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু শমদমতিতিক্ষাদি ব্রাহ্মণোচিত-গুণভূষিত প্রকৃত সত্ত্বসংস্কার ও তপঃশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারা কখনও দেখে নাই। এখন এই আদর্শ ব্রাহ্মণ দেখাইবার জন্য তিনি তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ 'তু— ভায়া'কে সঙ্গে লইলেন।

যে জাহাজে তাঁহারা যাত্রা করিলেন উহার নাম 'গোলকুণ্ডা'। ২৪শে জুন উহা মান্দ্রাজে পৌঁছিল। ইতঃপূর্ব্বেই তারযোগে স্বামীজির গমনবার্ত্তা সেখানে পৌঁছিয়াছিল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সমুদ্রতীরে আগমন করিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার ন্যায় এখানেও প্লেগের ভয়ে ভারতীয় যাত্রীদিগকে তীরে নামিতে দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং সকলেরই আশা বিফল হইল। কয়েকদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজবাসীরা মাননীয় পি আনন্দ চার্লুর সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করিয়া স্থির করেন যে স্বামীজিকে মান্দ্রাজে নামিবার হুকুম দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন। অনুরোধ করাও হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রমুখ স্বামীজির পূর্ব্বতন যুবক শিষ্যেরা নৌকায় করিয়া জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ফলফুল ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। স্বামীজি রেলিং-এর ধারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন, শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আলাসিঙ্গা 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্র-পরিচালন সম্বন্ধে স্বামীজির

সহিত পরামর্শ করিবেন বলিয়া কলম্বো পর্যান্ত টিকিট লইলেন। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়িলে শত শত মান্দ্রাজী বালকবালিকা, যুবা ও বৃদ্ধের কণ্ঠ হইতে স্বামীজির উদ্দেশ্যে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমুদ্র-কল্লোলের সহিত মিশ্রিত হইল।

মান্দ্রাজপরিত্যাগের চারি দিবস পরে জাহাজ কলম্বোতে পৌঁছিল। কলম্বোতে স্বামীজিকে নামিবার অনুমতি দেওয়া হইল। এখানে স্যার কুমারস্বামী, মিঃ অরুণাচলম প্রভৃতি পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আরও বহু ভক্ত স্বামীজির দর্শনলাভের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি মিসেস্ হিগিনের বৌদ্ধবালিকাবিদ্যালয় এবং কাউন্টেস কানোভারার স্ত্রীমঠ ও স্কুল পরিদর্শন করিলেন।

২৮শে জুন জাহাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিল। এডেন পর্য্যন্ত মৌসুমি বায়ুর প্রাবল্যে জাহাজ বড় দুলিতে লাগিল এবং ছয় দিনের পথ দশ দিনে পৌঁছিল। সকোট্রায় মৌসুমি বায়ুর বিষম বাড়াবাড়ি, তারপর সমুদ্র অনেকটা ঠাণ্ডা। ৮ই জুলাই ষ্টীমার এডেনে ও ১৪ই সুয়েজ বন্দরে পৌঁছিল। পথে নেপ্‌লসে একবার ধরিয়া মার্সেলে পৌঁছিল এবং ৩১শে জুলাই লণ্ডনে উপস্থিত হইল।

সমুদ্রপথে এই দীর্ঘ দেড়মাসকাল স্বামীজি ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, মহাপুরুষগণের ইতিহাস ও মানবসভ্যতা সম্বন্ধে বহুবিধ প্রসঙ্গে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এই সকল প্রসঙ্গ পরম যত্নসহকারে তাঁহার 'দি মাষ্টার এজ আই স হিম' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। স্বামীজি নিজেও আসিবার সময় 'উদ্বোধনে'র সম্পাদককে এই ভ্রমণের বিবরণ প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই জন্য মাঝে মাঝে বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সেইগুলি এক্ষণে একত্র হইয়া 'পরিব্রাজক' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামীজির সাহচর্য্যলাভের এই সুযোগ নিবেদিতার শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও স্বামীজির জীবনোদ্দেশ্য বুঝিবার উপায় হিসাবে বড় অনুকূল হইয়াছিল। এই সুযোগ নিবেদিতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও উপেক্ষা করেন নাই। শ্রীগুরুদেবের সহিত সমুদ্রবক্ষে এই অর্দ্ধেক জগৎ ভ্রমণকে তিনি 'আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্রচিত এই ভ্রমণের সুললিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা স্বামীজিকে নানাবিধ ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়া দেখিতে পাই। নিবেদিতা লিখিতেছেন—

"এই সমুদ্রভ্রমণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিরাম বহুবিধ ভাব ও গল্পের স্রোত বহিয়াছিল। কোন্ মুহূর্ত্তে যে স্বামীজির হৃদয়দ্বারে সত্যের আলোক সহসা স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং সেই নব নব অনুভূতির বার্ত্তা আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকিবে, তাহা আমরা কেহই জানিতাম না। যাত্রার প্রারম্ভে প্রথম দিন অপরাহ্ণে আমরা গঙ্গাবক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময়ে স্বামীজি সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ, বয়স যত বাড়িতেছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি মনুষ্যত্বের বিকাশই এ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই অভিনব বার্ত্তাই আমি জগৎকে শুনাইতে আসিয়াছি। যদি অসৎ কর্ম্ম কর, তবে তাহাও মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হইতে হয় তবে একটা বড় গোছের দুষ্ট হও।' এই প্রসঙ্গে আমার আর একদিনকার কথা মনে পড়িতেছে, যেদিন আমি স্বামীজিকে ভারতের অপরাধীর সংখ্যা অল্প বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি সখেদে কহিয়াছিলেন, 'হা ভগবান! এরূপ না হইয়া যদি ইহার বিপরীত হইত! কারণ এই যে আপাতদৃষ্ট ধর্ম্মভাব বা অপরাধের অল্পতা—এটা মৃত্যুর লক্ষণ।' শিবরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, যশোধরা, বিক্রমাদিত্যের বিচারসিংহাসন, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি শত সহস্র ভারতীয় কাহিনী দিবারাত্রই আলোচিত হইত। আর বিশেষত্ব এইটুকু

যে, কোন জিনিস দুইবার বলিতেন না। সবই নূতন—জাতিতত্ত্বের কথা, পুরাতন ভাবের পুনরুক্তি ও সমালোচনা, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মের কথা এবং সর্ব্বোপরি মানবজাতির মানবত্বের সমর্থন—যে মানবত্ব কখনও একেবারে অন্তর্হিত বা ক্ষীণবীর্য্য হয় নাই—যাহা সর্ব্বকাল পতিতের উদ্ধার ও দুর্ব্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য সিংহবিক্রমে মহিমার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছে—সবই নূতন। আচার্য্যদেব আসিয়াছিলেন ও চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের স্মৃতির ফলকে তিনি উজ্জ্বল অক্ষরে যে মানব-প্রীতির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও লুপ্ত হইবার নহে।"

৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌঁছিয়া টিলবেরী ডকে অবতরণ করিবামাত্র অনেকগুলি শিষ্য ও বন্ধুর সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইল। ইহার মধ্যে দুইজন আমেরিকান মহিলাকে দেখিয়া তিনি বিস্ময় বোধ করিলেন। ইঁহারা একখানি ভারতীয় পত্রিকায় তাঁহার সমুদ্রযাত্রার খবর পাইয়া ও তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ-সংবাদে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সুদূর ডিট্রয়েট হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এবারে স্বামীজি লণ্ডনে সাধারণ সভায় কোন বক্তৃতা দেন নাই। মাঝে মাঝে শুধু কথোপকথন হইত মাত্র। ১৬ই আগষ্ট আমেরিকা-বাসীদিগের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দ ও আমেরিকান শিষ্যদিগের সহিত লণ্ডন ত্যাগ করিলেন।

ক্যালিফর্নিয়ায় বেদান্তপ্রচার

নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের সহিত সাক্ষাতের পর স্বামীজি তাঁহাদের 'রিজ্‌লে ম্যানর' নামক একটি সুন্দর পল্লীনিকেতনে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানটি নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূর এবং হাডসন নদীর তীরে কাট্‌স্‌কিল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। একমাস পরে ভগিনী নিবেদিতাও ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। গৃহস্বামী ও তাঁহার পত্নী স্বামীজিকে অত্যন্ত যত্ন ও পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ বোধ করিলেও মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেন। এখানে একজন বিখ্যাত অষ্টিওপ্যাথ চিকিৎসাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত এই পল্লীবাসে কাটিল। স্বামী অভেদানন্দ সে সময়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নিউইয়র্কে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইল। তিনি আসিয়া দশ দিন স্বামীজির নিকট রহিলেন। তাঁহার মুখে আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের জন্য একটি স্থায়ী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া স্বামীজি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ১৫ই অক্টোবর 'বেদান্ত সমিতি-গৃহে' প্রবেশানুষ্ঠান স্বামী অভেদানন্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইল এবং ২২শে পর্য্যন্ত তিনি এখানে ক্লাস করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দও শীঘ্র নিউইয়র্ক হইতে কিঞ্চিৎ দূরে মণ্ট ক্লেয়ার নামক স্থানে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বেদান্ত সমাজগৃহেও তিনি নিয়মিত বক্তৃতা দিতে লাগিলেন ও পরে মাসাচুসেট্‌সের অন্তর্গত কেম্ব্রিজ শহরে অনেক হিতকর কার্য্য করেন।

৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে প্রথম সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার সহিত অনেক নূতন

সভ্যের পরিচয় করিয়া দিলেন। তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে সেই রাত্রেই স্বামীজি একটি সাধারণ অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ১০ই তারিখে সাধারণের পক্ষ হইতে বেদান্ত সমিতির লাইব্রেরীতে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করা হইল। এই উপলক্ষে স্বামীজি অনেক পুরাতন বন্ধু ও ভক্তের সাক্ষাৎ পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন, যাঁহারা লোকমুখে তাঁহার নাম, কাহিনী ও খ্যাতি শুনিয়া বা তদ্রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাঁহার দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। পুরাতন বন্ধুরা একটি অভিনন্দন প্রদান করিলে তিনি তাহার যথাবিধি উত্তর-প্রদানকালে বলিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ভাব পূর্ব্ববৎ অবিকৃত স্নেহপরিপূর্ণ আছে।

নিউইয়র্কে দুই সপ্তাহ অবস্থান করিয়া এবং তৎকালমধ্যে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য শহরে গতায়াত করিয়া স্বামীজি ২২শে নভেম্বর ক্যালিফর্নিয়া যাত্রা করিলেন। পথে চিকাগোর পূর্ব্বতন বন্ধুদিগের সাগ্রহ আহ্বানে তিনি কিয়দ্দিন তাঁহাদিগের নিকট অতিবাহিত করিলেন এবং সানন্দে তৎপ্রদত্ত অভিনন্দনাদি গ্রহণ করিলেন। তারপর ডিসেম্বরের প্রথমেই ক্যালিফর্নিয়া পৌঁছিলেন এবং ৭ই জুনের পূর্ব্বে আর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না।

ক্যালিফর্নিয়া পৌঁছিয়া প্রথমেই তিনি লস্ এঞ্জেলেস নামক স্থানে মিসেস্ ব্লজেটের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এখানে নানাবিধ ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত হইল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে আহ্বানের পর আহ্বান আসিতে লাগিল। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাধারণের সমক্ষে অনেকগুলি বক্তৃতা দিতে হইল।

৮ই ডিসেম্বর ব্লাঞ্চার্ড হলে 'বেদান্তদর্শন'বিষয়ক বক্তৃতা হয়। পরে দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বিজ্ঞান পরিষদ নামক সমিতির তত্ত্বাবধানে এ্যামিটী

চার্চ্চে 'বিশ্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। লস্ এঞ্জেলেসের সাধারণ বক্তৃতাগারেও কতকগুলি বক্তৃতা হয়। তন্মধ্যে এই তিনটি প্রধান—'কর্ম্মরহস্য' (জানুয়ারী ৪,১৯০০), 'মনের শক্তি' (৮ জানুয়ারী), 'সুস্পষ্ট রহস্য'।

নিকটবর্ত্তী প্যাসাডেনা শহরে 'ইউনিভারসালিষ্ট চার্চ্চ' ও 'সেক্সপীয়ার ক্লাব'-এ কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা হয়। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি শ্রোতৃবর্গের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল—'ঈশদূত যীশুখৃষ্ট' এবং 'বিশ্বজনীন ধর্ম্মসাধনার উপায়' এই দুইটি বক্তৃতায় শ্রোতার সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছিল। সেক্সপীয়ার ক্লাবের বিশেষ আহ্বানে তিনি 'ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনী' সম্বন্ধে 'রামায়ণ' (৩১শে জানুয়ারী), 'মহাভারত' (১লা ফেব্রুয়ারী), 'জড়ভরতোপাখ্যান' এবং 'প্রহ্লাদচরিত' এই চারিটি বক্তৃতা দেন। মোটের উপর দশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত লস্ এঞ্জেলেস ও প্যাসাডেনা শহরে তিনি সাধারণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে প্রায় প্রত্যহ একটি করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বোধ হইল যেন তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় ঐ স্থানের জলবায়ু ভাল ছিল বলিয়া তাঁহার শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি বা কষ্ট হয় নাই।

'সত্য নিকেতন' নামক একটি সভার আগ্রহাতিশয্যে তিনি তাঁহাদের লস্ এঞ্জেলেস্স্থিত প্রধান কেন্দ্রে প্রায় একমাস অতিবাহিত করিলেন এবং অনেকগুলি ক্লাস করিয়া প্রশ্নোত্তর-রীতিতে নানাবিধ সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। এই সভা কর্ত্তৃক আহূত কতকগুলি সাধারণ সভায় সময়ে সময়ে সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। এই সময়ে স্বামীজি প্রায়ই 'ফলিত মনস্তত্ত্ব' ও 'রাজযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন; কারণ দেখিলেন যে ক্যালিফর্নিয়া-বাসিগণ ঐসকল বিষয় শুনিতে বিশেষ ব্যগ্র। সত্য নিকেতনের অনেক

সভ্য স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি, অলৌকিক বিদ্যাবত্তা ও সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট আধ্যাত্মিকতা তাঁহাদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহাদের সভার নিয়ম অনুসারে সভাগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বামীজির প্রতি ভালবাসায় কেবলমাত্র তাঁহার জন্য এ নিয়ম রহিত করা হইয়াছিল।

লস্ এঞ্জেলেস ত্যাগ করিয়া স্বামীজি ওক্ল্যাণ্ডের রেভারেণ্ড ডাক্তার বেঞ্জামিন ফে মিল্‌স্ মহোদয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অধীন ফার্ষ্ট ইউনিটারিয়ান চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ড নামক ধর্ম্মভবনে বিরাট জনতার সমক্ষে আটটি বক্তৃতা দেন। সময়ে সময়ে এই সভায় দুই সহস্রেরও অধিক শ্রোতা সমবেত হইত। প্রতি বক্তৃতার পরদিন ক্যালিফর্নিয়া প্রদেশের সমস্ত সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে তাঁহার নাম ও বক্তৃতা মুদ্রিত হইত। ঐ সময়ে রেভারেণ্ড মিল্‌স্ সাহেবের গীর্জ্জায় একটি স্থানীয় ধর্ম্ম-কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই বক্তৃতাগুলি তদুপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সুযোগে কালিফর্নিয়ার শত শত ধর্ম্মযাজক স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া পরস্পরের ধর্ম্মভাব জানিতে পারেন এবং অনেকে তাঁহার ভাবের শ্রেষ্ঠতা-দর্শনে শ্রদ্ধামুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। এই বিশাল লোকসভায় স্বামীজি 'হিন্দুমতে মুক্তির পথ' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলে রেভারেণ্ড ডাঃ মিলস্ স্বামীজির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া এইরূপ ভাবে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন—'ইনি একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পুরুষ ; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতগণও ইঁহার তুলনায় সামান্য শিশুমাত্র।'

ক্যালিফর্নিয়া রাজ্যের বিদ্বৎসমাজে স্বামীজির প্রভাব শীঘ্রই বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে উহার রাজধানী স্যান্‌ফ্রানসিস্কোর বহু গণ্যমান্য অধিবাসীর অনুরোধে তিনি মে মাস পর্য্যন্ত সেই স্থানেই

অবস্থান করিলেন। 'গোল্ডেন গেট হল' নামক স্থানে 'সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের আদর্শ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছিলেন। টাকার ষ্ট্রীটে একটি বিস্তৃত বাটীতে ব্যক্তিগত উপদেশদানের ব্যবস্থা হইল। সেখানে তিনি নিয়মপূর্ব্বক 'রাজযোগ' ও 'ধ্যানধারণা' শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং কতকটা সাধারণভাবে গীতা ও বেদান্তদর্শনের উপর বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

স্যানফ্রান্সিস্কোতে প্রতি রবিবার রেড্ মেন্স্ হল, গোল্ডেন গেট হল ও ইউনিয়ন স্কোয়ার হল নামক স্থানে সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ওয়াশিংটন হলেও সপ্তাহে তিনটি করিয়া সান্ধ্য বক্তৃতা এবং পরে সোস্যাল হলে 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে পর পর অনেকগুলি ছোট ছোট বক্তৃতা দেন। ইহা ব্যতীত একদিন অন্তর সন্ধ্যাবেলা এলামেডা ও ওকল্যাণ্ড-এ বক্তৃতা দিতেন। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশটি বক্তৃতা দেওয়া হয়। তাহার অধিকাংশই রাজযোগ, প্রাণায়াম, এবং কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষ-সম্বন্ধীয়।[১] এই সময়ে স্বামীজি যেসকল বহুমূল্য বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার অতি অল্পই এক্ষণে পাওয়া যায়। হায়! সেই গুরুভক্ত গুড্উইন সাহেব এ সময় জীবিত ছিলেন না। সুতরাং অনেক বক্তৃতাই সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। সংবাদ-

১। কতকগুলি বক্তৃতার বিষয় এখানে উল্লিখিত হইল, যথা—'বিশ্ববাসীর নিকট বুদ্ধের বাণী', 'আরবের ধর্ম্ম ও হজরত মহম্মদ', 'বেদান্তদর্শন কি ভাবী ধর্ম্ম?' 'বিশ্ববাসীর নিকট যীশুখৃষ্টের বার্ত্তা', 'জগতের নিকট মহম্মদের বাণী', 'বিশ্ববাসীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাণী', 'মন এবং উহার শক্তি ও সম্ভাবনীয়তা', 'মানসিক উৎকর্ষ ও মনঃসংযোগ', 'প্রকৃতি ও পুরুষ', 'আত্মা ও ঈশ্বর', 'উদ্দেশ্য কি?' 'প্রাণায়াম-বিজ্ঞান', 'ধ্যান', 'ধর্ম্মাচরণ', 'প্রাণায়াম ও ধ্যান', 'উপাস্য ও উপাসক', 'আনুষ্ঠানিক উপাসনা', 'ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান'।

পত্রে ঐসকল বক্তৃতার যে সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইত তাহারই কতক সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র।

প্রাণায়াম-সম্বন্ধে স্বামীজি বলিলেন যে, শ্বাসজয় হইলে চিত্তজয় হয়। এই প্রসঙ্গে একবার তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

একদিন আমেরিকায় এক নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি একদল যুবকের দেখা পান। তাহারা একটি সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া নিম্নস্থ জলস্রোতের উপর ভাসমান কতকগুলি ডিমের খোলা লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতেছিল। অনেকেই চেষ্টা করিল, কিন্তু একজনও লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইল না। স্বামীজি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন এবং মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন। দলের একজন তাহা দেখিতে পাইয়া অভিমানে আহত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "ওহে বাপু, কাজটা যত সহজ মনে করছো অত সহজ নয়। এসো দেখি একবার এদিকে। দেখি তোমার কেমন তাগ।" স্বামীজি কিছু না বলিয়া তাহার হস্ত হইতে বন্দুক গ্রহণ করিলেন এবং উপর্য্যুপরি ১২টা খোলা গুলিবিদ্ধ করিলেন। তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া ভাবিল, এ ব্যক্তি নিশ্চিত বহুদিন গুলিচালনা অভ্যাস করিয়াছে, তারই ফলে এরূপ সিদ্ধহস্ত। স্বামীজিকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে তিনি পূর্ব্বে কখনও বন্দুক হাতে করেন নাই। শেষে বলিলেন যে উহা কিছুই নয়। উহার ভিতরকার মন্ত্র হইতেছে—মনঃসংযম।

ক্যালিফর্নিয়াতে বেদান্তদর্শনের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লস্ এঞ্জেলেস ও পেসাডেনায় তাঁহার ছাত্রগণের উদ্যোগে নিয়মমত বেদান্ত সভার অধিবেশন হইতেছিল এবং তাঁহারা স্বামীজিকে সেখানে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্রের উপর পত্র লিখিতেছিলেন, কিন্তু স্যানফ্রান্সিস্কো ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কার্য্যে স্বামীজি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন

বলিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তবে সুবিধামত শীঘ্রই অন্য কোন সন্ন্যাসি-শিক্ষককে সেখানে পাঠাইবেন এরূপ অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহার উৎসাহী শিষ্যা মিসেস্ হেন্‌স্‌বরো ততদিন পর্য্যন্ত দৃঢ় উদ্যমের সহিত ওখানকার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। একদিকে ক্যালিফর্নিয়া ষ্টেটের উত্তরাংশে স্যান্‌ফ্রানসিস্কো, ওক্‌ল্যাণ্ড ও আলামেডো প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বেদান্তপ্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। স্যান্-ফ্রান্‌সিস্কোতে যে বেদান্ত-সমিতি স্থাপিত হইল স্বামীজির শিষ্য ডাঃ এস এইচ লোগ্যান, মিঃ সি এফ্‌ প্যাটার্সন এবং মিঃ এ এস্ ওলবার্গ যথাক্রমে তাহার প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা এখানে স্থায়িভাবে বেদান্তের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য একজন ভারতীয় আচার্য্যের প্রয়োজন অনুভব করেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন স্বামীজির পক্ষে জগতের চতুর্দ্দিকের কার্য্যভার মস্তকে লইয়া একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করা সম্ভবপর হইবে না। স্বামীজিকে সেই জন্য তাঁহারা আর একজন আচার্য্যকে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজিও তদনুসারে তুরীয়ানন্দকে ক্যালিফর্নিয়ায় আসিবার জন্য লিখিয়াছিলেন।

ক্যালিফর্নিয়া ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বামীজি মিস্ মিনি বুক নাম্নী একজন ভক্তিমতী শিষ্যার নিকট হইতে বেদান্তপাঠার্থীদিগের শাস্ত্রপাঠের সুবিধার জন্য ১৬০ একর পরিমিত একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড দানস্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানটি ক্যালিফর্নিয়ার অন্তর্গত 'সাণ্টা ক্লারা' নামক অঞ্চলে হ্যামিল্টন পর্ব্বতের সানুদেশে সমুদ্রতীর হইতে ২৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত—রেলষ্টেশন হইতে ৫০ মাইল এবং লোকালয় হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী এবং চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত ও অরণ্যানী-বেষ্টিত। স্বামীজি নিজে এই জায়গা দেখিতে যাইতে পারিলেন না। তবে ইহার বিবরণ শুনিয়া সন্তোষলাভ করিলেন। বুঝিলেন ইহা বেদান্তসাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে।

এখানে পরে যে আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নাম দেওয়া হয় 'শান্তি আশ্রম'। ২রা আগষ্ট স্বামী তুরীয়ানন্দ সর্ব্বপ্রথম বার জন ছাত্রকে ধ্যানধারণা শিখাইবার জন্য এস্থানে আগমন করেন এবং দুইমাস কাল থাকেন। তদবধি স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ প্রতি বৎসর দুই মাসকাল এস্থানে আসিয়া যাপন করেন।

১৯০০ সালের বসন্তের শেষভাগে স্বামীজি বন্ধুবর্গসমভিব্যাহারে বিশ্রামার্থ ক্যাম্পটেলর নামক পল্লীগ্রামে গমন করিলেন। ক্যালিফর্নিয়ায় উপর্য্যুপরি বক্তৃতা দিয়া তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন এবং স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কায় বায়ু-পরিবর্ত্তন ও কিয়ৎকাল বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। এখানে তিন সপ্তাহ থাকিয়া যখন তিনি স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন তখন ওক ষ্ট্রীটে তাঁহার শিষ্য ডাক্তার লোগানের বাটীতে তাঁহাকে থাকিতে হইল। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে দিবারাত্র থাকার প্রয়োজন হওয়াতেই এরূপ ব্যবস্থা হইল। ডাঃ উইলিয়ম ফরষ্টার নামক অপর একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকও স্বামীজিকে দেখিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়া একরূপ বন্ধ হইল, শুধু গীতা সম্বন্ধে চারিটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ক্যালিফর্নিয়ায় তাঁহার বক্তৃতায় কিরূপ ফল হইয়াছিল তাহা ৯ই মে তারিখে স্যানফ্রান্‌সিস্কো হইতে প্রেরিত 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে উপলব্ধ হইবে—

"স্বামীজির উপদেশ আমাদিগের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি মুখে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও তাঁহার দর্শনলাভে আমরা অধিক মুগ্ধ হইয়াছি। এই মনস্বী বীরপুরুষের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই যেন শিরায় শিরায় তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। তাঁহার প্রকৃতি অতি সরল ও নম্র, এবং কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। ইনি শুধু

আশ্চর্য্য লোকশিক্ষক ও দার্শনিক নহেন, পরন্তু কবিতার দেশ হইতে আগত একজন কবি।"

'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রেও আর একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন—

"তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রতি সাধারণের অনুরাগ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন অবশ্য ঠিক বলা যায় না, কিন্তু আশা হয় যে এই উৎসাহ স্থায়ী হইবে। আর তিনি নিজেও মনে করেন ক্যালিফর্নিয়ার জলবায়ু ও সামাজিক অবস্থা প্রাচ্যচিন্তাবিস্তারের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সুতরাং খুব বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ইহাই ভারতীয় চিন্তারাশি-বিকিরণের প্রধান কেন্দ্র এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনভূমি হইয়া দাঁড়াইবে" ইত্যাদি।

এই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মের মধ্যেও স্বামীজি মাঝে মাঝে শিষ্যদিগের সহিত আমোদ-আহ্লাদ ও রহস্য-কৌতুকাদিতে সময়ক্ষেপ করিতেন। ক্যাম্পটেলরের মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিয়া তিনি বেশ স্বাস্থ্যোন্নতি বোধ করিয়াছিলেন। অনেক সময় শিষ্যদিগের আহ্বানে পাহাড়ের ধারে বনভোজনে যোগদান করিতেন। সময় সময় তাঁহাকে বেশ সহজ মানুষের মত প্রফুল্ল ও হাস্যপরিহাসরত দেখিতে পাওয়া যাইত, আবার কখন তাঁহার চিত্ত এক অজ্ঞাত ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া যাইত, তখন তিনি গম্ভীর হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চ উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ব্যতীত অন্য কথা বাহির হইত না। মিঃ মীড্ নামক লস এঞ্জেলেসের একজন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কারের তিনটি কন্যা তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিসেস্ হেন্স্বরোর নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি স্বামীজির সেবায় সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন; যেকোন আদেশের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন—যেন স্বামীজির সেবা করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিলে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া যাইত। অনেক সময় স্বামীজি কলার ও হাতের কাফের বোতাম আঁটিতে না পারিলে

তাঁহাকেই উহা পরাইয়া দিবার জন্য ডাকিতেন। তাঁহাদের নিকট তিনি ভারতবর্ষের ও ভারতীয় আদর্শের নানাবিধ বর্ণনা করিতেন, তাঁহারাও সাধ্যমত তাঁহার ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু এই বালকোচিত সরলতা ও রহস্যপ্রিয়তার মধ্যেও পরব্রহ্মের প্রতি যে একটা বিষম আকর্ষণ তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন, এই সময়ের প্রত্যেক বক্তৃতা, কথাবার্ত্তা ও চিঠিপত্রাদিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আলামেডা হইতে ১৮ই এপ্রিল (১৯০০) তারিখে মিস্ ম্যাক্লাউড্‌কে তিনি যে পত্র লিখেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে স্বামীজির এই সময়কার অন্তরের ভাব বেশ পরিষ্কার জানিতে পারিবেন।

"কর্ম্ম করা সব সময়ে কঠিন। প্রার্থনা কর যেন চিরদিনের জন্য আমার কাজ করা ঘুচে যায়, আর আমার সব মন প্রাণ যেন মায়ের চরণে মিশে যায়। তাঁর কার্য্য তিনিই জানেন।

"আমি ভাল আছি—মানসিক খুবই ভাল। শরীরের চাইতে মনের শান্তিটাই বেশী দেখতে পাচ্ছি। লড়ায়ে হার-জিত সবই হলো, এখন তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব শিব পার কর মেরা নেইয়া'—হে শিব, এখন আমার তরী পারে নিয়ে চল।

"যাই হোক, এখন আমি সেই আগেকার বালক, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব উপদেশ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতো—ঐটেই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি। কর্ম্ম, পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু করেছি সবই বহিরাবরণমাত্র।

"এখন আবার তাঁর ডাক শুনতে পাচ্ছি, সেই চিরপরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর—যা স্মরণ হলেও মন আনন্দে নেচে ওঠে। শেকল সব খসছে, ভালবাসার বন্ধন টুটে যাচ্ছে, কার্য্যে অরুচি হয়েছে, জীবনের মোহ

কেটেছে; তার স্থলে বাজছে শুধু প্রভুর আহ্বানধ্বনি! যাই প্রভু, যাই। ঐ তিনি বলছেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে—তুই এখন চলে আয়'! যাই প্রভু, যাই।

"হাঁ, এবার ঠিক চলেছি। সম্মুখেই অনন্ত শান্তিময় নির্ব্বাণসমুদ্র! স্পষ্ট অনুভব করছি তাতে এতটুকু বীচিবিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য নাই।

"আমি যে জন্মেছি তার জন্য আমি খুশী, এত যে দুঃখভোগ করেছি তার জন্যও খুশী, এত যে বড় বড় ভুল করেছি তাতেও খুশী, আবার এখন যে শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করতে চলেছি তাতেও খুশী। আমি কাহাকেও বন্ধনদশায় ফেলে যাচ্ছি না—নিজেও কোন বন্ধন নিয়ে যাচ্ছি না। এ শরীরটা ভেঙ্গে চুরে আমায় মুক্তি দিক, কিংবা আমি সশরীরেই মুক্তি পাই—আমার পুরাতন 'আমি'টা চলে গেছে, একেবারে চিরদিনের জন্য গেছে, আর ফিরছে না।

"পথপ্রদর্শক, গুরু, নেতা বা আচার্য্য বিবেকানন্দ আর নাই—আছে শুধু সেই পূর্ব্বের বালক, শিক্ষার্থী, গুরুপদাশ্রিত অধীন সেবক।

"বুঝতে পারছ কেন আমি —র কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি কে যে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করতে যাব? আমি বহু দিন নেতৃত্বপদ পরিত্যাগ করেছি—এখন আর কোন কথা বলার শক্তি আমার নেই! এই বছরের প্রথম থেকে আমি ভারতে আমার মতে কাজ করবার কোন চেষ্টা করি নি। তুমি ইহা জান।...তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিতুম সেই সময়টাই গিয়েছে আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মধুময় মুহূর্ত্ত। এখন আবার সেইরূপ গাভাসান দিয়েছি। উপরে ভগবান অংশুমালী শুভ্র নির্ম্মল কিরণজাল বিস্তার করছেন—নিম্নে পৃথিবী শ্যামল-শস্যসম্পৎশালিনী এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই স্থির, নিস্তব্ধ ও শান্ত। এ অবস্থায় আমিও অবশ জড়ের মত নদীর

আরামপ্রদ তরঙ্গে গা ভাসিয়ে চলেছি। এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের চাঞ্চল্য উৎপাদন করতে আমার সাহস হচ্ছে না, পাছে প্রাণের এ অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি নষ্ট হয়ে যায়—যে নিস্তব্ধতায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় জগৎটা মরীচিকা বই আর কিছু নয়!

"এতদিন আমার কর্ম্মের মধ্যে একটা উচ্চাভিলাষ ছিল, আমার ভালবাসার মধ্যে পাত্রবিচার ছিল, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ভয় ছিল এবং আমার নেতৃত্বের ভিতর ক্ষমতাপ্রিয়তা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এখন সেসব অন্তর্হিত হচ্ছে, আর আমি উদাসপ্রাণে ভেসে চলেছি। যাই মা, যাই। তোমার কোলে উঠে—তুমি যে দিকে নিয়ে যেতে চাও সেই দিকে—সেই অরূপ অস্পর্শ অশব্দ অজ্ঞাত অদ্ভুত রাজ্যে, অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আর আমার দ্বিধা নেই।

"ওঃ কি শান্তি! বোধ হচ্ছে যেন আমার চিন্তারাশি হৃদয়ের দূরতম প্রদেশ থেকে অতি ক্ষীণ অস্ফুট ধ্বনির মত আসছে, চারিদিকে শান্তি, মধুর শান্তি—নিদ্রাকর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সকল বস্তু যখন ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হয় তখনকার মত শঙ্কাহীন, অনুরাগহীন, আবেগহীন—শান্তি! যাই প্রভু, যাই।

"জগৎ আছে বটে, কিন্তু তা সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়—শুধু একটা অনুভূতিমাত্র। কিন্তু সে অনুভূতিতে কোন হৃদয়ভাব বিক্ষুব্ধ হয় না। ওঃ কি তৃপ্তি! সবই সুন্দর, সবই ভাল, কারণ আমার কাছে তাদের কোনরূপ তারতম্য বা ইতরবিশেষ নাই। ওঁ তৎ সৎ!"

হায় পরিবর্ত্তন! যে বীরকেশরীর বজ্রনির্ঘোষে একদিন জগতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমার্দ্ধ প্রকম্পিত হইয়াছে, যাঁহার অদম্য কর্ম্মশক্তি প্রবল বাড়বানলের ন্যায় নির্জীব ভারতবাসীর প্রাণে কর্ম্মানুরাগের আগুন জ্বালাইয়াছে, যাঁহার

হৃদয়সমুদ্র মন্থন করিয়া বর্ত্তমান ভারতের যুগাদর্শ উত্থিত হইয়াছে, ইনি সেই বিবেকানন্দ নহেন। জীবনের কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া কর্ম্মশ্রান্ত বীর এখন জগজ্জননীর ক্রোড়ে চিরবিশ্রামলাভের জন্য আকুল। ইহলোকের কোন বস্তুতেই আর তাঁহার রাগ, দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষার আগ্রহ নাই। পরপারের যাত্রী জীবন-নদীর বেলাভূমিতে বসিয়া শুধু শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন!

ক্যালিফর্নিয়ায় অবস্থানের শেষভাগে স্বামীজি লণ্ডন হইতে মিঃ লেগেট ও তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহারা স্বামীজিকে স্বাস্থ্যের জন্য জুলাই মাসে পারীতে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর পারী-প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি বৃহতী ধর্ম্মেতিহাস-সভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল; এবং ঐ সভার বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডলী-সংক্রান্ত-সমিতি তাঁহাকে উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আমেরিকা-ত্যাগের পক্ষে দুইটি কারণ উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার নিউইয়র্কে আরও কিছুদিন কাটাইবার ইচ্ছা ছিল। এইজন্য মে মাসের শেষে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কো, আলামেডা এবং ওকল্যাণ্ডের শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পথে তিনি চিকাগো ও ডেট্রয়েটে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া নিউইয়র্কে পৌঁছিলেন এবং তত্রত্য বেদান্ত সোসাইটীর প্রধান কার্য্যালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উক্ত সোসাইটীর কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন। মিঃ লেগেট কার্য্যানুরোধে উক্ত সভার অধ্যক্ষতা ত্যাগ করাতে কলম্বিয়া কলেজের ডাক্তার হার্শেল সি পার্কার মহোদয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য সভ্যের মধ্যে রেভারেণ্ড ডাঃ আর হিবার নিউটন ও

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক চার্লস আর ল্যানম্যানের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। স্বামীজি এখানে পর পর চারি রবিবারে চারিটি ও প্রতি শনিবার গীতাসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দকে ক্যালিফর্নিয়ায় প্রচারকার্য্যে যাইতে উপদেশ দিলেন। বিদায়গ্রহণকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ কার্য্যপরিচালন সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি প্রয়োজনীয় সকল কথা সমাপ্ত করিয়া শেষে বলিলেন, "যাও ভাই, ক্যালিফর্নিয়ায় আশ্রম কর। বেদান্তের ধ্বজা ওড়াও। এখন হ'তে ভারতের স্মৃতি পর্য্যন্ত মন থেকে মুছে ফেল। সব চেয়ে কেমন করে জীবনটা কাটাতে হয় এদের দেখাও, তার পর বাকীটা মা জগদম্বা করে দেবেন।"

ভারতীয় সভ্যতা, বেদান্তদর্শন এবং স্বামীজির ভাব ও কার্য্যের প্রতি যে সকল প্রখ্যাতনামা মনীষী শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম এখানে উল্লিখিত হইল—প্রফেসর শেথ লো, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ; প্রফেসর এ ভি জ্যাকসন, কলম্বিয়া কলেজের অধ্যাপক ; প্রফেসর টমাস আর প্রাইস এবং ই এন্‌গাল্‌স্‌মান, সিটি অব নিউইয়র্ক কলেজের অধ্যাপক ; এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ—রিচার্ড বথিয়েল, এন এম বাট্‌লার, এন এ ম্যাক্ লাউথ, ই জি সিলার, ক্যালভিন টমাস এবং এ কন্।

২২শে জুলাই স্বামীজি পারী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ-পর্য্যটন

পারী সহরে স্বামীজি সর্ব্বপ্রথমে লেগেট-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। মধ্যে কিছুদিনের জন্য মিসেস্ ওলি বুলের আহ্বানে বৃটানি প্রদেশের অন্তর্গত লানিয়ঁ নামক স্থানে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও দার্শনিক মসীয়েঁ জুল বোওয়ার সহিত একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি ফরাসী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলিতেন না বলিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন দ্বারা স্বামীজি ফরাসী-ভাষায় অধিকার লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

লেগেট সাহেবের গৃহে প্রত্যহ বহু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইত। স্বামীজি লিখিয়াছেন—

"আর মিঃ লেগেট্ প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর পারীস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী, যশস্বিনী নরনারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন।...

"কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ মিষ্টার লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্ব্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিকসমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃসংঘর্ষসমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত।"

সুতরাং এরূপ স্থানে পাশ্চাত্ত্যের প্রধান প্রধান বুধগণের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া চিন্তা ও মনোভাবের আদান-প্রদান এবং সনাতন ধর্ম্মের শুভবার্ত্তা-প্রচারবিষয়ে তাঁহার কিরূপ সুযোগ জুটিয়াছিল পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। তিনিও এ সুযোগ পরিত্যাগ

করেন নাই। নিঃসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছিলেন এবং সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

এবার পারীতে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি ধর্ম্মেতিহাস-সভায় বক্তৃতা-প্রদান। ইতঃপূর্ব্বে ফরাসীভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। কেবল এই সভায় বক্তৃতা দিতে হইবে বলিয়া দুইমাস পূর্ব্ব হইতে ঐ ভাষায় আলোচনা করিতেছিলেন। পারী নগরীতে পদার্পণ করার পর হইতেই বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের সহিত নিয়ত আলাপ করিয়া ক্রমশঃ সংস্কৃত দর্শনের দুরূহ ও জটিল ভাবসমূহ ফরাসীভাষায় বিনা আয়াসে প্রকাশ ও সকলের বোধগম্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার আরও বর্দ্ধিত হইয়া গেল। পণ্ডিতগণও এই আলোচনায় অনেক নূতন জিনিস শিখিয়া আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মেতিহাস-সভার ব্যাপারে একটু মজা আছে। চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভার ফলদর্শনে খৃষ্টান পাদ্রীরা—বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় যৎপরোনাস্তি হতাশ্বাস ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের আশা ছিল ঐ সভায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ফল অন্যরূপ হওয়াতে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের পরিবর্ত্তে হিন্দুধর্ম্মের উদার সমন্বয়বাদ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে, এবার যখন পারী প্রদর্শনী উপলক্ষে চিকাগোর অনুকরণে আর একটি ধর্ম্মমহাসভা-আহ্বানের প্রস্তাব উঠে তখন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন, ঐরূপ সভা নিষ্প্রয়োজন। ভয়, পাছে আবার পূর্ব্বেকার ন্যায় বিপত্তি ঘটে। সুতরাং স্থির হইল উহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া কেবল ঐ সকল ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করা হইবে 'অধ্যাত্ম-বিষয়ক মতামত সম্বন্ধে কোন চর্চ্চার স্থান' থাকিবে না।

স্বামীজি এ সময়ে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য-ভূখণ্ডে প্রাচ্যসভ্যতা ও হিন্দু-

ধর্ম্মের মুখপাত্র বলিয়া গণ্য হওয়াতে কংগ্রেস হইতে হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস-পর্য্যালোচনাবিষয়ক তর্কবিতর্কে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। 'বৈদিক ধর্ম্ম অগ্নিসূর্য্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড়বস্তুর আরাধনাসমুদ্ভূত'—পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগের এই মতখণ্ডনের জন্য ধর্ম্মেতিহাস-সভা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। স্বামীজি উক্ত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন প্রবন্ধলেখা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি কোনও মতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন এবং দুইদিন মাত্র বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রথম যেদিন তিনি কংগ্রেসে পদার্পণ করিলেন সেদিন ইউরোপ অঞ্চলে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই সভ্যবৃন্দের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। মিঃ গষ্টাভ ওপর্ট নামক একজন জর্ম্মনদেশীয় প্রাচ্যবিদ্যার্ণব একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, স্বামীজি সেই প্রবন্ধোক্ত কতিপয় বিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার জন্য প্রথম বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন। উক্ত জর্ম্মন পণ্ডিত স্বীয় প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন ও শালগ্রামশিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন এবং শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গ উপাসনা উভয়ই মূলতঃ যোনি ও লিঙ্গ পূজা হইতে উদ্ভূত। স্বামীজি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বেদ হইতে নানা প্রমাণ দেখাইয়া বলিলেন, "বেদে বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদ সংহিতায় যূপস্তম্ভকে পরব্রহ্মের প্রতিকৃতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। উহা হইতেই পরে শিবলিঙ্গের প্রচলন হয়। যেমন যজ্ঞীয় বহ্নি, যজ্ঞধূম, যজ্ঞভস্ম এবং সোম ও সমিধবাহক বৃষ হইতে পরে মহাদেবের পিঙ্গলজটা, নীলকণ্ঠ, বিভূতি ও বৃষভরূপ বাহনের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি যূপস্তম্ভের পরিবর্ত্তে শিবলিঙ্গের প্রচলন হইয়াছে এবং ক্রমে তাহা দেবত্ব লাভ করিয়া স্বয়ং শ্রীশঙ্করের ন্যায় পূজার্হ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরে

হয়ত বৌদ্ধদিগের আমলে এই শিবলিঙ্গপূজার পদ্ধতি আরও অধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; কারণ ঐ সময়ে বৌদ্ধেরা যে সকল 'স্তূপ' নির্ম্মাণ করিত তন্মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কোন একটি স্মরণচিহ্ন রক্ষিত হইত এবং ঐ স্তূপকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। দরিদ্র বৌদ্ধেরা ধনাভাবে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করাতে কালে সম্ভবতঃ ঐ ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারকস্তূপও পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং স্মারকস্তূপের প্রতি সম্মান স্তম্ভাকার শিবলিঙ্গ-পূজায় পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম 'ধাতুগর্ভ'। স্তূপমধ্যস্থ শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত, তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রামশিলা উক্ত অস্থিভস্মাদিরক্ষণশিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পূজিত হইয়া, কালে বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে। উহাকে যোনিপূজামূলক বলিয়া কল্পনা করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিতে ভারতবর্ষের যে অধঃপতন হয় সেই সময়েই শিবলিঙ্গের সহিত পুংচিহ্ন ও শালগ্রামশিলার সহিত স্ত্রীচিহ্নের ধারণা আরোপ করা হইয়া থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের 'পবিত্র ভোজোৎসব' (Holy Communion)-এর সহিত নরমাংসভক্ষণের সম্বন্ধ আছে বলাও যাহা, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামশিলার সহিত লিঙ্গযোনি-পূজার সম্বন্ধ আছে বলাও তাহাই। অর্থাৎ একের সহিত অন্যের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতায় স্বামীজি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণ করিলেন—

(১) বেদই হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সকল ধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিভূমি।

(২) শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং গীতা মহাভারতের পরে রচিত নহে।

(৩) ভারতীয় সভ্যতা গ্রীক চিন্তা ও গ্রীক শিল্পকলার দ্বারা গঠনান্তর প্রাপ্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, গীতা মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত; অন্ততঃ তাহার সমসাময়িক, পরে রচিত কখনই নহে। গীতায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কথা আছে। গীতা ও মহাভারতের ভাষা ও ভাবের মধ্যে বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং গীতা পরে রচিত হইয়াছিল কি করিয়া বলা চলে? আর যদিই কেহ মনে করেন যে, উহা পরে অর্থাৎ বৌদ্ধযুগে রচিত হইয়াছে তবে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-প্রস্তাবে বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্মের নামোল্লেখ নাই কেন? সুতরাং বুদ্ধের অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কৃষ্ণার্চ্চনাও বৌদ্ধপূজার বহুপূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল।

তারপর ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীক-জাতির প্রভাব সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ দ্রুতগতি যেসকল সুবিধাজনক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে স্বামীজি তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; বলিলেন, আজকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ভারতের যাহা কিছু ভাল জিনিস দেখিতেছেন তাহাই গ্রীকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়া বলিতেছেন। ইহার ফলে এখন ভারতের সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত, শিল্প সবই গ্রীক্‌দিগের নিকট ঋণী বলিয়া সকলের ধারণা হইয়াছে। কিন্তু ইহা পণ্ডিতগণের নিতান্ত কপোলকল্পিত। হইতে পারে হয়ত হিন্দু জ্যোতিষের কতকগুলি পরিভাষার সহিত যাবনিক পরিভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু ঐ সকল পরিভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাইয়া সহজলভ্য সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়ের সাহায্য না লইয়া কষ্টকল্পনা করিয়া গ্রীক ধাতুপ্রত্যয়ের সাহায্য টানিয়া আনার বিড়ম্বনা কেন? "ম্লেচ্ছা বৈ যবনাস্তেষু এষা বিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা। ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে।"

এই একটিমাত্র শ্লোক অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্ত্য কল্পনা আত্মগর্ব্বে এতদূর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে, একজন মহাপ্রভু নাকি এমনও বলিয়াছেন, ভারতে বিজ্ঞানাদির যাহা কিছু আছে সবই গ্রীসের প্রতিধ্বনি! কিন্তু একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে এ কথাও মনে উদিত হইতে পারে যে, হয়ত যবনশিষ্যদিগকে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চ্চায় উৎসাহদান ও তাঁহাদের সম্মানবৃদ্ধির জন্যই আর্য্যগণ এরূপ শ্লোক লিখিয়াছেন। আবার এক 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া ভারতীয় নাটক গ্রীক নাটকের ছায়াবলম্বনে রচিত হইয়াছে এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা আরও পণ্ডিত! কারণ উভয় প্রকার নাটকের রচনারীতি, নাটকীয় ভাব বা অভিনয়প্রণালীর মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্যই নাই। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রমাণ হইতেছে যে, কোন হিন্দু কোনও কালে গ্রীকভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন ততক্ষণ ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর গ্রাক প্রভাবের কথা মুখেও আনা উচিত নহে। পরে তিনি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগকে একটি গ্রীক পুস্তকের জন্য তাঁহারা যে প্রকার পরিশ্রম করেন, একখানা সংস্কৃত পুঁথির জন্য সেইরূপ পরিশ্রম করিবার উপদেশ দিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। কারণ ঐ উপায় ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে কোন্ কোন্ সময়ে ভাববিনিময় হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্ট বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসকে ব্রাহ্মণ-শিষ্য বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেইরূপ ইচ্ছা করিলে ইউরোপীয়গণ এখনও ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষে যাইতে পারেন।

স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হইলে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের অনেকেই ঐ বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং স্বামীজির অনেক মতের সহিত তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ একতা আছে স্বীকার করিয়া সর্ব্বশেষে বলিলেন যে, আগেকার সংস্কৃতবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের অনেক মত এক্ষণে

নবীন প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছে। নবীনদিগের অনেকেরই মত স্বামীজির মতানুযায়ী। ইহা ব্যতীত স্বামীজির 'পুরাণের মধ্যে অনেক সত্য কাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে' এই উক্তিরও তাঁহারা সমর্থন করিলেন।

তদনন্তর বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় স্বামীজির বক্তৃতার সমালোচনা করিতে গিয়া বলিলেন যে, ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছেন এবং উহার সকল অংশই তিনি অনুমোদন করেন, তবে গীতা ও মহাভারত যে সমসাময়িক ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে গীতা কখনই মহাভারতের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয় না।

পারীতে অবস্থানকালে স্বামীজি ফরাসী সভ্যতার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং অনুক্ষণ ফরাসী-জীবন পর্য্যবেক্ষণ ও তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে অমর লেখনীমুখে অতি বিচিত্র চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় লউন—

"এ ইউরোপ বুঝতে গেলে, পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্মের আকর ফ্রান্স থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেন্দ্র পারী। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক-আঁধার, ভালমন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে, এই পারী নগরীতে।

"এ পারী এক মহাসমুদ্র—মণি, মুক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক।...

"এই পারী নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ নগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; নেই সে ফরাসী মাটি, আর

সর্ব্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক, বিদ্যাবুদ্ধি থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও থাক—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসীচরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর, সকল কার্য্যে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসীমুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে উঠে।

"এই পারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞানসভা এদের একাডেমীর নকল; এই পারী ঔপনিবেশ সাম্রাজ্যের গুরু, সকল ভাষাতেই যুদ্ধশিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসী; এদের রচনার নকল, সকল ইয়ুরোপী ভাষায়; দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পের এই পারী খনি, সকল জায়গায় এদের নকল।

"এরা হচ্ছে শহুরে, আর সব জাত যেন পাড়াগেঁয়ে। এরা যা করে, তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জর্ম্মাণ ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হক, বা শিল্পে হক বা সমাজনীতিতেই হক।...

"আর এই ফ্রান্স স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারী নগরী হতে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলছে, সেই দিন হতে ইউরোপের নূতন মূর্ত্তি হয়েছে। সে 'এগালিতে, লিবার্তে, ফ্রাতের্ণিতে'র (Equality, Liberty, Fraternity) ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে। ফ্রান্স অন্য ভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্স করছে।

"একজন স্কটল্যাণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় সেদিন বললেন যে পারী হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারী নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগস্থাপন করতে সমর্থ হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সত্য; কিন্তু এ কথাটাও সত্য যে, যদি কারু কোনও নূতন ভাব এ জগৎকে দেবার থাকে

ত এই পারী হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারীতে যদি ধ্বনি উঠে, ত ইউরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্ত্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারলে আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।

"আমাদের দেশে এ পারী নগরীর বদনামই শুনতে পাওয়া যায়—এ পারী মহাকদর্য্য, বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব তারা অবশ্য বিলাসময়, জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারীই দেখে।

"কিন্তু লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ; তবে তফাৎ এই, অন্যদেশের ইন্দ্রিয়চর্চ্চা পশুবৎ; প্যারিসের, সভ্য পারীর ময়লা সোনার পাতমোড়া, বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাৎ, অন্যান্য সহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ পারীর বিলাসের সেই তফাৎ।

"ভোগবিলাসের ইচ্ছা কোন জাতে নেই বল? নইলে দুনিয়ায় যার দু পয়সা হয়, সে অমনি পারী নগরী অভিমুখে ছোটে কেন? রাজা বাদসারা চুপিসাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস-বিবর্ত্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন? ইচ্ছা সর্ব্ব দেশে, উদ্যোগের ত্রুটি কোথাও কম দেখি না; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেছে।" ইত্যাদি।

ধর্ম্মেতিহাস-সভার অধিবেশন শেষ হইলে স্বামীজি মিসেস্ ওলি বুলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বৃটানি প্রদেশের অন্তর্গত লানিয় নামক স্থানে গমন করিলেন এবং শ্রীমতী বুলের কুটীরে অতিথি হইলেন। এখানে কয়দিন বেশ বিশ্রামে কাটিল। সিষ্টার নিবেদিতাও ঐ সময়ে আমেরিকা হইতে

এস্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজি তাঁহাদিগকে প্রায়ই বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী শুনাইতেন এবং 'জাতক', 'ললিতবিস্তর', 'বিনয় পিটক' এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পুস্তক হইতে নানা স্থান আবৃত্তি করিতেন। নির্ব্বাণলাভের পর বুদ্ধদেব কেমন মূর্ত্তিমান অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষরূপে পরিণত হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শনের জন্য 'উপানীপৃচ্ছ', 'ধনিয়াসূত্ত' ও প্রসিদ্ধ 'সূত্ত নিপাত' প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নানা বচন উদ্ধৃত করিতেন।

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভেদ প্রদর্শনকালে বলিতেন, "বৌদ্ধমতে 'এ সবই মায়ার ভ্রম', হিন্দুমতে 'এই মায়ার ভিতরেই সত্য নিহিত আছে'; কেমন করে এ সত্য লাভ হবে সে সম্বন্ধে হিন্দুরা বৌদ্ধদের মতন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বাত্‌লে দেন নি। বৌদ্ধদের পথ শুধু সন্ন্যাসের ভেতর দিয়ে, কিন্তু হিন্দুর পথ অনেক দিক দিয়ে, অর্থাৎ যে কোন অবস্থার ভেতর দিয়ে জ্ঞানলাভ হতে পারে, সব পথই পরিণামে এক সত্যে নিয়ে যাবে। সুতরাং কালে বৌদ্ধধর্ম্মটা খালি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হয়ে উঠল। হিন্দুধর্ম্মটি সাধারণভাবে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-সম্পাদনের ভেতরও রইল। হিন্দুধর্ম্ম সব ভাবকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। উনি হলেন সকল ধর্ম্মের আদি জননী। তাই ভগবান বুদ্ধকে অবতারের সামিল করে নিলেন।"

বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামীজির প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ তাঁহার সহিত এক বিষয়ে পরমহংস-দেবের সাদৃশ্য। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগকালে যখন কম্বল বিছাইয়া তিনি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছেন, সেই সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ ভিক্ষা করিল। শিষ্যেরা এরূপ সময়ে মুমূর্ষুর শান্তির ব্যাঘাত আশঙ্কা করিয়া লোকটিকে সেস্থানে প্রবেশ করিতে

দিতে অসম্মত হইলে সে কথা বুদ্ধদেবের কর্ণগোচর হইল এবং তৎক্ষণাৎ 'না না, উহাকে আসিতে দাও, তথাগত সর্ব্বদাই প্রস্তুত' বলিয়া কনুইয়ে ভর দিয়া শরীরার্দ্ধ উত্তোলিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিলেন। চারিবার এইরূপ হয়, তারপর তিনি আপনাকে দেহত্যাগের অধিকারী বিবেচনা করিলেন। স্বামীজি 'কনুইয়ের ভরে দেহার্দ্ধ উন্নত করিয়া উপদেশ দিলেন' এই কথা বলিয়াই একবার থামিতেন এবং বলিতেন, "দেখ, আমি নিজে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।" অমনি তাঁহার মানসপটে অতীত দিনের একটি বিষাদচ্ছবি জাগিয়া উঠিত—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ মুহূর্ত্তে কাশীপুরের বাগানে একজন লোক পঞ্চাশ ক্রোশ হাঁটিয়া তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে আসিয়াছিল। এখানেও শিষ্যেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিবার মতলব করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঠাকুর তাঁহাকে ভিতরে আসিতে দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাহাকে ভিতরে আনাইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান শ্রীবুদ্ধের জীবনের ঘটনার সহিত এই ঘটনার কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! এই জন্যই স্বামীজি বুদ্ধের ভিতর রামকৃষ্ণদেবকে এবং রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে বুদ্ধদেবকে দেখিতে পাইতেন।

অনেক সময় তিনি শঙ্করাচার্য্যের সহিত বুদ্ধের তুলনা করিতেন এবং বলিতেন, "বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের জ্ঞান—উভয়ের একত্র সমাবেশ মানব-জীবনের চরমস্ফূর্ত্তি, আর জগতের বরেণ্য লোকশিক্ষকগণের মধ্যে এক শ্রীরামকৃষ্ণদেবে এই অপরূপ সমাবেশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।"

স্বামীজি ব্রিটানি ত্যাগ করিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে ভগিনী নিবেদিতা ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া ভারতাঙ্গনার উন্নতিসাধনকল্পে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহার নিকট বিদায়কালীন আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"মুসলমানদিগের মধ্যে একটা সম্প্রদায়

আছে, শুনিতে পাই তাহাদের ধর্ম্মোন্মত্ততা এত অধিক যে তাহারা আপন সম্প্রদায়স্থ প্রত্যেক নবজাত শিশুকে রৌদ্রবৃষ্টিতে ফেলিয়া রাখে ও বলে 'যদি খোদার তৈরী হও মর, যদি আলির তৈরী হও বাঁচিয়া থাক।' আমিও সেই কথা উলটাইয়া তোমায় বলিতেছি—'যাও বৎসে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর। আর আমি যদি তোমায় গড়িয়া থাকি তবে বিনাশপ্রাপ্ত হও, কিন্তু জগন্মাতা যদি তোমায় গড়িয়া থাকেন তবে চিরায়ুষ্মতী হও'।" এইবার প্রথম নিবেদিতা স্বামীজির পরামর্শ না লইয়া স্বাধীনভাবে ভারতের কার্য্য করিবার জন্য বিলাতে যাইতেছেন। নিবেদিতা বলেন, 'স্বামীজি মনে করিয়াছিলেন হয়ত আমি আবার পুরাতন বন্ধনসমূহে আটকাইয়া পড়িব। ভারত আমার বিদেশ। বিদেশের প্রতি প্রেম দেশের ভাবে চাপা পড়িয়া যাইবে। তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া এরূপ পরিবর্ত্তন নিতান্ত অসম্ভব মনে করিতে পারিতেন না।'

বৃটানি হইতে প্যারিসে ফিরিয়া স্বামীজি আবার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই ভারতের নিকট সমুদয় মনুষ্যজাতি কি পরিমাণে ঋণী তাহা দেখাইতে ছাড়িতেন না। হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাবসকল যে অতি প্রাচীনকালে একদিকে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, অষ্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত ও অন্যদিকে তিব্বত, চীন, জাপান ও সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন এবং কেমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম এন্টিওকাস থিয়স্ এর সময়ে সিরিয়ায়, টলেমি ফিলাডেলফাসের সময় মিসরে, এন্টিগোনাস গোনাটেসের সময় মাসিদনিয়ায় এবং আলেকজাণ্ডারের সময়ে এপাইরাসে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার সুদীর্ঘ বর্ণনা করিতেন। তারপর হয়ত জগতের ইতিহাসে তাতার জাতির প্রভাব এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় ও শেষে ভারতে তাহাদের দিগ্বিজয়সমূহের উল্লেখ করিয়া

বলিতেন, "তাতারশোণিত সুরার ন্যায় সকল জাতির মধ্যে মিশ্রিত হইয়া শক্তি ও উত্তেজনা দান করিয়াছে।" তিনি দেখিতেন, ইউরোপ কতকগুলি এশিয়াবাসী জাতি ও অর্দ্ধ এসিয়াবাসী জাতির সহিত জার্ম্মাণীর অরণ্যচারী ও প্রাচীন গল ও স্পেনের বর্ব্বরজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইউরোপী সভ্যতাকে তিনি বহু পরিমাণে স্পেনের মুরদিগের ও মধ্যযুগের আরবদিগের বিদ্যা ও বিজ্ঞানের নিকট ঋণী বিবেচনা করিতেন। যখন যখনই ইউরোপ এশিয়ার সংস্পর্শে আসিয়াছে তখনই ইউরোপে নব ভাবস্রোত বহিয়াছে ও সেই স্রোতে প্রাচ্যভাব বিকীর্ণ হইয়াছে। স্বামীজি যে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনে ঐতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তি সহযোগে এই সকল বিষয় শ্রোতৃবর্গের গোচর করিতেন তাহাতে সকলেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইত। যাহারা এশিয়ার শিক্ষা ও সভ্যতাকে ইউরোপের পদানত মনে করে, তিনি তাহাদিগকে অবাধে তিরস্কার করিতেন, এবং এ বিষয়ে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও দর্শন বিজ্ঞান সকলই তাঁহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিত। পারীতে যে সকল ভুবনবিখ্যাত ব্যক্তির সহিত স্বামীজির ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর প্যাট্রিক গেডেস্, মসিএঁ জুল বোওয়া, পেয়ার হয়সিন্থ, সুবিখ্যাত তোপনির্ম্মাতা হিরাম ম্যাক্সিম, প্রসিদ্ধ গায়িকা মাদামোয়াজেল কালভে, অভিনেত্রীকুলসম্রাজ্ঞী সারা বার্ণহার্ড, রাজকুমারী ডেমিডফ এবং ভারতের উজ্জ্বলরত্ন ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু।

অধ্যাপক গেডেসের সহিত জাতিসমূহের বিবর্ত্তন, ইউরোপের আধুনিক পরিবর্ত্তন, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার উপর তাহার প্রভাবসম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল।

পারী শহরের বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত মসিএঁ জুল বোওয়ার কথা

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি স্বামীজির একজন বন্ধু। ইনি যে বেদান্তভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন তাহাই ফরাসীদেশে ভিক্টর হুগো ও লা মার্টিনের এবং জার্ম্মানীতে গেটে ও শিলারের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও কুসংস্কারের ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহ ও নিরূপণে ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। স্বামীজি ইহার সহিত আলাপে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করিতেন।

স্বামীজির সহিত এখানে যে সকল ব্যক্তি বিশেষ আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন তাঁহাদের মধ্যে পেয়ার হয়সিন্থ একজন। ইনি স্বামীজির মতের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রশংসা ও পোষকতা করিতেন। ইঁহার নিজ জীবনও বড় বিচিত্র। তিনি ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রোমক-সম্প্রদায়ভুক্ত কঠোরতপা সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ইউরোপীয় জনসমাজে কাহারও অবিদিত ছিল না। ভিক্টর হুগো ফরাসী লেখকদের মধ্যে দুইজন লোকের মাত্র প্রশংসা করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন। কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ্চের গলদ বাহির করাতে এবং ৪০ বৎসর বয়সে এক আমেরিকান নারীর পাণিপীড়ন করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করাতে ক্যাথলিক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হন। প্রোটেষ্ট্যাণ্টরা তাঁহাকে মহা আদরে নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। বিবাহের পর তাঁহার নাম হয় মসিয়ঁ লয়জন। তাঁহার জীবনের এই সকল ঘটনা এক সময়ে ইউরোপী সমাজে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। এখন বৃদ্ধ খৃষ্টানধর্ম্মের গোলমেলে অংশগুলির সামঞ্জস্যবিধানে এবং নানা ধর্ম্মের তুলনাসহকৃত অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে একজন মিষ্ট-ভাষী, নম্র, ভক্তপ্রকৃতির লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহার সহিত তাঁহার ধর্ম্ম, বিশ্বাস, সম্প্রদায় ইত্যাদি অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। যখন বৃদ্ধ তাঁহার মুখে জলন্ত ভাষায় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমা শুনিতেন

তখন ভূতপূর্ব্ব সন্ন্যাসজীবনের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া তাঁহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিত। ইহার পর স্বামীজি পারী ত্যাগ করিয়া যখন কনষ্টান্টিনোপল ভ্রমণে যাত্রা করেন তখন বৃদ্ধ সস্ত্রীক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তারপর আবার এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত স্কুটারী শহরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ তখন জেরুশালেম যাইবার জন্য ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, উদ্দেশ্য—খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে মৈত্রীস্থাপন। বৃদ্ধ মনে করিতেন, ভগবানই স্বামীজিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। স্বামীজীও বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভিতরকার অনেক কথা জানিতে পারেন।

স্বামীজির সহিত পারীতে আর একজন সুপ্রসিদ্ধ লোকের পরিচয় হয়, যে পরিচয় ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। ইনি তোপনির্ম্মাতা মিঃ হিরাম ম্যাক্সিম। ইঁহার নির্ম্মিত 'অটোমেটিক মেশিন গান' নামক কামানে ৩০০ গজ দূর পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে ৬২০ বার ক্রমাগত "গোলা চল্‌তে থাকে, আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে, বিরাম নাই।"

'পরিব্রাজক' পুস্তকে স্বামীজি ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ম্যাক্‌সিম আদিতে আমেরিকান; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি। ম্যাক্‌সিম তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে 'আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করি নি—ঐ মানুষমারা কলটা ছাড়া?' ম্যাক্সিম চীনভক্ত, ভারতভক্ত, ধর্ম্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বইপত্র পড়ে অনেকদিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ—বেজায় অনুরাগ। চীনমন্ত্রী লিহাং চাং এর সঙ্গে এঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ও চীনে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা যে ধর্ম্মপ্রচার করতে চায় এ তাঁর অসহ্য। এঁর স্ত্রীও এঁর ন্যায় চীনভক্ত। বৃদ্ধ অতুল সম্পত্তির মালিক। ইনি সব রাজরাজড়াকে তোপ বেচিতেন বলিয়া সব দেশের বড়লোকের সঙ্গে আলাপ ছিল।

স্বামীজির ইউরোপভ্রমণকালে ভাল করিয়া সকল জায়গা দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ইনি নানাস্থানের জন্য চিঠিপত্র যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্ত্যজগতের গায়িকাশ্রেষ্ঠা মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে ও অভিনেত্রী-ললামভূতা সারা বার্ণহার্ড প্যারিসে পরিচিত ব্যক্তিগণের অন্যতম। উভয়েরই সহিত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আলাপ ছিল। উভয়েই ফরাসী, এবং উভয়েই ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন।

মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে সম্বন্ধে স্বামীজি 'পরিব্রাজকে' লিখিয়াছেন—"কাল্‌ভে আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা—অপেরাগায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব্ব হতে। মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি এঁর অতিথি হয়ে। কাল্‌ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়, ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন! রাজা বাদসার সম্মানের ঈশ্বরী। * *"

আর বার্ণহার্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মাদাম বার্ণহার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন—তখন যে বয়স, যে অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল! বালিকা, বালক, যা বল তাই—হুবহু—আর সে আশ্চর্য্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপোর তার বাজে! বার্ণহার্ডের অনুরাগ, বিশেষ—ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ "তেজাঁসিএন্, ত্রেসিভিলিজে"—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। একবৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয়

করেন ; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বিলকুল ভারতবর্ষ ! ! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন যে, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা, ঘাট পরিচয় করেছি।' বার্ণহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'সে মর্ঁ্যাভ'—সে আমার জীবন-স্বপ্ন ! আবার প্রিন্স অব ওয়েল্স (আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড) তাঁকে বাঘ হাতী শিকার করাবেন, প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্ণহার্ড বল্লেন—সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাখ দু লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয় ? টাকার অভাব তাঁর নাই—'লা দিভীন সারা' দৈবী সারা—তাঁর আবার টাকার অভাব কি ?—যাঁর স্পেশাল ট্রেণ ভিন্ন গতায়াত নাই ! সে ধুমবিলাস ইউরোপের অনেক রাজারাজড়া পারে না ; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকেট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নাই, তবে সারা বার্ণহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারতভ্রমণ—কাজেই এখন রইল।"

প্যারিসে আর একটি মহিলা স্বামীজির সঙ্গিনী ছিলেন ও বিশাল প্যারী নগরীর চতুর্দ্দিকে দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শনকালে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড—সেই পূর্ব্ব পরিচিত ম্যাকলাউড, যিনি স্বামীজিকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন এবং আচার্য্য ও বন্ধু উভয়ভাবে দেখিতেন। স্বামীজির শিষ্যগণ বলেন, ইঁহার কাছে এখনও স্বামীজি সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

প্যারিস হইতে বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে স্বামীজি এই বিদ্যাবুদ্ধিপ্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের মহামেলায় ভারতবাসীর স্বল্পতা লক্ষ্য করিয়া দুঃখের সহিত লিখিয়াছিলেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হইতে বিদায়।

এবৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এবৎসর মহাপ্রদর্শনী, নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস। একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসু ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরববর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী!"

ডাক্তার বসুও প্রদর্শনীসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক মহাসভার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিচয়ে পাশ্চাত্য সুধীসমাজকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। স্বামীজি প্রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং বহুব্যক্তির নিকট তাঁহাকে 'বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভ' বলিয়া পরিচিত করিতেন। অপর সকলে যখন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের গুণপনাব্যাখ্যার জন্য শতমুখ হইবার উপক্রম করিত, তখন তিনি দেখাইতেন তাঁহার স্বদেশীয়টি তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা কত বড়। ডাঃ বসুর সহিত অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের

মতভেদ উপস্থিত হইলেও তিনি সকলের বিপক্ষে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিতেন যে, এখন তাঁহারা হয় ত বসু মহাশয়ের কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না, কিন্তু কালে যখন আরও সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইবে তখন তাঁহারা বুঝিবেন। একদিন একটি বিশিষ্ট সভায় এক বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের শিষ্য ক্ষুদ্রকায় লিলি বৃক্ষের উপর তাঁহার অধ্যাপক কত কি পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাই গর্ব্বভরে বর্ণনা করিতেছিলেন। স্বামীজি তাহা শুনিয়া রহস্যচ্ছলে বলিলেন, "ও আর এমন কি! তুমি ত শুধু লিলি গাছ বলছ, ডাক্তার বোস দেখাবেন লিলি গাছের টব পর্য্যন্ত প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত।"

ফ্রান্সে প্রায় তিন মাস অতিবাহিত করিয়া ২৪শে অক্টোবর ওরিএঁতাল এক্সপ্রেস ট্রেনে স্বামীজি পারী ত্যাগ করিলেন। এই গাড়ী প্রত্যহ পারী হইতে স্তাম্বুল যাইবার জন্য ছাড়ে। মসিয়ঁ ও মাদাম লয়জন, মসিয়ঁ জুল বোওয়া, মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে এবং মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজির সহযাত্রিনী হইলেন। ২৫শে সন্ধ্যার সময় তাঁহারা ভিয়েনা পৌঁছিলেন এবং তিন দিন সেখানে কাটাইলেন। এখানে অন্যান্য দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে যে প্রাসাদে নেপলিয়নের পুত্র বন্দীদশায় জীবন কাটাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং যে করুণ কাহিনী-অবলম্বনে রচিত 'লের্গঁল' (L'aiglon or the Young Eagle) বা 'গরুড়শাবক' নামক নাটক-অভিনয়ে মাদাম বার্ণহার্ড সেই সময়ে সমগ্র ফ্রান্সদেশে এক তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন (স্বামীজিও সম্প্রতি এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন) সেই অতীত ঐতিহাসিক চিত্রের রঙ্গভূমি 'সামবোর্ণ প্রাসাদ' (Schonbrum Palace) তাঁহারা দর্শন করিলেন। প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষে নানাদেশের শিল্প ও কারুকার্য্য সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারত ও চীনদেশের দ্রব্য ছিল দেখিয়া স্বামীজি তুষ্ট হইলেন। সেখানকার যাদুঘরের বৈজ্ঞানিক

শাখা ও ওলন্দাজ চিত্রকরদিগের 'জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণে' অঙ্কিত চিত্রাবলী স্বামীজিকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ভিয়েনায় তিনি তিন দিন ছিলেন, কিন্তু প্যারিসের পর ইউরোপের অন্য কোন শহর আর তাঁহার ভাল লাগে নাই। 'পরিব্রাজকে' তাই তিনি লিখিয়াছেন, 'প্যারিসের পর ইউরোপ দেখা, চর্ব্যচূষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাট্‌নি চাকা।'

২৮শে অক্টোবর ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া ৩০শে তারিখে কনষ্টান্টিনোপলে পৌঁছিলেন। এখানে চুঙ্গীর (octroi) হাঙ্গামায় তাঁহাদিগকে বড় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের সঙ্গের সকল বহি, কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে ও জুল বোওয়ার চেষ্টায় দুইখানি ব্যতীত আর সব বই ফেরত পাওয়া গেল।

বহুদিন পরে এ শহরে 'ছোলাভাজা' পাইয়া স্বামিজীর মহা আনন্দ! পৌঁছানর দিন সন্ধ্যাবেলা ও পরদিন অনেক নূতন নূতন স্থান দেখিয়া মিস্ ম্যাকলাউডের সহিত নৌকা করিয়া বসফোরাসে বেড়াইতে গেলেন। সেদিন ভয়ানক শীত ও কনকনে বাতাস। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিলেন পরের ষ্টেশনেই নামিয়া স্কুটারী যাইবেন ও পেয়স হয়সিন্থের সঙ্গে দেখা করিবেন। কিন্তু পথে একটু মুশকিল হইল। তাঁহাদের দুইজনের কেহই না জানেন তুর্কী ভাষা, না জানেন আরবি। ইশারা ও ইঙ্গিতে কোনরূপে একটি নৌকা ভাড়া হইল ও তাঁহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলেন। পেয়র হয়সিন্থের সঙ্গে দেখা ও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পথে সুফী দরবেশদিগের বাসস্থান দেখিলেন। সুবিধামত জায়গা না পাওয়াতে স্বামীজি সেদিন স্কুটারী কবরস্থানেই আহারাদি করিলেন।

ম্যাক্সিম সাহেবের পরিচয়পত্রবলে ভিয়েনা ও কনষ্টান্টিনোপল

উভয় স্থানেই অনেক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত স্বামীজির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একদিন কনষ্টান্টিনোপলের ফরাসী রাজদূতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন এবং একজন গ্রীক পাশা ও আলবানিয়ার এক অভিজাত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। কিন্তু স্বামীজি বা পেয়র হয়সিন্থ্ কেহই এখানে বক্তৃতা দিবার অনুমতি পাইলেন না। তবে পরিচিত ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় ছোট রকমের সভায় তিনি বেদান্ত-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং তাহা শ্রোতাদিগের অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এই শহরে কয়েকজন ভারতবাসীকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

কনষ্টান্টিনোপলে আর একটি ঘটনা ঘটে যাহা স্বামীজি কখনও ভুলেন নাই। একজন বৃদ্ধ তুর্কী হোটেলওয়ালা স্বামীজি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে নিজ আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। এই সুদূর প্রবাসে ভিন্ন-দেশীয় একজন লোকের এইরূপ ভক্তিদর্শনে স্বামীজি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কনষ্টান্টিনোপল্ হইতে স্বামীজি বন্ধুবর্গসহ ষ্টিমারযোগে এথেন্স-ভ্রমণে গমন করিলেন। পথে 'গোল্ডেন হর্ণ' ও মরমরা দ্বীপপুঞ্জ দর্শন করিলেন। এখানে একটি গ্রীক মঠ দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়াছিল। এই স্থানের একটি দ্বীপে মান্দ্রাজের পাচিয়াপ্পা কলেজের পূর্ব্বপরিচিত বিখ্যাত অধ্যাপক লেপেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আর একটি দ্বীপে সমুদ্রতটে কোন এক মন্দির দেখিয়া উহা নেপচুনের মন্দির বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল।

এথেন্সের মধ্যে ও চারিপাশে তাঁহারা যেসকল প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক্রপলিস, বিজয়া দেবীর মন্দির,

পার্থিনন এবং আরও অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। দ্বিতীয় দিবসে লিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, ডায়োনিসিস রঙ্গালয় প্রভৃতি এবং তৃতীয় দিনে প্রাচীন ইলিউসিনীয় রহস্যসমূহের প্রধান আড্ডা ইউলিসিস নামক বিখ্যাত স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। এথেন্স ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি বিখ্যাত আগেলাদাসের (ইনি খ্রীঃ পূঃ ৫৭৬—৪৮৬ সালে বিদ্যমান ছিলেন) ক্ষোদিত ভাস্করমূর্ত্তিসমূহ এবং ফিডিয়াস, মাইরণ ও পলিক্লিটাস নামক তাঁহার স্বনামধন্য শিষ্যত্রয়-নির্ম্মিত জগদ্বিখ্যাত শিল্পনিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

এথেন্সে আসিবার চারিদিন পরে স্বামীজি 'জার' নামক রুশীয় ষ্টিমারে চড়িয়া মিসর যাত্রা করিলেন। এখানে 'কাহারো যাদুঘর' দেখিয়া তিনি সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন এবং তাঁহার মনে অনুক্ষণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ফ্যারাও সম্রাটদিগের অতীত কীর্ত্তিকলাপের কথা উদিত হইতে লাগিল, পার্থিব পদার্থসমূহের নশ্বরত্ব তাঁহার হৃদয়ে শুধু মায়ার লৌহবন্ধনের দৃঢ়তা স্মরণ করাইয়া দিল। Sphinx (বিরাট অর্দ্ধনারীসিংহী মূর্ত্তি) ও পিরামিডসমূহ তাঁহার মানসিক ক্লান্তি উৎপাদন করিল মাত্র। সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ভোগ, নাম, যশ সকলই যে অসার অকিঞ্চিৎকর ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। সমস্ত বিষয়েই যেন অরুচি আসিল। তিনি ভারতে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, আর কিছুতেই তৃপ্তি পাইলেন না। আর একটি ঘটনাও এ সময়ে এই ব্যগ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিল। সুদূর ভারতে তাঁহার পরম বন্ধু ও প্রিয় শিষ্য মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করেন। স্বামীজি আপনা হইতেই ইহা যেন অনুভব করিতেছিলেন। সেইজন্য আরও শীঘ্র ভারতে ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। একদিন সহসা তিনি সঙ্গীদিগের নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মাদাম

কাল্‌ভে ক্যাথলিকদিগের প্রথামত তাঁহাকে 'Mon Pere' (আমার পিতা) বলিয়া ডাকিতেন; মিস্ ম্যাকলাউডের নিকটও তিনি একাধারে গুরু ও বন্ধু ছিলেন এবং মসিয়ঁ বোওয়া তাঁহাকে একজন গভীর চিন্তাশীল ও ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং কতক দুঃখে, কতক নিরুপায়ভাবে তাঁহারা তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।

প্রথমে যে ষ্টিমার পাওয়া গেল তাহাতেই উঠিয়া তিনি ভারতযাত্রা করিলেন; যেদিন ষ্টিমার আসিয়া বোম্বাইয়ের উপকূলে লাগিল সেদিন তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাগমনের বিষয় কেহই অবগত ছিল না, কারণ তিনি কাহাকেও সংবাদ না দিয়া মনের আবেগে হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছিলেন। কেবল বোম্বাই হইতে কলিকাতা আসিবার পথে রেলের মধ্যে একজন তাঁহাকে চিনিতে পারেন। ইনি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য (যিনি পরে মান্দ্রাজের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল হইয়াছিলেন)। স্বামীজি ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে মন্মথ বাবুও তাঁহাকে ভালরূপে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর উভয়েই উভয়ের সহিত আলাপ করিয়া যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করেন।

৯ই ডিসেম্বর (১৯০০ সাল) অনেক রাত্রে স্বামীজি বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা আহার করিতে বসিয়াছেন এমন সময় বাগানের মালী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'একো সাহেবো আউচি।' তাড়াতাড়ি তাহাকে সম্মুখ-দ্বারের চাবি আনিতে পাঠান হইল এবং এত রাত্রে কে সাহেব, কোথা হইতে আসিল, কি চাহে ইত্যাদি জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইল। হঠাৎ সকলে বিস্ময়ে দেখিলেন সাহেব নিজেই দ্রুতবেগে তাঁহাদের দিকে

আসিতেছেন। তারপর যখন সাহেবকে চিনিতে পারা গেল তখন সকলের কি আনন্দ! "স্বামীজি এয়েছেন", "স্বামীজি এয়েছেন"—চারিদিকে উত্তেজিত কণ্ঠে এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল এবং একটা মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সমস্ত রাত্রি আর কাহারও ঘুম হইল না। প্রথমে ত তাঁহারা মনে করিলেন বুঝি দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছে! স্বামীজি কেমন করিয়া এমন সময়ে এখানে আসিলেন! স্বামীজি মালীকে দিয়া খবর পাঠাইয়া তাহার জন্য আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের খাবার ঘণ্টা শুনেই ভাবলুম, যাঃ এখনি না গেলে হয়ত সব সাবাড় হয়ে যাবে! তাই আর দেরী করলুম না।"

অনতিবিলম্বে তাঁহার জন্য আসন বিছাইয়া ঠাঁই করিয়া খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হইল। অনেক দিন ঐ জিনিস আস্বাদন করেন নাই, সুতরাং তিনি পরমানন্দে ভোজন করিলেন। তারপর সারারাত গল্প, নানা কথা। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। কারণ, কেহই এমন সময়ে তাঁহার আগমন আশা করেন নাই। সেই রাত্রে মঠে যে আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়াছিল তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এবার পশ্চিমদেশ হইতে ফিরিয়া স্বামীজি বলিলেন, "প্রথম যেবার ওদেশে যাই, তখন ওদের ক্ষমতা, ওদের organisation (একত্র দল বেঁধে কার্য্য করিবার প্রণালী) ইত্যাদি দেখে বড় ভাল লেগেছিল, কিন্তু এবার দেখলুম ওদের ব্যবসাদারিটা বড় বেশী, অর্থলোভ স্বার্থপরতা আর নিজের সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা—এই সবেই যেন ভরে রয়েছে। তারপর গরিবলোকদের খাটিয়ে নিয়ে লাভের অংশটি বড়লোকেরা ভোগ করছেন, ছোট ছোট কারবারের সুবিধাগুলি বড় বড় combination-এ (ধনীদের একজোট) গিলে খাচ্ছে। এসব শোষণপ্রণালী কি ভাল?"

স্বামীজি একজনকে বলিয়াছিলেন, "দলবাঁধার অভ্যাসটা খুব ভাল বটে, কিন্তু একদল নেকড়ে তা বলে কি আর দেখতে সুন্দর ?—ওদেশে যত বেশী বেড়ালুম, যত বেশী দেখলুম শুনলুম তত জ্ঞান হল যে ওটা যেন নরক ! চীনেরা মনুষ্যনীতির আদর্শের যত কাছাকাছি গেছে কোন নতুন জাতই ততদূর যায় নি বা যেতে পারে নি।"

মায়াবতী-দর্শন

ভারতে ফিরিয়াই স্বামীজি আবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই ভারত তাঁহার প্রাণ—সন্ন্যাসীর চিরবাঞ্ছিত আশ্রম এই ভারত তাঁহার আজীবনের সাধনভূমি। জীর্ণদেহ—ভগ্নস্বাস্থ্য, তথাপি হৃদয়ের টান আবার তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল; লইয়া চলিল সেই কঠোর কর্ত্তব্যে—যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের শত শত কার্য্য তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিল—সেই ভারতের ভাবী যোদ্ধৃকুলের সংঘটনে—সনাতনধর্ম্মের ভগ্নপতাকা-পুনরুত্তোলনে ও সহস্র বৎসরের পুঞ্জীভূত তমোরাশি অপসারণ-পূর্ব্বক কর্ম্মজ্ঞানের উজ্জ্বল রশ্মিবিকিরণে—সেই অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিবার যেন তেন প্রকারেণ প্রাণধারণনিরত কোটি কোটি নৈরাশ্যপূর্ণহৃদয় জীবকুলকে আশার আহ্বান শুনাইবার প্রাণপণ সাধনায়।

সে জীবনব্যাপী সাধনা কেমন করিয়া বুঝাইব? সে যে আজন্ম সাধনা, শুধু এ জন্মের নয়—কোটি কোটি জন্মের, চির দিনের, যুগযুগান্তরের সাধনা। সেদিন তিনি বিবেকানন্দ-মূর্ত্তিতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই এ সাধনা সে দিনের নয়। তিনি কতবার কত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে যে আমাদিগকে দেখা দিয়াছেন তাহা কে বলিবে? ভারতের দুঃখদৈন্যে সেই মহাপ্রাণে কত যে দুঃখের তরঙ্গ বহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? হায়! রোগযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট রহিতে পারিলেন না। পূর্ব্ববৎ মঠের সকল ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গুরুভ্রাতা ও শিষ্যকে নিজ আদর্শে সযত্নে গঠিত করিতে লাগিলেন, এবং তদ্ব্যতীত আরও শত শত উপদেশপ্রার্থীকে পাত্রবিচারে শিক্ষা দিতেন। ইউরোপ-আমেরিকার কার্য্যপরিচালকগণকে ও অন্যান্য দূরস্থ কেন্দ্রাধ্যক্ষগণকেও প্রত্যহ

বহুসংখ্যক পত্র লিখিয়া উপদেশ দিতে হইত। তাহার উপর 'উদ্বোধন', 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদকগণও তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিতেন। এইরূপে তিনি যেখানে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানের নবজাত পাদপশিশু এক্ষণে তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল।

কিন্তু এই কর্ম্মজালে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি সর্ব্বপ্রথমে শোক-সন্তপ্তা সেভিয়ার-গৃহিনীর সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। ৯ই ডিসেম্বর মঠে আসিয়াই প্রিয়শিষ্য সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ (২৮।১০। ১৯০০) পাওয়াতে তাঁহার পূর্ব্বের সন্দেহ নিশ্চয়ে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মিসেস্ সেভিয়ারকে টেলিগ্রাম করিয়া মায়াবতী যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং যাত্রার দিন পরে জানান হইবে লিখিলেন। উত্তরে তিনি জানাইলেন যে, সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য অন্ততঃ আট দিন পূর্ব্বে যেন সংবাদ দেওয়া হয়। বন্দোবস্ত অর্থে কুলি ও ডাণ্ডি বহিবার লোকজন যোগাড় করা। প্রথমতঃ দূর দূর গ্রামে গিয়া এই সকল লোক সংগ্রহ করিতে হইবে, তারপর চার দিনের পথ কাঠগোদাম যাইতে হইবে। কিন্তু স্বামীজি এসকল কিছুই জানিতেন না। তিনি তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ তারযোগে জানাইলেন যে, ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ২৯শে তারিখে তিনি কাঠগোদাম পৌঁছিবেন। ২৫শে বৈকালে উক্ত টেলিগ্রাম মায়াবতী পৌঁছিল। কাঠগোদাম রেলষ্টেশন হইতে মায়াবতী ৬৫ মাইল, সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে কুলি যোগাড় করিয়া সেখানে পৌঁছান একরূপ অসম্ভব। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা কোন কূলকিনারা দেখিতে পাইলেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা জানিতেন যদি ঐ দিন স্বামীজি কাঠগোদামে কাহাকেও না দেখিতে পান তাহা হইলে সম্ভবতঃ পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু লালা বদ্রিসার আলমোড়াস্থ বাটীতে গিয়া

আতিথ্য গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার শরীরের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে হয়ত আর কখনও মায়াবতী আসা ঘটিয়া উঠিবে না। তাঁহাদের অনুমান নিতান্ত অমূলক হয় নাই। কারণ স্বামীজি কলিকাতাত্যাগের পূর্ব্বে আলমোড়ার উক্ত বন্ধুকেও একখানি টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে যেদিন তিনি কাঠগোদামে পৌঁছিলেন সে দিন দেখিলেন বদ্রিসার ভ্রাতা গোবিন্দলালসা ষ্টেশনে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ওদিকে মায়াবতী হইতেও চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সকলে নিরাশ হইয়া পড়িলেও বিরজানন্দ স্বামীর একান্ত চেষ্টায় অনেক অতিরিক্ত ভাড়ায় কুলি ও ডাণ্ডী-বাহক লোক সংগৃহীত হইয়াছিল এবং বিরজানন্দ স্বামী স্বয়ং উক্ত লোকজন সমেত প্রত্যহ বহু ক্রোশ পদব্রজে চলিয়া ২৮শে বেলা দ্বিপ্রহরে কাঠগোদামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৯শে প্রাতঃকালে স্বামীজি আসিয়া পৌঁছিলেন; সঙ্গে স্বামী শিবানন্দ ও সদানন্দ। স্বামীজি বিরজানন্দের উদ্যমে ও চেষ্টায় অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিলেন, 'এই রকম লোকই চাই, অর্থাৎ এই আমার উপযুক্ত শিষ্য।'

আলমোড়া হইতে যিনি আসিয়াছিলেন তিনি স্বামীজিকে আলমোড়া লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে বিরজানন্দের কাকুতি-মিনতিতে স্বামীজি মায়াবতীতেই যাওয়া স্থির করিলেন। বিরজানন্দের জন্য একদিন কাঠগোদামে বিশ্রাম করা হইল। তাহা ছাড়া স্বামীজির নিজেরও শরীর ভাল ছিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামীজি যে সময়ে আসিলেন পাহাড়ে আসিবার পক্ষে উহা অত্যন্ত খারাপ সময়। ঐ বৎসর (১৯০০—১৯০১) প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল। তাহার উপর সে সময়টায় ঐ শীত আরও ভীষণ হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামীজি বিরজানন্দের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে দেখিয়া

এবং পাছে আরও কষ্ট হয় এই ভাবিয়া তাঁহার জন্য একটি ঘোড়া আনাইলেন। যাত্রার সকল ভার বিরজানন্দের উপরই ছিল। তিনিই রাঁধিতেন, স্বামীজিকে খাওয়াইতেন এবং তাঁহার যাহা কিছু দরকার হইত সম্পাদন করিতেন। স্বামী সদানন্দ স্বামীজির পোশাক-পরিচ্ছদ, লটবহর এই সব লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। প্রথম প্রথম স্বামীজি ছোটছেলের মত বেশ আহ্লাদে কাটাইলেন। ভীমতালে আহারাদির জন্য একবার থামা হইল। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা 'ঢারি' পৌঁছিলেন এবং সেইখানকার ডাকবাংলায় রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন সকাল হইতেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল এবং ভয় হইল বোধ হয় বরফও পড়িবে। সেদিন ১৫ মাইলের এদিকে আর বিশ্রামের জায়গা ছিল না, অথচ বাহির হইতে বেশ বেলা হইল। আকাশে ঘোর ঘনঘটা। বিরজানন্দ স্বামীর বড় উৎকণ্ঠা হইল, কারণ তাঁহারই ঘাড়ে সকল দায়িত্ব। যদি ঠিক সময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে না পারেন তাহা হইলে পথে বড় কষ্ট হইবে। স্বামীজির জন্যই তাঁহার প্রধান ভাবনা হইল। দুই মাইলের পর হইতেই বৃষ্টি চাপিয়া আসিল ও চারিদিক কুয়াসায় অন্ধকার হইল। অল্প অল্প বরফও দেখা দিল। তাহাতে পথঘাট আচ্ছন্ন হইল না বটে, কিন্তু ক্রমেই বেশী বরফ পড়িতে আরম্ভ করিল। স্বামীজি গ্রাহ্যও করিলেন না, বরং বেশ আমোদ বোধ করিতে লাগিলেন এবং সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বরফ পড়িলে কিরূপ হয় তাহার গল্প করিতে লাগিলেন। তারপর ক্রমশঃ বেশী বরফ পড়াতে নামিবার সময় ডাণ্ডীবাহকদের পদস্খলন হইতে লাগিল। তথাপি স্বামীজি গ্রাহ্য করিলেন না। বরং তিনি আরও স্ফূর্তির সহিত তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য নানারূপ মস্করা করিতে লাগিলেন। তাহাদের ভিতর একজন বড় মজার লোক ছিল। তাহার বারকতক বিবাহ

হইয়াছিল, কিন্তু একটি স্ত্রীও বাঁচিয়া ছিল না, আর 'চণ্ডী' পুস্তকখানি সমস্ত তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাহার সেই অদ্ভুত সুর আর বিশ্রী উচ্চারণের সঙ্গে চণ্ডীর সংস্কৃত অতি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিল। স্বামীজি কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার ভুল সংশোধন করিয়া আরও বলিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে তাহাকে 'পণ্ডিতজী' বলিয়া ডাকিতেছিলেন। তাহাতে লোকটি খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। আর একটু মজা করিবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে আর বিবাহ করিতে রাজী আছে কি না। সে অম্লানবদনে বলিল, 'তা খুব রাজী আছি। কিন্তু যৌতুকের টাকা কোথায়?' স্বামীজি বলিলেন, 'ধর যদি আমিই দিই।' লোকটির আনন্দ দেখে কে! সে আনন্দে গদগদ হইয়া ঘন ঘন স্বামীজিকে প্রণাম করিতে লাগিল।

কন্‌কনে বাতাস ও বরফের মধ্যে বড় বেশী জোরে যাওয়া যাইতেছিল না। সুতরাং চারি হইতে সাড়ে সাত মাইল দূর পহরাপানি পৌঁছিতেই বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। এখানে একটি ছোট দোকানঘরে যাত্রীরা দুই-এক ঘণ্টার জন্য থাকিয়া আহারাদি করিয়া লয়। এখানে স্বামীজির লোকেরা সকলের আগে পৌঁছিয়া চা খাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিল। স্বামীজি তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন, "তোরা কিছু খাবার খেয়ে নে। আমি পয়সা দিব। আর কোথায় যাবি?" লোকগুলি অমনি চিৎ হইয়া পড়িয়া হুঁকা টানিতে লাগিল আর গোটাকতক ভিজাকাঠ যোগাড় করিয়া আগুন ধরাইবার চেষ্টা করিল। বিরজানন্দ স্বামী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সর্ব্বনাশ! আজ বুঝি এইখানেই রাত কাটাইতে হয়! দোকান ত ভারী! একটা ভাঙ্গা চালা, ১৪ হাত লম্বা আর হাত দশেক চওড়া; ওদিকে চালের খড় ত খসিয়া পড়িতেছে। সেই চালার ভিতর এক পাশে দোকান, তারপর দোকানীর শুইবার আর

রঁাধিবার জায়গা, আর এক কোণে একটা কাঠের গাদা। মাটির ভিতর একটা গর্ত্ত করিয়া চুলা তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহার ভিতর খানকতক ভিজা কাঠ গোঁজা, তাহা হইতে বেজায় ধেঁায়া উঠিতেছে। সে চুলা নিভাইবার জো নাই—উহা হইতেই যাত্রীদের তামাক খাইবার আর রান্নার আগুন হয়। উহার ভিতর ত আড্ডা নেওয়া হইয়াছে। পাশে একটা ছোট নালা, তার না আছে দেওয়াল, না আছে কিছু; উপরে খানকতক লকড়ি কাঠি, তাহাই দিয়া কোনরকমে মাথাটা বাঁচাইবার ব্যবস্থা আছে, আর চারিপাশ দিয়া বরফ আর বৃষ্টি ক্রমাগতই আসিতেছে। তাহার ভিতর লোকগুলি চা তৈরী করিতেছে। আগুনের সামনে একবার হুঁকা হাতে করিয়া বসিলে তাহাদের আর উঠায় কার সাধ্য!

দেখিতে দেখিতে ৫টা বাজিয়া গেল। অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। 'সৌরনালা' যাওয়া ত ঘুরিয়া যাইবার যোগাড়! বেশ বোধ হইল সেদিন সারারাত্র সেই ভয়ানক অন্ধকূপের মধ্যে কাটাইতে হইবে। স্বামীজি মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাগের চোটে বকাবকি আরম্ভ করিয়া দিলেন—"সবগুলোই আহাম্মক, যদি বরফ পড়বার ভয়ই ছিল তবে তাঁকে কি বলে আসতে দিলে! যার বয়স বেশী তার একটু বিবেচনা থাকা উচিত ছিল! আর যার বয়স কম তারও আলমোড়া যাওয়া বন্ধ করা ভাল হয় নি" ইত্যাদি। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামীজিও খানিকক্ষণ গম্ভীর ও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। বিরজানন্দের ভয় হইল পাছে এই জঙ্গলের মধ্যে স্বামীজি অসুখে পড়েন। কিন্তু তিনি তিরস্কারের উত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমাদের দোষ কি বলুন। আপনি এই লোকগুলোকে চা খাবার অবসর দিয়েই ভুল করেছেন। ওদের জন্যই ত এত সময় নষ্ট হল। আমি যখন এখানকার লোকদের

ধাত জানি তখন আপনার উচিত ছিল আমার ওপরই সব ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা। যদি এখানে না আসা হত তবে সন্ধ্যের আগে কোনরকমে সৌরনালার ডাকবাংলায় পৌঁছাতে পারা যেত।" স্বামীজি অপরাধী বালকের ন্যায় চুপ করিয়া কথাগুলি শুনিলেন। তাহার পর নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন, "যাক বাবা। আমি যা বলেছি—বলেছি। কিছু মনে করিস নি। বাপে কি আর ছেলের উপর রাগ করে না? এখন কি করা যায় বল।" তারপর পৃষ্ঠদেশে ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে তিনি শিষ্যকে মেরুদণ্ড একটু টিপিয়া দিতে বলিলেন। ক্রমশঃ বেশ প্রফুল্ল হইলেন, এমন কি দোকানীকে বকশিশ পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন এবং সে যেন কতকালের পরিচিত এমন ভাবে তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সে রাত্রি ত সেই দোকানে অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু 'ঘোড়ার চাপাটি' খাইয়া কাটিল; সঙ্গে একটা আলুর তরকারীও ছিল। কিন্তু মানুষের দাঁতের সাধ্য কি তাহা চিবায়! ঘুম কেমন হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বাহিরে ক্রমাগত বৃষ্টি ও বরফ পড়িতেছে, ভিতরে ধোঁয়ার দৌরাত্ম্যে দম আটকাইবার উপক্রম। তাহার উপর আবার আর এক কৌতুক। দুপুর রাত—স্বামীজি জাগিয়া আছেন—দোকানদার ও তাহার আত্মীয় অতিথিদের লক্ষ্য করিয়া খুব বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। সে জানিত না যে স্বামীজি পাহাড়ী ভাষায় অনভিজ্ঞ নহেন, সুতরাং মনের সাধে খুব গালিগালাজ করিতেছে—তাঁহাদিগকে জায়গা দিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইলেই সর্ব্বপ্রথমে উহাদিগকে তাড়াইতে হইবে, ইত্যাদি। লোকটির ব্যবহারে স্বামীজি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলেন, বিশেষতঃ ঐ ব্যক্তিই বলিয়াছিল, 'যদি বেশী বরফ পড়ে তবে কালও থাকবেন।' যাহা হউক স্বামীজি যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে প্রতিশ্রুত বকশিশ

দিতে ভুলিলেন না। লোকটা কস্মিন্ কালেও এত আশা করে নাই।

এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ রজনী অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে বার ইঞ্চি বরফের মধ্য দিয়া বিশ্রান্ত ডাণ্ডীওয়ালারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বামী শিবানন্দের ঘোড়া ছুটিয়া পালাইয়া যাওয়াতে বিরজানন্দ নিজ অশ্ব তাঁহাকে দিয়া স্বয়ং পদব্রজে যাইতেছিলেন। ডাণ্ডীওয়ালাদিগের সহিত একসঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহাকে অধিকাংশ পথ ছুটিয়া যাইতে হইল। তারপর সৌরনালায় পৌঁছিয়া সেদিনকার মত সকলে বিশ্রাম করিলেন। গোবিন্দসা ও সদানন্দ স্বামী পূর্ব্বরাত্রেই সকলের আগে এখানে আসিয়াছিলেন। এখানে বেশ গন্‌গনে আগুন, ঝক্‌ঝকে ঘর-দোর ও আহারাদির প্রশস্ত আয়োজন দেখিয়া স্বামীজি মহাখুশী হইলেন এবং গত রাত্রের প্রসঙ্গ লইয়া নানা আমোদ করিতে লাগিলেন।

পরদিন (১৯০১ সালের ২রা জানুয়ারী) বরফ গলিয়া গেল। পথে 'দেবীধূরা' ও 'ধুনাঘাট' এই দুই জায়গায় থামিবার কথা। প্রায় ২১ মাইল পথ। স্বামীজি খানিক পথ হাঁটিয়া চলিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। তখন এক হাতে একটি লাঠি লইয়া এবং আর এক হাত বিরজানন্দ স্বামীর কাঁধে রাখিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, কি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি! এক সময়ে এই পাহাড়ে রোজ ২০।২৫ মাইল হেঁটেছি। আর আজ এইটুকু আসতেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে! আর বেশী দিন নয়।" সকলেই তাঁহার শরীরের অবস্থা-দর্শনে বিষণ্ণ হইলেন। মনে হইতে লাগিল এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হইতে পারে।

পরদিন সকলে মায়াবতী আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে আশ্রমের

দৃশ্য দেখিতে পাইয়া স্বামীজি অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ায় উঠিয়া জোরে আশ্রমাভিমুখে ছুটাইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আশ্রম পত্রপুষ্পে সজ্জিত এবং দ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়াছিল। বহুদিন পরে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া সকলেরই অসীম আনন্দ হইল।

দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যে কয়দিন মায়াবতীতে ছিলেন সে কয়দিন ক্রমাগত বরফ পড়িয়াছিল, সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও বেশী দূর বেড়াইতে পারিতেন না। উপরের একটি ঘরে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে বড় ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে নীচের ঘরে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড ছিল বলিয়া সেখানে নামিয়া আসিলেন। ১৮ই পর্য্যন্ত তিনি মায়াবতীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬ই চম্পাওয়াৎ হইতে কতকগুলি লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। তারপর ৯ই চীরপানি হইতে মিঃ বীডন (বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাটের পুত্র) নামক চা-বাগানের এক সাহেব আসিলেন। তারপর ১১ই তারিখ আসিলেন তহশীলদার সাহেব ও তাঁহার সঙ্গে আর কয়জন লোক। ১৩ই জানুয়ারী তাঁহার জন্মদিন। সেদিন তিনি ৩৮ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। পরদিন মিঃ সেভিয়ারের জন্মদিন। বাঁচিয়া থাকিলে সেদিন তাঁহার ৫৬ বৎসর হইত।

স্বামীজি যে কয়দিন মায়াবতীতে রহিলেন সে কয়দিন আশ্রমে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহার শ্রীমুখের নিত্যনূতন বচনপরম্পরা, 'নব নব নিতুই নব' কথাবার্ত্তা আশ্রবাসীদের মনপ্রাণ শীতল করিতে লাগিল। যে কথায় তন্দ্রা কাটে, জড়তা ছুটে, মোহ দূরীভূত হয়, হৃদয় নাচিয়া উঠে, ধমনীতে তাড়িতপ্রবাহ বহিতে থাকে, সে কথা শুনিয়া কি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়? একদিন কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ভাবতরঙ্গ- উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া যেন বৃহৎ জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দিতেছেন। এই

ভাবে দীপ্ত চক্ষুর বিমল জ্যোতিতে দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য শিষ্যদিগের অসাধারণ ভক্তি ও আনুগত্যের কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন যে ওদেশে এমন বহু ভক্ত আছে যাহারা তাঁহার কথায় অকাতরে মৃত্যুমুখে যাইতে প্রস্তুত; তাহারা কিরূপ নীরবে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সতত তাঁহার সেবা করিয়াছিল, মায়ামমতাশূন্য হইয়া কিরূপে তাঁহার সেবার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিল এবং তাঁহার একটি কথায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে রাজী ছিল তাহারই গল্প বলিতেছিলেন। "এই দেখ কাপ্তেন সেভিয়ার কেমন ভাবে আমার কাজের জন্য মায়াবতীতে প্রাণটা দিয়ে গেল!" আর একদিন আজ্ঞাবহতা-সম্বন্ধে বলিতে বলিতে বলিয়াছিলেন, "জোর করে কেউ কাউকে দিয়ে ভক্তি বা হুকুম তামিল করাতে পারে না। খাঁটি প্রেম ভালবাসা আর মহচ্চরিত্রের কাছে সকলেই নত হয়। সুতরাং যার এ দুটি আছে তাকে সকলেই মানে।" তিনি বলিতেন, তিনটি জিনিসকে মানা বা শ্রদ্ধা করা বিশেষ দরকার—১ম, যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে; ২য়, যে সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে; ৩য়, যিনি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বা মঠাধীশ।

আশ্রমের কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করা উচিত এ সম্বন্ধে তিনি স্বরূপানন্দ স্বামীর নিকট একদিন স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপানন্দকে খুব উৎসাহ ও তেজের সহিত ঐসকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার পরামর্শ দিতেছিলেন। স্বরূপানন্দ বলিলেন যে, তিনি নিজে ঐ ভাবে কার্য্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারেন বটে, কিন্তু যদি মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য না করেন এবং অন্ততঃ তিন বৎসর একস্থানে স্থায়ী হইবার আশা না থাকে তবে ঐসব কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। স্বামীজি স্বরূপানন্দের মনোভাব বুঝিলেন এবং সকলে সমবেত হইলে ঐ কথা উত্থাপিত করিলেন। তাঁহার

অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকলেই উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেবল স্বামী বিরজানন্দ অতিশয় বিনীতভাবে কিছুদিন স্থানান্তরে অবস্থান করিয়া ধ্যান-ধারণা ও মাধুকরী ভিক্ষায় দিন যাপন করিবার বাসনা জানাইলেন। স্বামীজি 'মাধুকরী'র কথা শুনিয়া উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিরজানন্দকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিলেন এবং বলিলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখ্। অত কষ্ট সহ্য করে শরীরটাকে মাটি করিস নি। আমরা শরীরটাকে বেজায় কষ্ট দিয়েছি। তার ফলে হয়েছে কি?—না, জীবনের যেটা সব চেয়ে ভাল সময় সেখানটায় শরীর গেল ভেঙ্গে, আর আজও পর্য্যন্ত তার ঠেলা সামলাচ্ছি। তারপর অনেকক্ষণ ধ্যানধারণার কথা কি বলছিস? যদি পাঁচ মিনিট—পাঁচ মিনিট কেন, এক মিনিটও মনটা একটা বিষয়ে একাগ্র করতে পারিস তা হলে যথেষ্ট। আর তা করতে হলে রোজ সকালে বিকালে একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করে অভ্যাস করতে হবে। বাকী সময়টা পড়াশুনো, কি সাধারণের হিতকর কোন কাজে লাগিয়ে রাখবি। আমি চাই আমার শিষ্যেরা শারীরিক কৃচ্ছ্রতার চেয়ে কর্ম্মের দিকে বেশী ঝোঁক দিবে। কর্ম্ম আর কি? সাধনাও তপস্যারই ত একটা অঙ্গ!"

বিরজানন্দ স্বামী সব স্বীকার করিয়া লইলেন, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ছাড়িলেন না; বলিলেন, নিষ্কাম কর্ম্মসম্পাদনের উপযোগী শক্তিসঞ্চয়ের জন্য প্রথমটা একটু তপস্যা করা দরকার। স্বামীজি তাঁহার গোঁ দেখিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীজির স্বভাব জানিতেন, সুতরাং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে স্বামীজি আর সকলকে বলিলেন, "মোটের উপর কিন্তু কালীকৃষ্ণ যা বলছে তাই ঠিক। ওর হৃদয়টা আমি বুঝেছি। ধ্যানধারণা আর স্বাধীন জীবন এইটা যে সন্ন্যাসজীবনের প্রধান গৌরব তা কি আর আমায় বলতে হবে রে! আমারও এক সময়ে অমনি করে

দিন কেটেছে—একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর সম্বল নিয়ে ভিক্ষে মেগে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি—সেসব কি সুখের দিনই গেছে! যদি সর্ব্বস্ব দিয়েও আবার সেই দিন ফিরে পাওয়া যেতো তাতেও রাজী আছি।” যাহা হউক, পরে স্বামীজির প্রস্তাবে বিরজানন্দ সম্মত হইয়াছিলেন।

হিমালয়ক্রোড়ে এই জনকোলাহলশূন্য শান্তরসাস্পদ আশ্রমভবনে স্বামীজি বড় প্রীতি অনুভব করিলেন। মিসেস্ সেভিয়ারের সহিত তিনি যখন আলাপ করিতেন তখন মনে হইত যেন একটি শিশু তাহার জননীর সহিত কথা কহিতেছে। কখনও কখনও তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িতেন বটে এবং হয়ত আশ্রমের সন্ন্যাসীদের দুই-চারিটা কড়া কথাও শুনাইয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যে গরল ছিল না। তাঁহার তিরস্কারের ভিতরও প্রায়ই কোন শিক্ষার বিষয় বা প্রচ্ছন্ন আশীর্ব্বাদ নিহিত থাকিত।

মায়াবতী হইতে যেসকল সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয় তন্মধ্যে ধরমঘর নামক স্থানের তুষার-দৃশ্য অতি মনোহর। ঐ স্থানটি পার্শ্ববর্তী সকল স্থান অপেক্ষা উচ্চতর। দুই-চারি দিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে আশ্রমের সকলকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজি ঐ স্থানে গমন করিলেন এবং তাহার অবস্থান ও মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য-দর্শনে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল ঐ স্থানে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া নির্জ্জনে ধ্যানভজন করেন। হ্রদপার্শ্বস্থ রাস্তাটি তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। তিনি মিসেস্ সেভিয়ারকে বালসুলভ সরলতা সহকারে বলিয়াছিলেন, “জীবনের শেষভাগে সমস্ত জনহিতকর কার্য্য ত্যাগ করিয়া এইখানে আসিব, আর গ্রন্থরচনা ও সঙ্গীতালাপ করিয়া দিন কাটাইব।”

মায়াবতী আশ্রমে একটি ঠাকুরঘর ছিল, সেখানে ভোগরাগাদি সহকারে পরমহংসদেবের অর্চ্চনা হইত। অদ্বৈত আশ্রমে কিন্তু ঠাকুরপূজা স্বামীজির বড় ভাল লাগে নাই। তিনি বলিতেন, অদ্বৈত আশ্রম শুধু অদ্বৈতভাবেই

পূর্ণ থাকিবে, তথায় দ্বৈতভাবের নামগন্ধও যেন না থাকে, অর্থাৎ এখানে বাহ্য রূপাদির সহায়তায় ভগবদুপলব্ধির চেষ্টা না করিয়া যেন এক অখণ্ড, অদ্বয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মধ্যানে অবগাহন করিবার জন্যই সকলের চেষ্টা হয়। কিন্তু যেসকল ভক্ত ঐ ঘর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পাছে তাঁহাদিগের প্রাণে আঘাত লাগে এজন্য তখনই তিনি উহা ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন না। যাহাতে তাঁহারা আপনারাই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করেন এই ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে নিজ অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমে ঠাকুরঘরটি এখান হইতে উঠিয়া যায়। একজন সন্ন্যাসী নিজের দ্বৈতভাব লইয়া ঐরূপ স্থানে থাকা উচিত কিনা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "শ্রীগুরুদেব নিজে অদ্বৈতময় ছিলেন ও অদ্বৈতভাব প্রচার করতেন। তুমি তবে ঐ ভাব গ্রহণ করতে 'কিন্তু' করছ কেন, বাবা? তাঁর সব শিষ্যই যে অদ্বৈতবাদী!"

বেলুড় মঠে ফিরিয়া এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামীজি হতাশভাবে বলিয়াছিলেন, "আমি ভেবেছিলুম অন্ততঃ একটা কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্য পূজাদি বন্ধ থাকবে! কিন্তু হায় হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো সেখানেও জেঁকে বসেছেন!"

স্বামীজি বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। মায়াবতীতে গিয়া চিঠিপত্র লেখা ও ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া ছাড়া 'প্রবুদ্ধ ভারতের' জন্য তিনি তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—১ম 'আর্য্য ও তামিল জাতি' নামক ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একটি সুচিন্তিত সন্দর্ভ; ২য়, 'সমাজসমস্যা-বিষয়ক সভার অধিবেশন' অর্থাৎ ১৯০০ সালের ভারতবর্ষীয় সমাজসমস্যা-বিষয়ক সভার অধিবেশনে সভাপতি বিচারপতি রানাডের অভিভাষণের উত্তর। তিনি মহারাষ্ট্র জননায়কের স্বদেশপ্রেম ও উদারনীতির প্রশংসা করিলেও তাঁহার সন্ন্যাসিবিদ্বেষের বিপক্ষে লেখনী ধারণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত মূল্য কি, ইতিহাসের সাহায্যে তাহা দেখাইয়াছিলেন, অর্থাৎ ভারতের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় যে নিতান্ত অলস ও অকিঞ্চিৎকর নহেন, তাঁহারা যে বসিয়া বসিয়া সমাজের স্কন্ধারূঢ় হইয়া আত্মোদর-পূরণেই ব্যস্ত নহেন তাহার প্রমাণ এই যে, ঔপনিষদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এদেশে যত কিছু জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যত কিছু শক্তিপ্রদ, প্রাণপ্রদ, উচ্চ আশাপ্রদ চিন্তাস্রোত সমাজ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার আবিলতা, জড়তা ও মোহপঙ্ক দূর করিয়াছে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি, রক্ষা ও সজীবতা সম্পাদন করিয়াছে তাহার মূলে সন্ন্যাসী বিদ্যমান। সন্ন্যাসীই এই ভারতে চিরদিন বল, বুদ্ধি, ভরসা দান করিয়াছেন, ধর্ম্মের গ্লানি ও সমাজের অবনতির দিনে অবসন্ন রাজশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অন্যায় অত্যাচারের প্রতীকারার্থ ক্ষত্রিয়তেজকে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং শান্তির দিনে উন্মত্ত ভোগবিলাসের মাঝখানে ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়া সমাজশক্তিকে সংযমের পথে চালিত করিয়াছেন—মোট কথা সন্ন্যাসীই যুগে যুগে এই ভারতের ধাতা, পাতা ও নিয়ন্তা হইয়া আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন—'সংস্কার' 'সংস্কার' বলিয়া যিনি যতই চীৎকার করুন এবং নিষ্কর্ম্মা অন্নধ্বংসকারী বলিয়া সন্ন্যাসীকে যতই গালি দিন। ৩য়, 'থিওসফি-সম্বন্ধে দুই-চারিটি মন্তব্য' নামক একটি অকপট সমালোচনা। ইহা ব্যতীত তিনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বন্ধুর অনুরোধে ঋগ্বেদের অন্তর্গত 'নাসদীয় সূক্তের' একটি সুন্দর অনুবাদও করিয়া দিয়াছিলেন।

মায়াবতীতে যেসকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে দুই-একটির উল্লেখ করিয়া আমরা পাঠককে স্বামীজির কিরূপ বালকের ন্যায় সরল প্রাণ ছিল তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। একদিন আহার প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। তিনি শিষ্যদের কর্ম্মশৈথিল্য ও তৎপরতার

অভাবের অনুযোগ করিয়া বিশেষ বিরক্তভাবে সকলকে তিরস্কার করিতে করিতে একেবারে রন্ধনশালায় (যেখানে বিরজানন্দ স্বামী রন্ধন করিতেছিলেন) গিয়া উপস্থিত। কিন্তু সেখানে ধোঁয়ার অন্ধকারে বিরজানন্দকে ক্রমাগত আগুনে ফুঁ দিতে ও শীঘ্র রন্ধন সম্পন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে দেখিয়া কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আহার্য্য আনীত হইলে রোষভরে বলিলেন, "নিয়ে যা। আমি খেতে চাই না।" বিরজানন্দ তাঁহার স্বভাব উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনি কিছু না বলিয়া পাত্রটি সম্মুখে রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এক মিনিট—দুই মিনিট—তিন মিনিট—বস্! তার পর স্বামীজির রাগ পড়িতে লাগিল। তিনি ক্ষুধাতুর বালকের ন্যায় আহার্য্য দ্রব্যাদি মুখে দিয়াই খুব খুশী হইলেন—এত যে রাগ, কোথায় চলিয়া গেল! তাহার পর খাইতে খাইতে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "গ্যাখ, এত রাগ হয়েছিল কেন জানিস? ভয়ানক খিদে পেয়েছিল।"

চতুর্দ্দিক বরফাচ্ছন্ন থাকাতে স্বামীজি আশ্রমের মধ্যেই বন্দী হইয়া রহিলেন। আর সে দুর্জ্জয় শীত সহ্য করিবার মত অবস্থাও তাঁহার ছিল না। সুতরাং শীঘ্রই মায়াবতী ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তখন অনেক ভাড়া দিয়াও কুলি যোগাড় বড় শক্ত ব্যাপার। একদিন মনটা বেশ প্রফুল্ল আছে—তিনি শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যদি কুলি না পাওয়া যায় তবে তাঁহারা কি করিবেন। বিরজানন্দ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "স্বামীজি! কুছ পরোয়া নেই, তা হলে আমরা নিজেরাই আপনাকে বয়ে নিয়ে যাবো।" স্বামীজি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওঃ বুঝেছি। আমাকে বুঝি খদে ফেলবার মতলব আঁটা হচ্ছে!" অবশেষে অন্য পথে টনকপুর দিয়া পিলিভিত যাওয়া সিদ্ধান্ত হইল। সদানন্দ স্বামীকে ডাকিয়া স্বামীজি বলিলেন, "দেখ, এবার

সব ভার বিরজানন্দের ওপর। ওর মাথাটা খুব ঠাণ্ডা, আর বহ্বাড়ম্বর নেই। এবার তুইও কিছু করবি নি, আমিও কিছু করবো না, বুঝলি ?” এদিকে বেগতিক দেখিয়া স্বরূপানন্দ স্বামী নিজেই চা-বাগানে কুলি সংগ্রহ করিতে গেলেন। অন্য দিকে আর এক মুশকিল হইল। দুই-তিন দিন পূর্ব্বে গ্রাম হইতে কুলি সংগ্রহ করিবার জন্য যাহাদিগকে পাঠান হইয়াছিল তাহারাও বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যতগুলি কুলি আবশ্যক সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের সহিত মায়াবতী ত্যাগ করিয়া কতকদূর অগ্রসর হইতেই সকলে দেখেন সম্মুখে স্বরূপানন্দ স্বামী কতকগুলি কুলি লইয়া আসিতেছেন। তখন চা-বাগানের লোকদের বেশ মোটা বখশিশ দিয়া বিদায় করা হইল।

মায়াবতী হইতে পিলিভিত পর্য্যন্ত সারা পথ স্বামীজির মেজাজ বেশ সুন্দর ছিল। প্রথম রাত্রি চম্পাওয়াৎ ডাকবাংলায় বসিয়া তিনি গভীর আবেগের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন ; বলিলেন “তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, আর লোকচরিত্র-জ্ঞানও অসাধারণ ছিল। যার সম্বন্ধে যা বলতেন সেটা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যেতো। তাঁর শিষ্যদের জনকতককে তিনি ‘ঈশ্বরকোটি’ বলে নির্দ্দেশ করতেন আর সাধারণ জীবদের বলতেন ‘জীবকোটি’। ঈশ্বরকোটিদের তুলনায় জীব-কোটিদের আসন অনেক নীচে দিতেন ; বলতেন, ঈশ্বরকোটি আচার্য্যস্থানীয়, লোকশিক্ষার জন্যই তাঁর দেহধারণ। আমি অনেকবার ওকথাটা পরীক্ষা করে দেখেছি। তাঁর কথা একটুও বেঠিক হয় নি। যাঁদের তিনি ঈশ্বরকোটি বলতেন, সব সময় হয়ত তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না, কি হয়ত অনেক সময় তাদের কড়া কথাও বলতে হয়, কিন্তু তারা যে প্রকৃতই উন্নত-শ্রেণীর আত্মা, তার আর সন্দেহ নেই।” বলিতে বলিতে বক্তৃতার ভাব আসিল, চক্ষু দুটি জ্বলিয়া উঠিল, মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিতে

মণ্ডিত হইয়া উঠিল ; তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আর যতই যাই হোক, যতই যাই হোক—আমি তাঁর আদর্শ থেকে একচুল ভ্রষ্ট হই নি—অন্তরের সঙ্গে তাঁকে মেনে চলেছি।" অনেক দিন পূর্ব্বে আর এক সময়ে ঈশ্বরকোটিদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "তাদের আমি যত বিশ্বাস করি, আর কাউকে তেমন করি না। আমি জানি যদি পৃথিবী-শুদ্ধও আমায় ছেড়ে পালায় তবু তারা আমায় কখনও ছাড়বে না। যত অসম্ভবই হোক, আমার ভাব ও উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করবার জন্য তারা প্রাণ দেবে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে সাত জনকে বলিতেন ঈশ্বরকোটি। যখন অবতারের আবির্ভাব হয় তখন তাঁহার লীলার সহায়তা করিবার জন্য যেসকল অন্তরঙ্গ ভক্ত দেহধারণ করিয়া আসেন তিনি 'ঈশ্বরকোটি' শব্দ দ্বারা তাঁহাদিগকেই নির্দ্দেশ করিতেন। সুতরাং বলিতে গেলে ইঁহাদের 'মুক্তি' বলিয়া কিছু নাই (কারণ ইঁহারা নিত্যমুক্ত) এবং ইঁহাদের সাধনাও অজ্ঞাতসারে শুধু লোকশিক্ষারই জন্য। এই শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে পরমহংসদেব স্বামীজিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিতেন।

পরদিন সকালে দেউড়ি পৌঁছিবার কথা। দেউড়ি ওখান হইতে ১৫ মাইল দূর। স্বরূপানন্দ স্বামী চম্পাওয়াৎ পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় মায়াবতীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। বেলা ১টার সময় সকলে দেউড়ি পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু আবার এক বিভ্রাট উপস্থিত। ডাকবাংলার চৌকিদার দরজার চাবি বন্ধ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার কোন সন্ধান নাই—সৌভাগ্যক্রমে তালাটা টানিতেই খুলিয়া গেল, তখন সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। স্বামীজির সহিত গোবিন্দলাল সাহ, স্বামী শিবানন্দ, সদানন্দ এবং বিরজানন্দ আছেন। বিরজানন্দ রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু হাঁড়িতে এত চাল চড়ান হইয়াছিল যে খানিক পরেই ভাত অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থায় উথ্‌লাইয়া পড়িবার

উপক্রম হইল। ওদিকে স্বামীজির ক্ষুধা পাইয়াছে। তিনি লোকের পর লোক পাঠাইয়া রন্ধন কতদূর হইল সংবাদ লইতেছেন। বিরজানন্দ স্বামী মহা ফাঁপরে পড়িলেন। ঠিক করিলেন, কিছু ভাত বাহির করিয়া লইয়া আবার হাঁড়িতে জল দিবেন ; এমন সময়ে স্বামীজি আসিয়া বলিলেন, "ওরে, ওসব কিছু করতে হবে না। আমার কথা শোন—ভাতে খানিকটা ঘি ঢেলে দে আর হাঁড়ির মুখের সরাখানা উলটে দে। এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর খেতেও খুব ভাল হবে।" বিরজানন্দ তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করিলেন। ফলে সেদিন বৈকালে সকলেই মহাতৃপ্তির সহিত ঘি-ভাত ভোজন করিলেন। তারপর পনর মাইল দূরে টনকপুর। সে স্থানটা সমভূমি। সেখানে পৌছিয়া দেখা গেল ডাকবাংলায় লোক আছে। সুতরাং বাজারে এক মুদীর দোকানের উপর বাসা লওয়া হইল। নীচে যাত্রীরা রাঁধিতেছে, তাহার ধোঁয়া উপরে উঠিয়া মহা জ্বালাতন করিতে লাগিল। দোকানী স্বামীজিকে নিজের খাটিয়াখানা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতে ঘুম হইবে কেন ? পুরানো একখানা খাটিয়া—স্বামীজি যতবার পাশ ফিরিতে লাগিলেন সেটা কেবল ক্যাচ কোঁচ করিয়া আপনার জীর্ণাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মনে হইতে লাগিল—এই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্বামীজি উহা লইয়া খানিকক্ষণ ফষ্টিনষ্টি করিলেন।

পরদিন প্রাতে পিলিভিত যাইবার জন্য ঘোড়া যোগাড় করা হইল। সদানন্দ স্বামী সব চেয়ে একটা তেজী ঘোড়ায় উঠিলেন, এবং খুব ছুটাইয়া শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। টনকপুর হইতে মাইলখানেক যাওয়ার পর স্বামীজি তাঁহার কোন চিহ্ন না দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পথে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল ঘোড়া কিছু দূরে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সওয়ার সমেত মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়াছে। সকলে তখন অবতরণ করিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলেন। খানিক পরেই দেখা গেল সদানন্দ স্বামী

ঘোড়া হাঁকাইয়া আসিতেছেন। ঘোড়া সওয়ারকে ইহার মধ্যে একবার ফেলিয়াও দিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন আঘাত লাগে নাই। এই ঘটনায় স্বামীজির আর একদিনের কথা মনে পড়িল। স্বামীজি তখন খেতড়িতে। সদানন্দ একটা ভয়ানক দুষ্ট ঘোড়ায় চড়িয়াছেন। রাজবাটীর ছাদ হইতে স্বামীজি, মহারাজ ও অন্যান্য সকলে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন—সদানন্দ সেই বজ্জাত ঘোড়ায় চড়িয়া তীরবেগে ছুটিয়াছেন, কিন্তু ঘোড়া সওয়ারের সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বামীজি সেদিন সদানন্দ স্বামীর অশ্বারোহণ-দক্ষতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "সদানন্দ বাবা, তুমিই আমার ঠিক মরদ শিষ্য।"

টনকপুর হইতে তিন মাইল গেলে মেজর হেনেসী আসিয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপন বাংলা হইতে স্বামীজিকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন; বেলা ২টার সময় খাতিমায় পৌঁছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় স্বামীজি শিবানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "মহাপুরুষ (ইনি এই নামে মঠে সকলের নিকট পরিচিত), তুমি পিলিভিতে আমাদের ছেড়ে একলা বেলুড় মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে যাবে।" ঐ প্রসঙ্গেই স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "বেলুড় মঠের প্রত্যেক সন্ন্যাসী ভারতের চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচার করে আর লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়াবে। আর শেষকালে অন্ততঃ ২০০০৲ টাকা এনে সাধারণ ধনভাণ্ডারে জমা দেবে।" শিবানন্দ স্বামী বিনীতভাবে আজ্ঞাপালনে সম্মতি জানাইলেন।

চতুর্থ দিন, সেই দিন শেষ দিন, স্বামীজি একটা ঘোড়ায় চড়িলেন এবং বিরজানন্দকে অশ্বারোহণে ভীত দেখিয়া বলিলেন, "আমি তোকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিয়া নিজে অশ্বে কশাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন এবং বিরজানন্দকে ঐরূপে পশ্চাদ্গামী হইতে বলিলেন। তাঁহার ঘোড়া ত্বরিত-

গতিতে ছুটিল। ইহাতে তাঁহার ভয় কাটিয়া গেল। তিনি আর সকলের ন্যায় হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন।

বেলা চারিটার সময় তাঁহারা পিলিভিত আসিয়া পৌঁছিলেন। পাছে দেরী হইয়া ট্রেণ না পান এই ভয়ে পথে কেহই আহার করেন নাই। স্বামী সদানন্দ ও গোবিন্দলাল অন্য সকলের অগ্রে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল পিলিভিতের ডেপুটি কলেক্টর পণ্ডিত ভবানীদত্ত যোশীকে স্বামীজির আগমন-বার্ত্তা প্রদান করিতে গিয়াছিলেন এবং সদানন্দ স্বামী আহার্য্যসংগ্রহের চেষ্টায় বাজারে গিয়াছিলেন। ভবানীদত্ত যোশী স্বামীজির অভ্যর্থনার জন্য সবান্ধব রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে আমিষ-ভক্ষণের কথা উঠিল। পণ্ডিতজী সবিনয়ে মাংসভোজনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বামীজি বেদ ও সংহিতাসমূহ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মাংসভোজন শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া দেখাইলেন এবং শেষে বলিলেন, "অত কথায় কাজ কি? আজকাল হিন্দুরা যে গোমাংসের নামে শিহরিয়া উঠেন, বৈদিক ঋষিরা সেই গোমাংস ভোজন করিতেন, এমনকি প্রাচীন যুগে অতিথির সম্মানের জন্য ও শুভকর্ম্মে গোবধ একটা রীতি ছিল। হিন্দুজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নিরামিষ-ভোজনের পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে—এর প্রধান কারণ দেশাচার আর লোকাচার।"

মিঃ যোশী নীরবে শুনিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ওদিকে স্বামীজির কথা শুনিবার জন্য ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্বামীজি এই দিবস যেন ইচ্ছা করিয়াই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাভিমানের উপর প্রবল আঘাত করিতেছিলেন, কারণ এই সকল ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম 'জাতি' ব্যতীত আর কিছু নহে এবং দেশাচারই ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। অবশ্য স্বামীজি সকল সময়েই যে আমিষ-ভোজনের পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে।

যাঁহারা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবনযাপনে প্রয়াসী তিনি তাঁহাদের মৎস্যমাংস-ভোজনে তিশয় বিপক্ষে ছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। বেলা চারিটা হইতে সদানন্দ স্বামীর দেখা নাই। স্বামীজি গোবিন্দসাহকে তাঁহার খোঁজ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার আধঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি ও গোবিন্দলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে এক প্রকাণ্ড ঝুড়ি, তাহার মধ্যে লুচি, পুরী, ভাজাভুজি, তরকারি ও মিষ্টান্ন। তিনি নিজের সম্মুখে খাবার তৈয়ার করাইতেছিলেন বলিয়া এত দেরী হইয়াছিল। স্বামীজি যোশীর সহিত কথাবার্ত্তায় এত মগ্ন ছিলেন যে, খাবার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরে তিনি বিনীতভাবে যোশী ও আর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে কম্বলে তাঁহারা বসিয়াছিলেন ঐ কম্বলে বসিয়া স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণের আহার করাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি আছে কিনা। জগৎপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীর এই অমায়িকতা ও বিনয়নম্র বাক্যে তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের কোন অসম্মতি নাই জানাইলেন। স্বামীজি সঙ্গীদিগকে ঝুড়ি হইতে খাবার লইয়া খাইতে বলিলেন, নিজেও অল্পস্বল্প খাইলেন; বেশী খাইলেন না, কারণ তাঁহার চিত্ত তখনও আলোচ্য প্রসঙ্গে নিবিষ্ট ছিল। ষ্টেশন হইতে বিদায়গ্রহণকালে পণ্ডিতজী ও তাঁহার সহচরগণ স্বামীজির দর্শনে আপ্যায়িত হইয়াছেন বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে হিন্দুধর্ম্মের অনেক নূতন কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। যাইবার সময় ভবানীদত্ত তাঁহার পিলিভিতের বাসস্থানে স্বামী শিবানন্দ ও বিরজানন্দকে কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন।

গাড়ীতে উঠিবার সময় একটা ঘটনা ঘটে। ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিলে স্বামীজি ও সদানন্দ স্বামী একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

সে গাড়ীতে একজন ইংরেজ কর্ণেল ছিলেন। তিনি 'নেটিভ'দ্বয়কে ঐ কামরায় উঠিতে দিতে নিতান্ত নারাজ হইলেন। কিন্তু স্বামীজির অভ্যর্থনার জন্য বহু ব্যক্তিকে সমাগত দেখিয়া সেখানে কিছু বলিতে সাহস না পাইয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে চলিয়া গেলেন এবং যাহাতে ঐ 'নেটিভ'দ্বয় ঐ কামরা হইতে অন্যত্র যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে স্বামীজিকে ঐ কামরা ত্যাগ করিয়া আর একটি কামরায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে স্বামীজি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি করে একথা আমায় বলতে সাহস করলে? তোমার লজ্জা হল না!" ষ্টেশন মাষ্টার তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন। কর্ণেল আপন হুকুমমত কার্য সমাধা হইয়াছে মনে করিয়া পুনরায় সেই কামরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, স্বামীজি সশিষ্য তেমনিভাবে সেখানে বসিয়া আছেন। সে ব্যক্তি গাত্রদাহে ছট্ ফট্ করিতে করিতে 'ষ্টেশন মাষ্টার' 'ষ্টেশন মাষ্টার' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া প্লাটফর্ম্মের এধার থেকে ওধার ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার কোথায়? তিনি 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' দেখিয়া চম্পট প্রদান করিয়াছেন। সাহেব মহা খাপ্পা। কিন্তু এ দিকে ট্রেণ ছাড়িবার আর অল্প সময় বাকী আছে দেখিয়া ভাবিলেন আর বিক্রমে কাজ নাই এবং সুবুদ্ধি সহকারে বোঁচকাবুঁচকী লইয়া অপর এক কামরায় প্রবেশ করিলেন। স্বামীজি তাঁহার রকম দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। যিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায় ঐ সাহেবের অপেক্ষা কত শত উচ্চপদস্থ ও জগৎপ্রসিদ্ধ লোকের সহিত একত্রে বন্ধুভাবে বেড়াইয়াছেন, তিনি কি এই নগণ্য, পদমর্য্যাদাগর্ব্বিত, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তির বেয়াদবি সহ্য করিতে পারেন!

২৪শে জানুয়ারী (১৯০১) স্বামীজি বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

গুরুভ্রাতৃগণ ও শিষ্যেরা প্রত্যহই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামীজি অদ্বৈত আশ্রম ও তত্রত্য সন্ন্যাসিগণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং এত শীঘ্র সেখান হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে

মায়াবতী হইতে ফিরিয়া স্বামীজি দেড় মাস মঠে অবস্থান করিলেন। ইতোমধ্যে কয়েকজন নূতন ব্রহ্মচারী মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজি তাঁহাদিগকে দেখিয়া এবং মঠে রীতিমত দৈহিক ব্যায়াম-চর্চ্চা, ধ্যানভজন, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি হইতেছে দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। সামান্য একটু পড়াশুনা, চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া এবং মঠে ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষার তত্ত্বাবধান—ইহা ব্যতীত তিনি কোন কঠিন পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারিতেন না। স্বাস্থ্যলাভের জন্য পুনরায় বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন, এমন সময় ঢাকাবাসীরা তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং স্বামীজি শেষে ঢাকা যাওয়াই স্থির করিলেন। ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইবার আরও একটু কারণ এই ছিল যে, স্বামীজির জননীর বহুদিন হইতে পূর্ব্ববঙ্গে তীর্থসমূহ দর্শন করিবার বাসনা ছিল। এই উপলক্ষে তাহাও পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ স্বামীজি কয়েকজন সন্ন্যাসিশিষ্য সঙ্গে লইয়া ঢাকা যাত্রা করিলেন। পরদিন ষ্টিমার গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিবামাত্র ঢাকা অভ্যর্থনাসমিতির কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাকে মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর অপরাহ্নে ট্রেন ঢাকায় পৌঁছিলে তথাকার বিখ্যাত উকীল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ সমগ্র ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া জমিদার মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। ষ্টেশনে বিস্তর ভদ্রলোক ও স্কুল-

কলেজের ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে মহা আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণদেবকি জয়' ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্বামীজির গাড়ীর সহিত দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। মোহিনী বাবুর বাটীতে স্বামীজির থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে অনেক ভদ্রলোক তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সকলে আনন্দরব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

সম্মুখেই বুধাষ্টমী আগত দেখিয়া স্বামীজি কয়েকদিন পরে ব্রহ্মপুত্রে স্নানের মানস করিয়া সশিষ্য নৌকাযোগে লাঙ্গলবন্ধ যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ববন্দোবস্ত অনুসারে নারায়ণগঞ্জের নিকট তাঁহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্বামীজির কতিপয় সন্ন্যাসী শিষ্যের তত্ত্বাবধানে এখানে উপনীত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতললক্ষা নদীর দৃশ্য বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, ভগবান পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য এখানে দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা পাপক্ষয়ের জন্য স্নান করিতে আসে। এই মেলায় বিস্তর লোকসমাগম হইয়াছিল। যাত্রিগণের নৌকা হইতে অবিরাম আনন্দসূচক হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে—কোথাও বা হরিনামের মধুর ধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে। স্নানান্তে স্বামীজি ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী—তথা হইতে বুড়ীগঙ্গা হইয়া ঢাকা শহরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামীজির নিকট সদাসর্ব্বদাই বহু ভদ্রলোক যাতায়াত করিতেন। বিশেষতঃ অপরাহ্ণে দুই-তিন ঘণ্টা কেবল জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম্ম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ের

আলোচনা হইত এবং প্রায় শতাধিক লোক প্রত্যহ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন।

ঢাকার শিক্ষিতসমাজের অনুরোধে ৩০শে মার্চ্চ তারিখে তিনি জগন্নাথ কলেজে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমি কি শিখিয়াছি?' এই সম্বন্ধে এক ঘণ্টা কাল এক ইংরেজী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বিখ্যাত উকিল রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। পরদিন আবার পগোজ স্কুলের বিস্তৃত খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম্ম' বিষয়ে দুইঘণ্টাকালব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। ইহাও ইংরেজীতে প্রদত্ত হয়। এই উভয় বক্তৃতায় শত শত ঢাকাবাসী মন্ত্রমুগ্ধবৎ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রচারিত বাণীর গূঢ়লক্ষ্য-অনুধাবনে যত্নবান হইয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতায় তিনি যেসকল ব্যক্তি হিন্দুজাতির উন্নতিসাধনের অভিপ্রায়ে সংস্কারের দোহাই দিয়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিপর্য্যয় ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যে দেশের কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন; বলেন—"অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে দুই-এক জন চিন্তাশীল লোকও আছেন, কিন্তু অধিকাংশই অন্ধের ন্যায় হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া অপরের অনুকরণে রত, কি করিতেছেন কিছুই জানেন না, তাহার পরিণাম ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহাও তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহারা ধর্ম্মের ভিতর কেবল বিজাতীয় ভাব চালাইবার পক্ষপাতী, আর পৌত্তলিকতা বলিয়া একটা কথা রচনা করিয়াছেন এবং বলেন হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয় কারণ উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা অনুসন্ধান বা চিন্তা করিবার চেষ্টা করেন না, কেবল ঐ শব্দটির জোরে হিন্দুধর্ম্মকে ভুল বলিয়া আস্ফালন করেন। আবার আর একদল আছেন, যাঁহারা হাঁচি টিকটিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

বাহির করিতে মজবুত। তাঁহাদের মুখে দিনরাত তড়িৎ, চৌম্বকাকর্ষণ, ইথার-কম্পন প্রভৃতি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। হয়ত তাঁহারা ভগবানকেই কোন দিন কতকগুলি কম্পনের সমষ্টি বলিয়া বসিবেন! যাহা হউক, মা ইঁহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করুন। তিনিই প্রকৃতির দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইঁহাদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—যাঁহারা বলেন, আমি তোমার অত শত বুঝি না, বুঝিতে চাহিও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছাড়িয়া, সুখ-দুঃখকে ছাড়িয়া উহার অতীত প্রদেশে যাইতে। যাঁহারা বলেন, বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়; যাঁহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত।...এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছি—

'দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥'

প্রথম চাই মনুষ্যত্ব—এই মনুষ্যজন্মলাভ। তাহার পর চাই মুমুক্ষুত্ব—মোক্ষের জন্য, এই সুখদুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ, সংসারের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য। তাহার পর মহাপুরুষসংশ্রয়—গুরুলাভ। মুমুক্ষুত্ব থাকিলেও কিছু হইবে না—গুরুকরণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব?—'শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ'; তাহার পর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি প্রথমে প্রাচীনকালে এদেশে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, "কিন্তু শুধু প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তখন

যেরূপ ঋষি মুনি ছিলেন আমাদিগকেও তদ্রূপ হইতে হইবে। এই ঋষিত্বে সকলেরই অধিকার। বাৎস্যায়ন বলেন, যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা—তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, আর এই বেদনামধেয় ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশিতেও সর্ব্বসাধারণের অধিকার।

" 'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানী জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥'—শুক্লযজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয় শাখা, ২৬ম অধ্যায়, ২য় মন্ত্র। এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ ত একথা বলিতেছে না। ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে? স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এই সকলগুলিই ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মেলে। না মিলিলে অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি! বেদের চর্চ্চা ত বাঙ্গালাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি সে-ই দিন শীঘ্র দেখিতে চাই, যেদিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রামশিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে, আবালবৃদ্ধ-বনিতা বেদের পূজা করিবে" ইত্যাদি।

স্বামীজির ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন এক বারবনিতা আপাদমস্তক রত্নমণ্ডিতা হইয়া তাহার মাতার সমভিব্যাহারে এক ফিটন গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীজি তখন ভিতরের ঘরে ছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা যতীন বাবু ও স্বামীজির শিষ্যগণ প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজির নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্বীয় সকাশে আনয়ন করিবার

অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে উক্ত বারনারী স্বামীজিকে নিবেদন করিল যে তাহার হাঁপানির পীড়া আছে, ঐ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য সে ঔষধ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। স্বামীজি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্নেহকরুণার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "এই দেখ, মা! আমি নিজেই হাঁপানির যন্ত্রণায় অস্থির, কিছুই করিতে পারিতেছি না। যদি ব্যাধি আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আমার থাকিত তাহা হইলে কি আর এরূপ দশা হয়!" তাঁহার বেদনামাখা কথা কয়টি সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল। স্ত্রীলোক দুইটি ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদগ্রহণান্তে প্রস্থান করিল। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাববন্যায় ঢাকা শহর প্লাবিত করিয়া স্বামীজি মহাপীঠ কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ তীর্থদর্শনে গমন করিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া কয়েক দিনের জন্য গোয়ালপাড়া ও গোহাটিতে বিশ্রাম করিলেন। গৌহাটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার কোনটিই লিপিবদ্ধ হয় নাই।

ঢাকা ও কামাখ্যায় স্বামীজির শরীরের অবস্থা উত্তরোত্তর আরও খারাপ হইল। স্বামীজি গৌহাটিতে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করাতে সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ঐখান হইতে শিলং ৩৬ মাইল এবং সেখানকার জলবায়ুও স্বাস্থ্যকর। সুতরাং শিলং যাওয়াই স্থির হইল। ভারতহিতৈষী সুবিখ্যাত স্যার হেনরী কটন তখন আসামের চীফ কমিশনার। স্বামীজির নাম শুনিয়া তাঁহার অনেক দিন হইতেই তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে স্বামীজি শিলংএ গমন করাতে তাঁহার ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ হইল। তিনি স্বামীজির আবাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী! ইউরোপ আমেরিকায় বেড়িয়ে এই জঙ্গলী জায়গায় কি দেখতে এসেছেন? আর

এখানেই বা আপনার মর্য্যাদা বুঝবে কে?" কটন সাহেবের সহিত স্বামীজির প্রায়ই আলাপ হইত। স্বামীজির অসুখের কথা শুনিয়া এই সদাশয় ব্যক্তি স্থানীয় সিভিল সার্জ্জনকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রত্যহ দুইবেলা তাঁহার সংবাদ লইতেন। স্বামীজিও কটন সাহেবের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন; বলিতেন, "এই একটি লোক যিনি ভারতের অভাব-অভিযোগ ঠিক ঠিক বুঝিয়াছেন এবং প্রকৃতই এদেশের কল্যাণ কামনা করেন।" কটন সাহেবের অনুরোধে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামীজি শিলং-এর ইউরোপীয় অধিবাসিবৃন্দ ও দেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের সমক্ষে একদিন একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সকলেই এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উহাতে ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের অতি সুন্দর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।

কিন্তু শিলং-এর স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতেও স্বামীজির পীড়ার হ্রাস হইল না এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। ঢাকা হইতেই বহুমূত্রের সহিত হাঁপানির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখানে আসিয়া তাহা আরও ভীষণভাব ধারণ করিল। শ্বাসগ্রহণের সময় অসহ্য কষ্ট হইত। কতকগুলি বালিশ একত্র করিয়া বুকের উপর ঠাসিয়া ধরিতেন এবং সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া প্রায় একঘণ্টা পর্য্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। কিন্তু বৈদ্যনাথের ন্যায় এখানেও এই যন্ত্রণার সময়ে তিনি ভগবানে চিত্ত সমাধান করিতেন। একদিন এরূপ অবস্থায় শিষ্যগণ শুনিলেন, তিনি অনুচ্চস্বরে যেন আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "যাক্, মৃত্যুই যদি হয় তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম দেড় হাজার বছরের খোরাক।" অর্থাৎ তাঁহার দেহত্যাগ হইলেও তিনি যে চিন্তারাশি রাখিয়া গেলেন তাহা সম্পূর্ণ জীর্ণ করিতে পৃথিবীর বহু বর্ষ কাটিয়া যাইবে।

মে মাসের মধ্যভাগে স্বামীজি বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ

ও আসামের গল্প প্রায়ই হইত। ঐ দেশের লোক আচারব্যবহার-সম্বন্ধে একটু বেশী সাবধান—এই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন বলিলেন, "ওদেশে আমার খাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বলত—এটা কেন খাবেন? ওর হাতে কেন খাবেন? ইত্যাদি। তাই বলতে হত, আমি ত সন্ন্যাসী ফকির লোক—আমার আবার আচার-বিচার কি? শাস্ত্রেই না বলছে—'চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি'। তবে অবশ্য বাহিরের আচার ভিতরে ধর্ম্মের অনুভূতির জন্য প্রথম প্রথম চাই।" ধর্ম্মভাব-সম্বন্ধে বলিলেন, "ওদেশের অধিবাসীরা ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঐরূপ প্রাচীন প্রথার অনুগামী, সঙ্কীর্ণ-ভাব—উদারতা নেই, কেউ কেউ আবার ধর্ম্মোন্মাদ হয়ে পড়েছে। ঢাকায় মোহিনী বাবুর বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে কার একখানা ফটোগ্রাফ দেখিয়ে আমায় বললে, 'মশাই, বলুন ত ইনি অবতার কিনা।' আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'তা বাবা, আমি কি জানি। তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি শোনে না, ফের ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে। শেষে তার জেদ দেখে আমায় বাধ্য হয়ে বলতে হল—'বাবা, এখন থেকে একটু ভাল করে খেয়ো। তা হলে মাথাটা খুলবে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তোমার মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে গেছে।' একথা শুনে বোধ করি ছেলেটির রাগ হয়েছিল। তা কি করবো, বাবা? ছেলেদের ওরকম একটু-আধটু না বললে তারা যে ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবে।" বাস্তবিক পূর্ব্ববঙ্গে অবতারের আবির্ভাবটা কিছু বেশী—ঘরে ঘরেই অবতার! স্বামীজি ঐরূপ পাগলামির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত মনে করিতেন না; বলিতেন, "গুরুকে শিষ্যেরা অবতার বলতে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণা করতে পারে। কিন্তু তাই বলে দেশশুদ্ধ লোক অবতার হবে এ কি রকম? ভগবানের অবতার যেখানে সেখানে বা যখন তখন হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম তিন-চারটি অবতার বেরিয়েছেন!" কামাখ্যায় তন্ত্রমতের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া

বলিলেন, "এক 'হঙ্কর'দেবের নাম শুনলুম! তিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুনলুম তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ঐ 'হঙ্কর'দেব আর শঙ্করাচার্য্য একই লোক কিনা বুঝতে পারলুম না। তবে লোকগুলিকে দেখে বোধ হল ত্যাগী—সম্ভবতঃ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায়বিশেষ। ঢাকায় কিন্তু বৈষ্ণবের আধিক্য।" মোটের উপর পূর্ব্ববঙ্গের নদনদীপূর্ণ শস্যশ্যামলাঙ্গ ভূভাগ ও সবল সুস্থদেহ নরনারী-দর্শনে স্বামীজির ভালই লাগিয়াছিল। একদিন শরৎ চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমাদের বাঙ্গালাদেশ আপনার কেমন লাগিল?" তদুত্তরে স্বামীজি বলিলেন, "দেশ কিছু মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকে দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্ম্মঠ। তার কারণ বোধ হয় মাছমাংসটা খুব খায়। যা করে খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল চর্ব্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল চর্ব্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে।" তিনি বলিতেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আরও দৃঢ়তর ভ্রাতৃত্ববন্ধন আবশ্যক।

ঢাকায় থাকিতে স্বামীজি একদিন নাগমহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। নাগমহাশয় তখন পরলোকে। ১৮৯৯ সালের শেষভাগেই তিনি দেহরক্ষা করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। স্বামীজি স্বীয় প্রতিশ্রুতিপালনার্থ নাগমহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। শরৎ চক্রবর্ত্তী ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনিলাম, আপনি নাকি নাগমহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন?"

স্বামীজি—হাঁ, অমন মহাপুরুষ, এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখব না? নাগমহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওয়ালেন! বাড়ীখানি কি

মনোরম! যেন শান্তির আশ্রম। ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নেয়েছিলুম। তারপর এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২॥০টা। আমার জীবনে যে কয় দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগমহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে একদিন; তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগমহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগমহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেখলুম। তাঁর সমাধিস্থানটি বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও যেমন হওয়া উচিত তেমন হয় নি। তার কারণ সেই মহাপুরুষকে ওদেশের লোকে এখনও ভাল করে বুঝতে পারে নি। যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে তারাই ধন্য হয়েছে।

বেলুড় মঠে

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার পর স্বামীজির শারীরিক অবস্থা অতিশয় খারাপ হইল। মঠের সন্ন্যাসিগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং স্বামীজিকে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গুরুভাই ও শিষ্যদিগের উপরোধ অগ্রাহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া স্বামীজি একাদিক্রমে সাত মাস মঠে যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিলেন। তাঁহার চিকিৎসা ও সেবার জন্য সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা হইত যেন তিনি কোন গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ না করেন। কিন্তু এই কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ছিল, কারণ প্রায় দেখা যাইত তাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে নিবিষ্ট হইতে না পারিয়া অভ্যাসবশতঃ আপনা আপনি গভীর একাগ্রতা অভিমুখে ধাবিত হইত। অনেক সময়ে শিষ্যেরা তাঁহার আদেশমত তামাক সাজিয়া বা খাবার জল লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেন। কিন্তু তিনি আদিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া সম্পূর্ণ অন্তর্লীন অবস্থায় থাকিতেন। এমনকি 'স্বামীজি, এই নিন, আপনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা আনিয়াছি' বলিয়া ডাকিলেও সাড়া পাওয়া যাইত না। কিন্তু এরূপ অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাদানব্যাপারে তাঁহার কখনও সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য লক্ষিত হয় নাই। মাঝে মাঝে নিজে একটু-আধটু গান গাহিতেন, কখনও বা শিষ্যদিগকেও গাহিতে শিক্ষা দিতেন বা তাঁহার সহিত একত্রে গাহিতে বলিতেন। আর যখন কথাবার্ত্তা বলিতেন বা গল্প করিতেন তখন গুরুভাইগণ হাসি-তামাসার কথা ভিন্ন কিছুতেই অন্য কথা পাড়িতে দিতেন না।

এই সময়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সৎসঙ্গ-পিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শনে ও তন্মুখনিঃসৃত বচনপরম্পরা-শ্রবণমানসে বেলুড় মঠে সমাগত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই নবীন অভ্যাগতগণের তত্ত্ব লইতেন। মঠের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এমনকি ভৃত্যদিগেরও উপর নজর রাখিতেন। তাহারাও প্রত্যেকেই তাঁহার সেবার অধিকারলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিত। নৌকায় করিয়া মঠ হইতে কলিকাতা যাতায়াতকালে দাঁড়িমাঝিরাও তাঁহাকে আপন আপন নৌকায় লইবার জন্য কোলাহল করিত। কখনও কখনও তিনি কেবলমাত্র কৌপীন পরিহিত হইয়া মঠের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন অথবা একটা সুদীর্ঘ আলখাল্লায় দেহ আবৃত করিয়া পল্লীর নিভৃতপথে একাকী বিচরণ করিতেন। অনেক সময়ে গঙ্গার ধারে বা মঠের অভ্যন্তরস্থ কোন বৃহৎ বৃক্ষের স্নিগ্ধ নিবিড় ছায়ায় বসিয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা নিজের গৃহে বসিয়া পুস্তকের পাতা উলটাইতেন বা ছবি দেখিতেন। অনেক সময়ে রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন কিংবা স্বয়ং সখ করিয়া দুই-একটি উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। পাছে তিনি ঐরূপ পরিশ্রমের ফলে তৃষ্ণার্ত্ত হয়েন, এইজন্য গুরুভাই ও শিষ্যেরা নিষেধ করিতেন। কিন্তু সকল সময়ে তিনি নিষেধ অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিতেন না। রোগে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল বটে, কিন্তু মনের তেজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বরং মনে হয় এই সময়ে তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল ধীশক্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম হইয়াছিল। রোগের আক্রমণ সকল সময়ে যে একরূপ থাকিত তাহা নহে—কখনও বাড়িত, কখনও কমিত। যখন কম থাকিত তখন তিনি আবার কর্ম্ম করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইত না।

মঠ ও মঠের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ স্বামীজির অতিশয় প্রিয় ছিল। এখন যেখানে তাঁহার পুণ্যদেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে উহার সম্মুখস্থ বিল্ববৃক্ষমূলে তিনি প্রায়ই ধ্যানমগ্নাবস্থায় উপবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার আর একটি বসিবার জায়গা ছিল ঠাকুরঘরের পার্শ্ববর্ত্তী আম্রবৃক্ষের তল। এখানে প্রাতঃকালে একটি ক্যাম্পখাট পাতিয়া তিনি প্রায় গল্প বা পুস্তকপাঠ করিতেন, অথবা চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

মঠ বাড়ীর দ্বিতলের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের গৃহটি স্বামীজির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই ঘরে তিনি দিবসে উঠাবসা ও রাত্রে শয়ন করিতেন। আহারাদি ঐখানেই নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার বস্ত্রাদি, শয্যা, আসন, চা-দান, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, লিখিবার উপকরণ ও অন্যান্য সমুদায় ব্যবহার্য্য দ্রব্য এখনও ঠিক সেইভাবে সেই কক্ষে সজ্জিত আছে। এখন এই কক্ষে কেহ বাস করেন না। মঠের সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও এখানে ধ্যান করিয়া থাকেন। কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বহু বৎসরের বহু পবিত্রস্মৃতি যুগপৎ দর্শকের মনে উদিত হয়। মনে হয় প্রতি বস্তুতে আজিও সেই মহাত্মার পুণ্যস্পর্শ বিরাজ করিতেছে।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা তাঁহার বরাবর অভ্যাস ছিল। স্বয়ং শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি আর সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিতেন এবং তপস্যাদিতে নিযুক্ত হইতে বলিতেন। তারপর গো-সেবা ও বাগানের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর তরকারী ও ফুলের বাগানের ভার ছিল। তাহার পার্শ্বেই গোচারণের মাঠ। এই বাগানের ও মঠের সাধারণ সীমাবিভাগ লইয়া তিনি বালকের ন্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত কত যে মধুর কলহ করিতেন! একের গরু অপরের বাগানের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই অনধিকার প্রবেশ বলিয়া তুমুল আপত্তি উত্থাপিত হইত। মঠে পাঁউরুটি-নির্ম্মাণের জন্য স্বামীজি বিবিধ প্রকারের খমির লইয়া অনেক পরীক্ষা

করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইলেও চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই। বাস্তবিক তাঁহার উদ্যমশীল প্রকৃতি কোন অভাবনিরাকরণের চেষ্টা হইতেই বিরত থাকিতে পারিত না। মঠে স্বাস্থ্য ভাল না থাকার প্রধান কারণ নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব। স্বামীজি তাহা বুঝিয়া উহা দূরীকরণার্থ বিলাতী প্রণালীতে 'আর্টিজান কূপ' খনন করিবার জন্য যন্ত্রপাতিও আনাইয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত মিস্ত্রীর অভাবে উহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

বাল্যাবধি তিনি জীবজন্তু ভালবাসিতেন। তিনি মঠেও কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর, ছাগল, সারস ও হরিণ পুষিয়াছিলেন। একটা মাদী ছাগলকে 'হংসী' বলিয়া ডাকিতেন এবং তাহারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে 'মটরু' বলিয়া ডাকিতেন এবং আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুঙ্গুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই আদরের মটরু দিনরাত তাঁহার পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামীজি তাহার সঙ্গে পাঁচবছরের বালকের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। যেসকল নবাগত ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গভীর শ্রদ্ধাভরে মঠে আসিতেন তাঁহারা তাঁহার পরিচয় পাইয়া এবং এইরূপ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিতেন, 'ইনি বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' কিছুদিন পরে 'মটরু' মরিয়া যাওয়ায় স্বামীজি বিষণ্ণচিত্তে বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেইটাই যায় মরে।' তিনি নিজে প্রত্যহ এইসকল জন্তুর আহারাদি ও তাহাদের বাসস্থানগুলি পরিষ্কৃত হইয়াছে কিনা দেখিতেন; স্বামী সদানন্দ এই বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন। তাহারাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিত এবং তিনি তাহাদের সহিত এমন নিবিষ্টচিত্তে আলাপ করিতেন যে মনে হইত বুঝি তাহারা জানোয়ার নহে, মানুষ। একবার তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মটরু নিশ্চয়ই আর জন্মে আমার কেউ হোতো।" কখনও কখনও তিনি

হংসীর কাছে গিয়া দুধের জন্য সাধ্যসাধনা করিতেন, যেন দুধ দেওয়া না দেওয়া তাহার ইচ্ছা। বাস্তবিক তিনি এই প্রাণীগুলিকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। ১৯০১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর স্বামীজি আমেরিকার এক শিষ্যকে যে পত্র লিখেন তাহাতেও উহাদের কথা ছিল।

মঠের কুকুরটির নাম ছিল 'বাঘা'। এক হিসাবে বাঘাই ছিল এই সকল প্রাণীদের কর্ত্তা। সে মনে করিত মঠে তাহার থাকার অধিকার আছে। একবার সে কোন অন্যায় কার্য্য করাতে তাহার প্রতি গঙ্গার পরপারে নির্ব্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। ইহাতে সে বড়ই দুঃখিত হয়। বিশেষতঃ স্বামীজিকে সে এত ভালবাসিত যে, সন্ধ্যার সময় আর থাকিতে না পারিয়া একটি খেয়ানৌকার উপর চড়িয়া বসিল। নৌকার মাঝি ও আরোহিগণ তাহাকে তাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সে তাহাতে নিতান্ত অসম্মত হইয়া কটমট চক্ষে তাহাদিগের দিকে চাহিতে লাগিল এবং থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া তাহাকে নৌকায় স্থানদান করিতে বাধ্য হইল। এপারে উপস্থিত হইয়া সে রাত্রিটা এদিক ওদিক লুকাইয়া কাটাইল। ভোর চারিটার সময় স্বামীজি স্নানাগারে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় দরজার নিকট কি একটা পায়ে ঠেকিল, আশ্চর্য্য হইয়া দেখেন বাঘা! বাঘা তাহার পা জড়াইয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে যেন ক্ষমাভিক্ষা ও পুনঃ-প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিতে লাগিল! সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে স্বামীজির নিকট যাইলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সেইজন্য আর কেহ উঠিবার পূর্ব্বে ঠিক যেস্থানে অপেক্ষা করিলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। স্বামীজি তাহার পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন। তাহার পর হইতে সকলকে বলিলেন বাঘা যাহাই করুক উহাকে আর তাড়ান হইবে না।

বাঘার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত মঠে নানাবিধ অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। গ্রহণের সময় শাঁখঘণ্টা বাজিলে সে নাকি শত শত মুক্তিস্নানকামী নরনারীর সহিত একত্রে গঙ্গায় গিয়া ডুব দিত! স্বামীজির দেহত্যাগের অনেক পরে বাঘার মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। জোয়ারের সময় সে দেহ ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সাশ্চর্য্যে দেখিলেন ভাঁটার টানে তাহা আবার মঠে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে মঠের প্রতি বাঘার ভালবাসা স্মরণ করিয়া এবং বোধ হয় মৃত্যুতেও সে মঠের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিতেছে না ভাবিয়া একজন ব্রহ্মচারী মঠের প্রধান প্রধান সন্ন্যাসিগণের অনুমতি লইয়া তাহার দেহকে মঠেই প্রোথিত করিলেন।

মঠে অবস্থানকালে স্বামীজিকে সমাজের কোন ধার ধারিতে হইত না। সুতরাং তিনি যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন—কখনও চটিপায়ে, কখনও খালিপায়ে, কখনও একখানি গেরুয়া পরিয়া, কখনও বা শুধু কৌপীন আঁটিয়া। অনেক সময়ে হাতে হুঁকা বা লাঠি থাকিত। কোট, কামিজ, কোর্ত্তা, কলার—এ সকলের কোন হাঙ্গামা ছিল না, সন্ন্যাসী আপনার শান্ত নির্জ্জন ধামে পূর্ণ স্বাধীনতায় বিরাজিত।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিবার পর তাঁহার পা ফুলিয়া শোথের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, হাঁটিতে কষ্ট হইত। যাঁহারা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা বলেন, এ সময়ে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ এতদূর কোমল ও শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, একটু জোরে হাত পা টিপিলে বেদনা লাগিত; নিদ্রা ত ছিলই না। কিন্তু এত যন্ত্রণা ও দৌর্ব্বল্য সত্ত্বেও তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতার হ্রাস হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই জগজ্জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। কেহ দেখা করিতে আসিলে পূর্ব্ববৎ অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতেন, সুতরাং বাহিরের লোকে বুঝিতেও পারিতেন

না তাঁহার কষ্ট হইতেছে কিনা। তবে বেশী জোরে কথা বলার সামর্থ্য আর ছিল না।

একদিন শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজি, কেমন আছেন?"

স্বামীজি—আর বাবা থাকাথাকি কি? দেহ ত দিনদিন অচল হচ্ছে। বাঙ্গালা দেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে। কাজেকাজেই শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের শারীরিক গঠন একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে যে কটা দিন দেহ আছে তোদের জন্য খাটব; খাটতে খাটতে মরব!

শরৎ বাবু—আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

স্বামীজি—বসে থাকবার জো আছে কি, বাবা! ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, আপনার সুখের দিকে দেখতে দেয় না।

এই বলিয়া পরমহংসদেব কর্তৃক তাঁহার মধ্যে শক্তিসঞ্চারের পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিলেন।

১৯০১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিল। স্বামীজির অসুস্থতা-দর্শনে গুরুভ্রাতৃগণ সকলেই চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সকলেরই ইচ্ছা একজন বিচক্ষণ কবিরাজের হাতে তাঁহার চিকিৎসাভার অর্পিত হয়। কিন্তু স্বামীজি সাধারণ কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ কবিরাজই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপ্রণালী অবগত নহেন; 'কেবল সেকেলে পাঁজি-

পুঁথির দোহাই দিয়া অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া থাকেন'। কিন্তু অবশেষে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কবিরাজ ডাকাইতে হইল। বহুবাজারের সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহানন্দ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিনি আসিয়া প্রথমেই জলপান ও লবণ-সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। দারুণ গ্রীষ্ম—ভয়ানক কষ্ট—তথাপি স্বামীজি নিয়মভঙ্গ করিলেন না। যিনি ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় বার জল পান করিতেন তিনি এক্ষণে কেমন করিয়া জল না খাইয়া থাকিতেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "যখন শুনলুম— এই ঔষধ খেলে জল খেতে পাব না, তখনি দৃঢ় সংকল্প করলুম—জল খাবো না। এখন আর জলের কথা মনেও আসে না।" দৃঢ়চেতা পুরুষের নিকট সকলই সম্ভব। যদিও তিনি বেশ জানিতেন কবিরাজী চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইবে না, তথাপি শুধু গুরুভাইদের সন্তোষার্থ এই কঠোর নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। মাসাবধি কেবল দুধ খাইয়া রহিলেন, আদৌ জল পান করিলেন না। এমন কি মুখ ধুইবার সময়েও একবিন্দু জল গলাধঃকরণ হইত না। কণ্ঠপেশীসমূহ আপনিই রুদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি বলিতেন, "এখন আমি চেষ্টা করলেও আর জল খেতে পারি না। দেহ মনের সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে পড়েছে।" বাস্তবিক শারীরিক দৌর্ব্বল্য এবং স্বাস্থ্যনাশ সত্বেও স্বামীজির ইচ্ছাশক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই। তিনি নিজেও তাহা অনুভব করিয়া বলিতেন, "দেখছি, এখনও যা মনে করি সেটা করতে পারি।" দুইমাস কবিরাজী চিকিৎসার পর শরীরের কতক উপকার হইল। সেপ্টেম্বরে তিনি প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে আলখাল্লা ও কানটুপী পরিয়া একটা মোটা লাঠি হাতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিতেন। সঙ্গে অবশ্য গুরুভাই বা শিষ্যদের কেহ না কেহ থাকিতেন।

এইকালে কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়া স্বামীজির আহার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর নিদ্রাদেবীও তাঁহাকে বহুকাল হইতেই এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি এই অনাহার অনিদ্রার মধ্যে স্বামীজিকে বহুচেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ শ্রমবিরত রাখিতে পারা যায় নাই। কেবলমাত্র অধ্যয়নানুরাগবশতঃ তিনি কিরূপ অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতেন তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়! স্বামিশিষ্য-সংবাদ-প্রণেতা লিখিতেছেন, "কয়েক দিন হইল, মঠে নূতন 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' কেনা হইয়াছে। নূতন ঝক্‌ঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য স্বামীজিকে বলিল, 'এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট'।" শিষ্য তখনও জানে না যে স্বামীজী ঐ বইগুলির দশ খণ্ড ইতোমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামীজি— কি বলছিস? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সব বলে দেব।

শিষ্য অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন?"

স্বামীজি— না পড়লে কি বলছি?

অনন্তর স্বামীজির আদেশ পাইয়া শিষ্য ঐসকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয়সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বামীজি ঐ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম্ম ত বলিলেনই, তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শিষ্য ঐ বৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই-একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামীজির অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, "ইহা মানুষের শক্তি নয়।"

স্বামীজি— দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে

সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিষ্য—আপনি যাহাই বলুন, মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার ফলে এরূপ অমানুষিক শক্তির স্ফুরণ কখনই সম্ভবে না। আরও কিছু চাই।

উত্তরে স্বামীজি আর কিছু বলিলেন না।

অক্টোবর মাসে স্বামীজির ইচ্ছানুসারে মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা হইল। নানা কারণে এই পূজার অনুষ্ঠান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক। বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজি-কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা সর্ব্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষ্য-ভোজ্যাদির বাচ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানাস্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্য্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। চলতি নৌকার আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে এবং এমন কি সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামীজির অমলধবল চরিত্র আলোচনা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। স্বামীজি কখনও কখনও ঐসকল আলোচনা শুনিয়া বলিতেন, 'হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুন্‌কো দুর্ভাব নেহি, যব নিন্দে সংসার'। কখনও বলিতেন, "দেশে কোন নূতন ভাবপ্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীন-পন্থাবলম্বীদিগের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম্মসংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে।" আবার কখনও বলিতেন, "অন্যায় অত্যাচার না হইলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।" সুতরাং তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে স্বামীজি তাঁহার নবভাবপ্রচারের

সহায় বলিয়া মনে করিতেন—কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না—তাঁহার পদাশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, "ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ করে যা, একদিন উহার ফল নিশ্চয়ই ফলবে।" স্বামীজির শ্রীমুখে একথাও সর্ব্বদাই শুনা যাইত, "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" সুখের বিষয় স্বামীজির জীবদ্দশাতেই সাধারণের এই ভ্রান্তি দূর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি তাহাদিগের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মঠে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান এই ভ্রান্তি-নিরসনের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। লোকে দেখিল সামাজিক বিষয়ে স্বামীজি ইষ্টানিষ্ট বিচার করিয়া স্বাধীনতা বা নূতন ভাব অবলম্বন করিতে বলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে তিনি গোঁড়া হিন্দু, প্রাচীন পদ্ধতির একচুল এদিক ওদিক হইলে রক্ষা ছিল না। দুর্গাপূজার কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি শরৎ বাবুকে দিয়া একখানা রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' আনাইয়া ৪।৫ দিনে উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন—দুর্গোৎসব-বিধি প্রকরণটি ভাল করিয়াই পড়িলেন। তখন ঐসম্বন্ধে আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না। শুধু শরৎ বাবুকে বলিলেন, "যদি পারি ত এবার মার পূজা করবো। রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েদ্দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দমম্'—মার ইচ্ছা হয় ত তাও করবো।" পূজার ১০।১২ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পূজাসম্বন্ধে মঠে কোন কথা আলোচনা হয় নাই। ইতোমধ্যে স্বামীজির জনৈক গুরুভ্রাতা একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, মা দশভুজা গঙ্গার উপর দিয়া দক্ষিণেশ্বরের দিক হইতে মঠের দিকে আসিতেছেন। পরদিন প্রাতে হঠাৎ স্বামীজি মঠে পূজা করিবার সঙ্কল্প সকলের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনিও তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং স্থির হইয়া গেল মঠে পূজা হইবে। ঐ দিনই স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে এই বিষয় জানাইয়া তাঁহার নামে পূজার

সঙ্কল্প করিবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র কুমারটুলীতে প্রতিমার বায়না দিয়া মঠে প্রত্যাগত হইলেন। স্বামীজির পূজা করিবার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের গৃহিভক্তগণ সানন্দে উহাতে যোগদান করিলেন।

যে জমিতে এখন ঠাকুরের জন্মোৎসব হয় সেই জমির উত্তর দিকে পূজার মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। ষষ্ঠীর বোধনের দুই-এক দিবস পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল প্রভৃতি মায়ের প্রতিমা লইয়া মঠে পৌঁছিলেন। তাহার পরই মুষলধারে বৃষ্টি।

এদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের যত্নে মঠ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ—পূজোপকরণেরও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই দেখিয়া স্বামীজি স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মঠের দক্ষিণের বাগানবাটী, যাহা পূর্ব্বে নীলাম্বর বাবুর ছিল, এক মাসের জন্য ভাড়া করিয়া তথায় পূজার পূর্ব্বদিন হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনিয়া রাখা হইল। অধিবাসের সান্ধ্যপূজা স্বামীজির সমাধিমন্দিরের সম্মুখস্থ বিল্বমূলে সম্পন্ন হইল। তিনি ঐ বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া পূর্ব্বে একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন—'বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন'—ইত্যাদি তাহা এতদিনে পূর্ণ হইল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল সপ্তমী দিনে পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন। কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রঃকোবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশে সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্ব্বাহিত হইল। কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত ব লিয়া মঠে পশুবলিদান হইল না। বলির অনুকল্পে চিনির নৈবেদ্য ও স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের রাশি প্রতিমার উভয় পার্শ্বে শোভা পাইতে লাগিল।

গরিব দুঃখী কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিতোষ করিয়া ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ব বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দুসন্ন্যাসী।

সে যাহাই হউক, মহাসমারোহে তিনদিনব্যাপী মহোৎসবে মঠ মুখরিত হইল। নহবতের সুললিত তানতরঙ্গ গঙ্গার পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাকঢোলের রুদ্রতানে কলনাদিনী ভাগীরথী নৃত্য করিতে লাগিল। 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্'—কথা ব্যতীত মঠস্থ সন্ন্যাসিগণের মুখে ঐ তিন দিন আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

মহাষ্টমীর পূর্ব্বরাত্রে স্বামীজির জ্বর হইয়াছিল। সেজন্য তিনি পরদিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; কিন্তু সন্ধিক্ষণে উঠিয়া জবা-বিল্বদলে মহামায়ার শ্রীচরণে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নবমী দিন তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব নবমী রাত্রে যেসকল গান গাহিতেন তাহার দুই-একটি স্বয়ং গাহিয়াও ছিলেন। মঠে সে রাত্রে আনন্দের তুফান বহিয়াছিল।

নবমীর দিন পূজাশেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারা যজ্ঞদক্ষিণান্ত করা হইল। যজ্ঞের ফোঁটাধারণ এবং সঙ্কল্পিত পূজা সমাধা করিয়া স্বামীজির মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দশমীর দিন সন্ধ্যান্তে মায়ের প্রতিমা গঙ্গাতে বিসর্জ্জন করা হইল এবং পরদিন শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীও স্বামীজিপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাগবাজারে পূর্ব্বাবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।[১]

১ স্বামিশিষ্যসংবাদ—উত্তর কাণ্ড

ঐ বৎসর দুর্গোৎসবের পর স্বামীজির ইচ্ছানুসারে মঠে প্রতিমা আনাইয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীশ্যামাপূজাও নিষ্পন্ন হয়। শ্যামাপূজার পর স্বামীজি স্বীয় জননীর সহিত একদিন কালীঘাটের মন্দিরে যান। ছেলেবেলায় তাঁহার একবার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হওয়ায় তাঁহার জননী মানত করেন যে, পুত্রের আরোগ্য হইলে তিনি পুত্রকে লইয়া গিয়া মায়ের পূজা দিবেন এবং শ্রীমন্দিরে তাঁহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইবেন। ঐ মানতের কথা এতকাল কাহারও মনে ছিল না। সম্প্রতি শরীর পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার জননীর ইচ্ছানুসারে স্বামীজি তাঁহার সহিত একদিন কালীঘাটে গমন ও কালীগঙ্গায় স্নান করিয়া মাতৃ-আজ্ঞায় সিক্তবস্ত্রে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মার পূজা দেন এবং তাঁহার সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন। তাহার পর মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। তেজঃপূর্ণকান্তি সন্ন্যাসীর যজ্ঞানলে আহুতিপ্রদান দেখিতে সেদিন মায়ের মন্দিরে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। হোমশিখা-প্রদীপ্তবদন স্বামীজিকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মা যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত। স্বামীজি মঠে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম। আমাকে বিলাতফেরত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধা দেন নাই, বরং পরম সমাদরে মন্দিরমধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজা করতে সাহায্য করেছিলেন।"

এইরূপে জীবনের শেষভাগেও স্বামীজি বাহ্য পূজা দ্বারা হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বহু সম্মান ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সুলেখক শরৎ চক্রবর্ত্তী বলেন, "যাহারা তাঁহাকে কেবলমাত্র বেদান্তবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এই পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহাদিগের বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয়। 'আমি শাস্ত্রমর্য্যাদা নষ্ট করিতে আসি নাই—

পূর্ণ করিতে আসিয়াছি'—উক্তিটির সফলতা স্বামীজি ঐরূপে নিজ জীবনে বহুধা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকেশরী শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-নির্ঘোষে ভূলোক কম্পিত করিয়াও যেমন হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই—ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া নানা স্তবস্তুতি রচনা করিয়াছিলেন, স্বামীজিও তদ্রূপ সত্য ও কর্ত্তব্য বুঝিয়াই পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানসকলের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বাগ্মিতায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায়, লোককল্যাণ-কামনায়, সাধনায় ও জিতেন্দ্রিয়তায় স্বামীজির তুল্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ বর্ত্তমান শতাব্দীতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলী ইহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমরা ধন্য ও মুগ্ধ হইয়াছি বলিয়াই এই শঙ্করোপম মহাপুরুষকে বুঝিবার ও তদাদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য জাতি-নির্ব্বিশেষে ভারতের যাবতীয় নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। জ্ঞানে শঙ্কর, সহৃদয়তায় শুকদেব, তর্কে বৃহস্পতি, রূপে কামদেব, সাহসে অর্জ্জুন এবং শাস্ত্রজ্ঞানে ব্যাসতুল্য স্বামীজির সম্পূর্ণতা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীস্বামীজির জীবনই যে বর্ত্তমান যুগে আদর্শরূপে একমাত্র অবলম্বনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সমন্বয়াচার্য্যের সর্ব্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যার তমোনাশী কিরণজালে সসাগরা ধরা আলোকিত হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ! পূর্ব্বাকাশে এই তরুণারুণচ্ছটা দর্শন করিয়া জাগরিত হও, নবজীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভব কর।"

জীবনপ্রান্তে

অক্টোবর মাসে স্বামীজির অবস্থা আবার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তিনি আর গৃহের বাহির হইতে পারেন না, প্রায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার সণ্ডার্সকে দেখান হইল। তিনি আসিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিধ দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিলেন। মঠের সন্ন্যাসীরা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন, এক্ষণে আরও অধিক সতর্ক হইলেন। সকলকেই বলিয়া দেওয়া হইল যেন স্বামীজিকে কোন গভীর চিন্তাসাপেক্ষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ না দেওয়া হয় এবং আগন্তুক ভদ্রলোকগণ যেন অধিকক্ষণ তাঁহাকে বিরক্ত না করেন। স্বামীজির জীবনরক্ষা হইলে ভবিষ্যতে অনেক কথাবার্তা হইবে। স্বামীজি কিন্তু একেবারে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। শরীরে সামর্থ্য ছিল না তাই, নতুবা সে অবস্থাতেও তাঁহার কর্ম্ম করিবার উদ্যম ও ইচ্ছা ষোল আনা ছিল। ঘরে শুইয়া শুইয়াও মঠের ক্ষুদ্রতম গৃহকার্য্যের পর্য্যন্ত সংবাদ লইতেন এবং একটু ভাল বোধ করিলেই স্বহস্তে কোন না কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। চিকিৎসার ফলে রোগ কিঞ্চিৎ কমিলে তিনি ধীরে ধীরে আবার গৃহের বাহিরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কখনও নিড়ান দিয়া মঠের জমির ঘাস তুলিতেন, কখনও ফুল ও ফলের গাছ বা তরকারির বীজ পুঁতিতেন এবং বালকের ন্যায় কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে দিন দিন তাহাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতেন। কখনও বা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানস্থ হইতেন অথবা গম্ভীরকণ্ঠে বেদমন্ত্রসমূহ আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু যখন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইত, তখন নিজের ভগ্ন শরীরের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সময়ে সময়ে স্বামীজির

মনে হতাশভাব উপস্থিত হইত। দেশের অবস্থা স্মরণ করিয়া ক্ষোভে দুঃখে তিনি বিকল হইয়া পড়িতেন। এখন আর নবযৌবনের সে শক্তি সামর্থ্য নাই, দিন দিন শরীর অপটু ও অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার আদর্শানুযায়ী কার্য সম্পাদন করিবার উপযোগী যুবকদলও আশানুরূপ আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে না—এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিত। যাহাদের ভাল আধার বলিয়া মনে হইত, দেখিতেন তাহাদের অনেকেই বিবাহিত, কেহ কেহ বা সংসারের মান যশ ধন-উপার্জ্জনের চেষ্টায় লালায়িত, কাহারও বা শরীর দুর্ব্বল। অবশিষ্ট অনেকেই তাঁহার উচ্চভাবগ্রহণে অসমর্থ। তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্যগণ তাঁহার ভাবগ্রহণে সমর্থ এই কথা অবশ্য তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, অথচ কার্য্য পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য। আর তাহা ছাড়া তাঁহার মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হইত, ভাবিতেন, "হায় হায়! দৈববিড়ম্বনায় শরীরধারণ করিয়াও কোন কাজই করিয়া যাইতে পারিলাম না।" অবশ্য তিনি যে একেবারে হতাশ হইয়াছিলেন তাহা নহে; কারণ, জানিতেন ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে ঐসকল বালকের মধ্য হইতেই কালে মহা মহা ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর বাহির হইয়া তাঁহার ভাব জগতে ছড়াইতে থাকিবে। কিন্তু তিনি চাহিতেন আরও অধিকসংখ্যক শুদ্ধাচার বীর্য্যবান যুবক তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়; বলিতেন, "নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান দশ-বারটি যুবক পাইলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালিয়ে দিতে পারি। চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্ব্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী এমন একদল জোয়ান বাঙ্গালী ছেলে চাই—এরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসা, এরাই আমার ভাবসকল জীবনে পরিণত করে নিজের ও দেশের কল্যাণ-সাধনে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে

ও আসবে ; তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশূন্য, শরীর ক্ষীণ, মন সাহসশূন্য—তাদের দিয়ে কি কাজ হয় !"

এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "এখন কি করা উচিত জানিস্ ? একেবারে ফলকামনাশূন্য হয়ে কাজ করে যেতে হবে। ভাল, মন্দ—লোকে দুই-ই ত বলবে। কিন্তু উচ্চাদর্শ সামনে রেখে আমাদের সিঙ্গির মত কাজ করে যেতে হবে। তাতে 'নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু'—পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দাই করুন আর স্তুতিই করুন।" বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীরের পূজা, অর্চ্চনা ও তাঁহার আদর্শ-অবলম্বনে কার্য্যনির্ব্বাহ করা বর্ত্তমান ভারতের পক্ষে মহা কল্যাণকর বিবেচনায় তিনি বলিয়াছিলেন, "মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখনা, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল ! জীবন-মরণে দৃক্‌পাত নাই—মহা জিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান ! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠিত করতে হবে। ঐরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞাপালন, আর ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা—এই হচ্ছে কৃতী হবার একমাত্র গূঢ় উপায় ; 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব—অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না ! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব-শিবত্ব-লাভে পর্য্যন্ত উপেক্ষা ! শুধু রঘুনাথের আদেশপালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। ঐরূপ একাগ্র নিষ্ঠা হওয়া চাই। খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্ফ করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একে ত এই পেটরোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন ? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোরতমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে ; ঢাক ঢোল কি

দেশে তৈরী হয় না?—তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে?—কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর বোম বোম' শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত করতে হবে। যেসব গীতবাদ্যে মানুষের হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ উদ্দীপিত করে, সেসকল কিছুদিনের জন্ত এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ—দেশের কল্যাণ।" এই বলিয়া তিনি শিষ্য শরৎ চক্রবর্ত্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুই যদি একা ঐ ভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস, তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ করতে শিখবে। কিন্তু দেখিস্ ঐ আদর্শ থেকে কখন যেন এক পা হটিস নি, কখন হীনসাহস হবি নি। খেতে, শুতে, পরতে, গাইতে, বাজাতে, ভোগে, রোগে, কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে ত মহাশক্তির কৃপা হবে।" শরৎ বাবু বলিলেন, "মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহস হইয়া পড়ি!"

স্বামীজি— তখন এইরূপ ভাববি—'আমি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস!' হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে 'আমি বীর্য্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। 'আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী'—এইরূপ অভিমান খুব রাখবি।

এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নাই, তার ভিতর ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিস নি? তিনি বলতেন—"এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।" এইরূপ অভিমান সর্ব্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। তাহলে আর হীন বুদ্ধি, হীন সাহস নিকটে আসবে না। কখনও মনে দুর্ব্বলতা আসতে দিবি নি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখবি সব দুর্ব্বলতা সব কাপুরুষতা তখনি চলে যাবে।

এইরূপ বলিতে বলিতে স্বামীজি নীচে আসিলেন এবং মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের আমগাছতলায় পূর্ব্বোক্ত ক্যাম্পখাটখানিতে বসিয়া পড়িলেন। কখনও তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয়ে যেন মহাবীরের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে! উপবিষ্ট হইয়াই তিনি উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন, "এই যে সব দেখছিস এরাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! এদের উপেক্ষা করে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়—ধিক তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম দেখতে পাচ্ছিস্ না?—এই—এই!"

শরৎ বাবু বলেন, "এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবে স্বামীজি কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে 'চিত্রাপিতারম্ভ ইবাবতস্থে'!—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামীজি 'এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম' বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল; একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। এইরূপে প্রায় পনর মিনিট গত হইলে স্বামীজি প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা।' স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে

যে যাহার কার্য্যে গমন করিল। সেই দিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না। স্বামীজির কৃপা ও শক্তিবলে তাহার চঞ্চল মনও সেই দিন অনুভূতির রাজ্যের অতি সন্নিকটে গমন করিয়াছিল। স্বামীজির সেদিনকার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি সকলের মনগুলি যেন সমাধির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। সেই শুভ দিনের অনুধ্যান করিয়া শিষ্য এখনও আবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার মনে হয়—পূজ্যপাদ আচার্য্যের কৃপায় ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করা তাহার ভাগ্যেও একদিন ঘটিয়াছে।"

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমভিব্যাহারে স্বামীজি বেড়াইতে গমন করিলেন; যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, "দেখলি, আজ কেমন হল! সবাইকে ধ্যানস্থ হতে হল। এরা সব ঠাকুরের সন্তান কিনা, বলবামাত্র এদের তখনি তখনি অনুভূতি হয়ে গেল।"

এই ঘটনায় মনে পড়ে আর একদিনের কথা—যে দিন কাশীপুরের বাগানে পরমহংসদেব ভাবসমাধিমগ্ন অবস্থায় কয়েক জনের বক্ষে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন—'চৈতন্য হউক'। যাঁহার যাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই দেশকাল বিস্মৃত হইয়া এবং বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া সচ্চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। উপরি উক্ত ঘটনা ব্যতীত এই সময়কার আরও দুই-একটি ঘটনা হইতে আমরা স্বামীজির যোগলব্ধ শক্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাই। কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার শিষ্য নির্ভয়ানন্দ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন—১০৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জ্বরের উত্তাপ। মস্তিষ্কের বিকার পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে, অবিরত প্রলাপ বকিতেছেন, আরোগ্যের আশা একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে, সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন। স্বামীজির মুখেও চিন্তার চিহ্ন প্রকটিত। এমন সময়ে তিনি হঠাৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন

এবং ঠাকুরের পূজাদি সমাপন করিয়া তাঁহার ভস্মাবশেষরক্ষিত কৌটাটি গঙ্গাজলে ধুইয়া সেই জল নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে পান করিতে দিলেন। তারপর জ্বর আর একটু বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ একেবারে কমিয়া গেল। স্বামীজি গুরুভাই ও অন্যান্য শিষ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "দেখ্, ঠাকুরের শক্তি দেখ্। তিনি কী না করতে পারেন!"

উপরি উক্ত কৌটাটিকে স্বামীজি অনেক সময় 'আত্মারামের কৌটা' বলিতেন। প্রত্যহ স্নানান্তে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের চরণামৃত-পান, তাঁহার শ্রীপাদুকা মস্তকে ধারণ ও এই কৌটার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। এত শ্রদ্ধাভক্তি সত্ত্বেও একদিন তাঁহার স্বাভাবিক পরীক্ষাপ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ঐ কৌটা মস্তকে স্পর্শ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিতেছেন এমন সময়ে মনে হইল, "সত্যই কি ইহাতে আত্মারাম ঠাকুরের আবেশ রহিয়াছে? আচ্ছা, দেখি প্রার্থনা করিয়া।" এই বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, 'ঠাকুর, তুমি যদি সত্যসত্যই ইহার মধ্যে থাক তবে তিন দিনের মধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজাকে মঠে আকর্ষণ করিয়া আন।' মহারাজা তখন কলিকাতায় আছেন। তিনি জানিতেন যে গোয়ালিয়রের মহারাজার ওখানে আসা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার, সেইজন্য ঐ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নিজে মনে মনে এই সকল বলিলেও মঠের অপর কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। এমন কি কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেও এই কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন। পরদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হয়। অপরাহ্ণে মঠে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন গোয়ালিয়রের মহারাজা মঠের নিকটবর্ত্তী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া যাইতে যাইতে গাড়ী থামাইয়া স্বামীজি মঠে আছেন কিনা খবর লইবার জন্য আপন ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজি মঠে উপস্থিত না থাকাতে দুঃখিতান্তঃকরণে

ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কথা শ্রবণমাত্র স্বামীজির পূর্ব্বদিনের কথা মনে হইল এবং তিনি দ্রুতপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশপূর্ব্বক উক্ত কৌটাটি মাথায় ঠেকাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তুমি সত্যি', 'তুমি সত্যি', 'তুমি সত্যি।' স্বামী প্রেমানন্দ সেই সময়ে ধ্যান করিবার জন্য ঠাকুরঘরে গিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজির কাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাহার পর স্বামীজির মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। স্বামীজি সেই দিন হইতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মঠের সকলকে বিশেষ সন্তর্পণে উক্ত কৌটার পূজা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হওয়ায় ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বামীজির সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রত্যহ দলে দলে বেলুড় মঠে গমন করিতেন। স্বামীজি তাঁহাদিগের সহিত ইংরেজীর পরিবর্ত্তে হিন্দীতে আলাপ করিতেন, তাহাতে আলোচ্য বিষয়টি সকলেরই মনে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া যাইত। একদিন মঠের প্রকাণ্ড ময়দানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া একটি বিষয়সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহ ও আবেগভরে কথাবার্ত্তা কহিলেন। ঐ বিষয়টির প্রতি তাঁহার বরাবরই অতিশয় অনুরাগ ছিল। এই সকল সাক্ষাতের উল্লেখ করিয়া লক্ষ্ণৌএর 'য়্যাডভোকেট' পত্র লিখিয়াছে—"গত কংগ্রেসের সময়ে তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। সেই দেখাই শেষ দেখা। তিনি উৎসাহপ্রদীপ্ত বদনে হিন্দীতে অনর্গল আমাদিগের সহিত ভারতের উন্নতিসাধন-বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলেন। সে হিন্দী এরূপ বিশুদ্ধ ও শিষ্টজনসম্মত যে কোন উত্তর-পশ্চিমবাসীর পক্ষেও তাহা গৌরবের কারণ হইত।"

কংগ্রেসের এই সকল বিশিষ্ট নেতৃগণের সহিত স্বামীজির যে যে বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল তন্মধ্যে বেদবিদ্যালয়-সংস্থাপন অন্যতম। সংস্কৃতবিদ্যা এবং প্রাচীন আর্য্যদিগের চিন্তা ও সাধনার মহাফলসমূহ রক্ষা ও তৎসমূহে সম্যক শিক্ষিত আচার্য্যসৃজন—ইহাই ঐ বিদ্যালয়স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ এই প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য ও পরিশ্রম করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

বেদ-অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পুনঃপ্রচলন-বিষয়ে স্বামীজির এরূপ প্রবল আগ্রহ ছিল এবং উহার অত্যাবশ্যকতা তিনি এতদূর অনুভব করিতেন যে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্তও গুরুভাইদিগের সহিত উহার আলোচনা করিয়াছিলেন। এমন কি একজন উপযুক্ত পণ্ডিত রাখিয়া মঠে ছোটখাট ভাবে ঐ কার্য্য আরম্ভের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকে 'উদ্বোধন প্রেস' বিক্রয় করিতে বলিয়া দেন। শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে ঐ বিষয় লইয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন ভাবিয়া উক্ত অর্থ পৃথকভাবে জমাও রাখা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অল্পদিন পরেই তিনি স্বস্বরূপ সংবরণ করায় সঙ্কল্পিত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় নাই।

১৯০১ সালের ঠিক শেষভাগে জাপান হইতে দুইজন কৃতবিদ্য ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মঠে আগমন করেন। অদূরভবিষ্যতে জাপানে একটি ধর্ম্মমহাসভা-আহ্বানের সম্ভাবনা হওয়ায় তাঁহাকে ঐ সভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করাই তাঁহাদিগের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহারা স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আপনার ন্যায় জগৎপূজ্য ব্যক্তি যদি এই মহাসভায় যোগদান করেন তবেই ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা হইবে। আপনাকে সেখানে গিয়া আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহদান করিতেই

হইবে। এখন জাপানে ধর্ম্মের জাগরণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আপনি ভিন্ন এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না যিনি সেই প্রয়োজনসিদ্ধিবিষয়ে আমাদিগকে সহায়তা করিতে পারেন।" যিনি অগ্রগামী হইয়া স্বামীজিকে এই কথাগুলি বলিলেন তাঁহার নাম আচার্য্যপাদ ওডা—তিনি জাপানের এক বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ। স্বামীজি তাঁহার ও তাঁহার সহচর মিষ্টার ওকাকুরার অপকট আগ্রহ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সোৎসাহে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। আর তাঁহার স্বীয় ব্যাধি বা তজ্জনিত ক্লেশের কথা মনে নাই! বর্ত্তমান জগতের একটি উদীয়মান ও উন্নতিপ্রয়াসী মহাজাতির ধর্ম্মকামনা চরিতার্থ করিবার জন্য অপরিমিত মানসিক উৎসাহ যেন তাঁহার রুগ্ন শরীরকেও বলীয়ান্ করিয়া তুলিল। তিনি অভ্যাগতদ্বয়ের সহিত শ্রীবুদ্ধের মানবহিতায় মহান্ আত্মত্যাগের কাহিনী এবং তৎপ্রচারিত শিক্ষাসমূহের দার্শনিক তত্ত্ব এরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও সূক্ষ্ম মীমাংসার সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তাঁহারা যে কয় দিন মঠে অতিবাহিত করিলেন সে কয় দিন পরম সুখেই কাটিল। তাঁহাদের সহিত 'হোরি' বলিয়া একটি বালক ভৃত্য আসিয়াছিল। সে স্বামীজিকে বড় ভক্তি করিত এবং ভালবাসিত। স্বামীজিও তাহাকে স্নেহ করিতেন এবং বালকের ন্যায় তাহার সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিতেন। কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এই বালকের মৃত্যু হয়। স্বামীজি সেই সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন মঠে যাপন করিবার পর মিঃ ওকাকুরা স্বামীজিকে তাঁহার সহিত বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে স্বামীজি ৺কাশীধামযাত্রার অভিলাষ ব্যক্ত করাতে সেখানে তাঁহার গোপাললাল ভিলায় থাকিবার বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইয়াছিল। সুতরাং তিনি উক্ত জাপানী ভদ্রলোকটির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্থির

করিলেন, প্রথমে বুদ্ধগয়ায় ও পরে বারাণসীতে গমন করিবেন। এই তাঁহার শেষ ভ্রমণ।

স্বামীজি বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলে সেখানকার মোহন্ত মহারাজ তাঁহাকে সযত্নে নিজগৃহে স্থান দান করিলেন। বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের নাম তিনি বহু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যে কখনও অতিথিরূপে নিজগৃহে পাইবেন ইহা কল্পনাও করেন নাই। যাহা হউক, স্বামীজির উপস্থিতিতে তিনি যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইয়া যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তাহার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেই স্থানের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু ব্যক্তি এই সুযোগে স্বামীজিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মোহন্তজীর মঠে প্রত্যহ আগমন করিতে লাগিল। স্বামীজি বুদ্ধগয়া ও তন্নিকটস্থ সমুদয় প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়া বৌদ্ধযুগের সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিলেন এবং একদিন ভগবান শ্রীবুদ্ধের পবিত্র সাধনপীঠ বোধিদ্রুমমূলে গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। সেই একদিন আর এই একদিন! জীবনের প্রথম প্রভাতালোকে আবেগোন্মত্ত হৃদয়ে সমাধিকামী তরুণ সাধকের সেই একদিন এইখানে বসিয়া তথাগতের চরণালিঙ্গন-প্রয়াস, আর আজিকার এই জীবনের ঘনসন্ধ্যাচ্ছায়ায় সর্ব্বাকাঙ্ক্ষানিঃশেষিত, সর্ব্বকামনাবিনিবৃত্ত, শান্ত, অচঞ্চল, বিক্ষোভহীন, ধীর, স্থির, সমাহিত হৃদয়ে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি! কি উদ্দেশ্যে এই গভীর ধ্যান কে বলিবে? আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও স্থূলদৃষ্টি লইয়া সেই সীমাহীন অতলস্পর্শ সমুদ্রের পরিমাপ করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া কি করিব?

তাহার পর বারাণসীতে। এখান হইতে মিঃ ওকাকুরা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বামীজি বলিলেন, শরীর ভাল থাকিলে কবে তিনি জাপান যাত্রা করিবেন তাহা পরে ঠিক করিয়া জানাইবেন।

বারাণসীতে স্বামীজির সহিত প্রত্যহ বহু পণ্ডিত পাণ্ডা, মোহন্ত এবং গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হইত। ইঁহারা তাঁহাকে 'কালাপানি'পারাগত ও ম্লেচ্ছসংস্পৃষ্ট জানিয়াও যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন, এমনকি কেদারনাথের মোহন্তজী তাঁহাকে আরতি পর্য্যন্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। এখানে ভিঙ্গার মহারাজা তাঁহাকে একটি মঠ স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অর্থসাহায্য ও অন্যবিধ সহায়তা করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। স্বামীজি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পরে স্বামী শিবানন্দ ও একজন শিষ্যকে ঐ উদ্দেশ্যে এখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাশীতে অবস্থানকলে স্বামীজি প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্ণে নৌকায় করিয়া নদীবক্ষে বিচরণ করিতেন এবং শরীর ভাল থাকিলে কোন কোন দিন নদীতে স্নান করিয়া ৺বিশ্বেশ্বর-দর্শনেও গমন করিতেন। কিন্তু এখানে থাকিয়াও তাঁহাকে মিশনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের সংবাদ রাখিতে হইত। বেলুড় মঠ হইতে চতুর্দ্দিককার চিঠির গাদা প্রত্যহ এখানে প্রেরিত হইত। সেই সকল চিঠির জবাব লিখিতেও বহু সময় লাগিত। অনেক চিঠিতে আবার সমাজ, দর্শন ও ঐতিহাসিক জটিল সমস্যাদির মীমাংসা করিতে হইত।

স্বামীজির উপদেশপ্রভাবে কতিপয় বঙ্গীয় যুবক মিলিত হইয়া অনাথ-আতুরদিগের সেবার জন্য কাশীতে একটি সমিতি গঠন করিল। এই সমিতি বহু কষ্টে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া লইল এবং শহরের পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে অসহায় ও রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেখিতে পাইলেই সযত্নে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া আনিয়া সেবাশুশ্রূষা, পথ্য ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে বেলুড় মঠে থাকিতে তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা-অবলম্বনে কেহ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে না বলিয়া স্বামীজি মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিতেন। কিন্তু আজ এই দৃশ্যদর্শনে তাঁহার সে দুঃখ দূর হইল। তিনি যুবকদিগের এই

শুভ সংকল্প ও সাধু অনুষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহাদের উদ্যম, উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগদর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাদের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ বলিলেন, "বৎসগণ, এই হইতেছে প্রকৃত মানবধর্ম্ম, তোমরা এতদিনে ঠিক পথ চিনিতে পারিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি ভগবান তোমাদের সহায় হউন এবং তোমাদিগের কর্ম্ম উত্তরোত্তর অধিক সফলতা লাভ করুক। সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এই কর্ম্ম করিয়া যাও। অর্থের জন্য চিন্তিত হইও না; অর্থ আসিবেই আসিবে এবং কালে এই জিনিসটি এত বড় হইয়া দাঁড়াইবে যে তোমরা তাহা এখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পার না।" সাধারণের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য তিনি বালকদিগকে একটি আবেদনপত্রও লিখিয়া দিলেন। এই ভাবে কাশীধামে সুপ্রসিদ্ধ 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের' ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন এই আশ্রমের নাম ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং ইহার কার্য্যকলাপ ভারতীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের আদর্শস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত। ইহার পর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেবাপ্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে আজকাল প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পার্শ্বেই ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, মহাত্মা গোখেলের 'ভারত-সেবকসম্প্রদায়' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সেবাপরায়ণ যুবকদলকে দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও রোগ, মৃত্যু, মহামারী, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সহিত অটল অধ্যবসায় ও বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। ধন্য স্বামীজি, দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় যাঁহার কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে এই শুভ সংকল্প প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল!

কিন্তু এইসকল ত্যাগব্রত সন্ন্যাসী স্বামীজির নিকট শুধু যে উপদেশ

পাইয়াই এই দুরূহ 'দরিদ্রনারায়ণ'-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা স্বামীজির জীবনে অহরহ এই সেবার ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরের ব্যথায় বিগলিতচিত্ত হইয়া, পরের অশ্রুতে নিজের অশ্রু মিশাইয়া বড় যত্নে বড় সহানুভূতিতে পরম সন্তর্পণে ব্যথিতের বেদনা-পরিপ্লুত হৃদয়ক্ষতে শান্তির প্রলেপ লেপন করিতে দেখিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনের পর এইরূপ একদিনকার ঘটনা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক তাহাতেই ইহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাইবেন। শরৎ বাবু বলিতেছেন—"মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতিবর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজি তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন! একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামীজি তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িলেন যে, স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঐসকল ব্যক্তির আগমন-সংবাদ দিলে বলিলেন—"আমি এখন দেখা করিতে পারব না, এদের নিয়ে বেশ আছি।" বাস্তবিকই সেদিন স্বামীজি ঐসকল দীনদুঃখী সাঁওতালদিগের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেষ্টা'। স্বামীজি কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখন কখন স্বামীজিকে বলিত—"ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিস না—তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর বুড়োবাবা এসে বকে।" কথা শুনিয়া স্বামীজির চোখ ছল ছল করিত, এবং

"না না, বুড়োবাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকবে না; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল"—ইহা বলিয়া তাহাদের সাংসারিক সুখদুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামীজি কেষ্টাকে বলিলেন, "ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?" কেষ্টা বলিল, "আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ।" স্বামীজি বলিলেন, "নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবো। তা হলে ত খাবি?" কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামীজির আদেশে মঠে সেইসকল সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি জোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, "হাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিসটি কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কখনো খাই নি।" স্বামীজি তাহাদিগকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, "তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হলো।" স্বামীজি যে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, "এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখি নি!" অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? 'পরহিতায়' সর্ব্বস্ব-অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল্ জিনিস কখনও কিছু ভোগ হয় নি! ইচ্ছা হয় মঠ ফঠ সব বিক্রী করে দিই, এইসব গরিব দুঃখী দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে দিই। আমরা ত গাছতলা সার

করেছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পারছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম—মাকে কত বল্লুম, 'মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্বচূষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে মা, তাদের কোন উপায় হবে না?' ওদেশে ধর্ম্মপ্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে এ দেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

"দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখবাজানো, ঘণ্টানাড়া; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়ি পাঁতি যোগাড় করে নিয়ে আসি এবং দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

"আহা, দেশে গরিবদুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর মুদ্দফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব উঠে— হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখেদুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখ না— হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মান্দ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিস নি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। দিনরাত কেবল তাদের বলছি— 'ছুঁসনে, ছুঁসনে'। দেশে কি আর দয়া ধর্ম্ম আছেরে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝেঁটা—মার লাথি! ইচ্ছে হয়, তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস' বলে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা

এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা করতে পারলুম না, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম, একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্যমাত্র। সর্ব্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোনও দেশ কোন কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জানবি।"

কাশীধাম হইতে প্রচুর আনন্দলাভ করিয়া স্বামীজি বেলুড় মঠে ফিরিলেন। পুণ্যক্ষেত্র কাশীর অগণন ঘাট, মঠ, মন্দির, অন্নছত্র ও সহস্র সহস্র ধর্ম্মনিরত নরনারী হিন্দুধর্ম্মের অক্ষয় বিজয়স্তম্ভ। স্বামীজি এখানে দিবারাত্র আপন অন্তরভাবের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেন—এই যেন তাঁর আপন ধাম*—এই আনন্দভবনে বাস করিয়া তিনি দেহের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, নিরন্তর আত্মানন্দে বিরাজ করিতেন। ইহার ফলে শ্বাসকষ্টাদি রোগযাতনারও কতকটা উপশম হইয়াছিল; কিন্তু বেলুড়ে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইল; সম্মুখেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব। কিন্তু স্বামীজি আর গৃহের বাহির হইতে পারেন না—একেবারে শয্যাগত। পা খুব ফুলিয়া পড়িয়াছে এবং সর্ব্বশরীরে জলসঞ্চার

* স্বামীজির জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিয়াছিলেন যেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আকাশের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে কলিকাতার উত্তরভাগে সিমলা পল্লীর দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'এইবার যে আমার কাজ করবে সে এল'; এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কোন শহরের সহিত তাঁহার আগমনের সম্বন্ধ আছে এইরূপ আভাস দিয়াছিলেন। কে বলিবে সেই শহর কাশীধাম কি না।

হইয়াছে। হাঁটিবার সামর্থ্য মোটেই নাই। সকলেই বুঝিলেন এবার অবস্থা শঙ্কাজনক, সুতরাং উৎসবের সময় কাহারও মুখে আনন্দের চিহ্ন নাই—একটা গভীর নৈরাশ্য ও নিরানন্দের ভাব যেন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। উৎসব উপলক্ষে বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। অনেকেই স্বামীজির দর্শনলাভ ও চরণামৃত পান করিয়া ধন্য হইবেন এই আশায় আসিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। স্বামীজি প্রাতঃকাল হইতেই কয়েকবার সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্র বুঝিলেন দুই-চার জনের সহিত কথা বলিতেই যখন ক্লান্তিবোধ হইতেছে, তখন অধিক লোকের সহিত আলাপ করা বিশেষ কষ্টকর হইবে। সেইজন্য তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বীয় গৃহদ্বারের বহির্ভাগে বসাইয়া রাখিলেন যেন কেহ ভিতরে না যায়। কেবল শিষ্য শরচ্চন্দ্র স্বামীজির নিকট বসিয়া শুষ্কম্লানমুখে ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে-ছিলেন—স্বামীজির অবস্থাদর্শনে তাঁহার যেন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। স্বামীজি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কি ভাবছিস্? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভিতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে পেরে থাকি, তাহলেই জানব দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে। সর্ব্বদা মনে রাখিস ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নাই।" তাহার পর কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "দেখ, আমার মনে হয়, ঠাকুরের উৎসব এই রকম ভাবে একদিন না হয়ে চার পাঁচ দিন ধরে হলে যেন ভাল হয়। প্রথম দিন—হয়ত শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা চলল। দ্বিতীয় দিন—বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হল। তৃতীয় দিন—হয়ত প্রশ্নোত্তর হল। তারপর দিন—চাই কি বক্তৃতা হল, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁর আদর্শ ও ভাব সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া

হল। শেষ দিনে—এখন যেমন মহোৎসব হয় তেমনি হল, অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন, পূজা, প্রসাদবিতরণ, এইসব। অবশ্য এ রকম হলে শেষ দিন বই অন্য দিনে ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ছাড়া আর কেউ বেশী আসবে তা বোধ হয় না। তা নাই বা এল। অনেক লোকের গুলতোন করা কিংবা গানবাজনা চীৎকার করে একটা ক্ষণিক উত্তেজনা সৃষ্টি করাই ত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাতে ঠাকুরকে লোকে চিনতে ও বুঝতে পারে এবং তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে জীবন সার্থক করতে পারে এটাই হল আসল লক্ষ্য।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকটি সঙ্কীর্ত্তনের দল মঠে আগমন করায় স্বামীজি তাহাদিগকে দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যকার জানালার রেলিং-এ ভর দিয়া দাঁড়াইলেন এবং মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ও ইতস্ততঃ সমবেত অগণ্য ভক্তমণ্ডলীর প্রতি নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। একটু পরেই বসিয়া পড়িলেন। দাঁড়াইয়া কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া শরৎ চক্রবর্ত্তী ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাহার পর শরৎ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। শরৎ বাবু বলিলেন, "আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলি কাটিয়া দেন তবেই উপায়; নতুবা এই দাসের উপায়ান্তর নাই। আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই। স্বামীজি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? যখন এখানে এসে পড়েছিস তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে।" কিন্তু শরৎ বাবুর বোধ হয় মনে হইতেছিল আর অধিক দিন স্বামীজির দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটিবে না, তাই তিনি অধীর হইয়া স্বামীজির পাদপদ্ম ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এবার আমায় উদ্ধার করিতেই হইবে।" স্বামীজি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, কে কার উদ্ধার করতে পারে বল? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারেন। ঐ আবরণগুলো গেলেই আত্মা আপনার গৌরবে

আপনি জ্যোতিষ্মান্ হয়ে সূর্য্যের মত প্রকাশ পায়।” শরৎ বাবু তথাপি বলিলেন, তবে শাস্ত্রে কৃপার কথা শুনতে পাই কেন? তদুত্তরে স্বামীজি মহাপুরুষদিগের কৃপার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলিলেন, “কৃপা মানে কি জানিস! যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভিতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে কেন্দ্র করে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ব্যাসার্দ্ধ লয়ে যে একটা বৃত্ত হয়, সেই বৃত্তের ভিতর যারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং সাধন-ভজন না করেও তারা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কৃপা বলিস ত বল।” শরৎ বাবু নাছোড়বান্দা, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ ছাড়া আর কোনরূপ কৃপা কি নাই?” স্বামীজি বলিলেন, “তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত মুমুক্ষু পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীরধারণ করে আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে একজন্মে মুক্ত করে দেওয়া, কেবলমাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কৃপা, বুঝলি?” তবে যাঁহাদের অদৃষ্টে অবতারের দর্শন বা সঙ্গলাভ ঘটে না তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিলেন, তাঁদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়—ঠিক এমনি আমাদের মত শরীরে দেখতে পায় ও তাঁর কৃপা হয়।”

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সংবাদ দিলেন, ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর কয়েকটি ইংরেজ মহিলা তাঁহার দর্শনার্থ দ্বারে দণ্ডায়মানা। স্বামীজি আলখাল্লা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া সভ্যভব্যের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শরৎ বাবু দ্বার খুলিয়া দিলে নিবেদিতা ও অপর ইংরেজ মহিলারা প্রবেশ করিয়া স্বামীজির ন্যায় মেজেতেই বসিলেন এবং তাঁহার দৈহিক কুশল-

প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও সামান্য দুই-চারি কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন। স্বামীজি বলিলেন, "দেখেছিস, এরা কেমন সভ্যতা জানে! শরীরের অবস্থা দেখে বুঝলে বেশী বিরক্ত করা ভাল নয়, অমনি চলে গেল। বাঙ্গালী হলে আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।"

বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময় চতুর্দ্দিকে উৎসব-কোলাহলের মহাশব্দ শুনা যাইতে লাগিল। মঠের জমির কোথাও তিলধারণের স্থান নাই। কীর্ত্তনের রোলে গগন প্লাবিত। প্রসাদবিতরণেরও বিশ্রাম নাই, অবিরত চলিতেছে—প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সমাগত। স্বামীজি দশ মিনিটের জন্য শরৎ বাবুকে নীচে গিয়া উৎসব দেখিবার অবকাশ প্রদান করিলেন। অপরাহ্ণে ভিড় ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। স্বামীজির ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

এইভাবে ১৯০২ সালের মার্চ্চ মাস অতীত হইল। ইহার পর স্বামীজি আর তিন মাস কাল মাত্র দেহধারণ করিয়া ছিলেন। শারীরিক কষ্ট এবং অবসাদ সত্ত্বেও স্বামীজি নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। যখন তাঁহার মনে কোন কর্ম্মসম্পাদনের ইচ্ছা উদিত হইত, তখন পীড়া বা যন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এমনকি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও মঠের বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যাপন বা সমস্যাসমাধানসভাতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মচারিগণকে উৎসাহিত এবং কার্য্যপরিচালনে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেক সময় ধ্যানের প্রণালী ও সাধনপ্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা করিতেন এবং কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত নিজের লেখাপড়া, হিন্দু দর্শন বা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় কথা উদ্ধৃত করিয়া রাখা, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া এবং সাধারণের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা আলাপাদিতেও বহু সময় অতিবাহিত হইত। সময়ে সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য গান গাহিতেন

বা গুরুভ্রাতাদিগের সহিত হাস্যপরিহাস করিতেন। ইহাতে অনেক সময় গুরুভ্রাতাদিগের বিষণ্ণ ভাব দূর হইয়া যাইত। তাঁহারা মনে করিতেন স্বামীজি বুঝি ভাল আছেন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। স্বামীজি তাঁহাদিগের মুখে প্রসন্নতা আনয়নের জন্যই ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ রঙ্গকৌতুক ও স্বচ্ছন্দতার ভান করিতেন; আবার অনেক সময় হঠাৎ কথাবার্ত্তার মধ্যে ক্লান্তিবশতঃ নীরব হইয়া যাইতেন—চোখে মুখে যেন একটা তন্দ্রার ভাব আসিয়া পড়িত, কি যেন একদৃষ্টে দেখিতেছেন, মনে হইত তাঁহার মন সম্মুখস্থ বিষয় ত্যাগ করিয়া কোন দূর দেশে ভ্রমণ করিতেছে। অমনি সকলে বুঝিতেন তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেন।

অনেক সময় স্বামীজির পরিশ্রম হইবে এই আশঙ্কায় গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার দর্শনপ্রার্থী বহু তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিকে বিদায় করিয়া দেন শুনিয়া তিনি একদিন দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আরে দেখ্, এ শরীরে আর কি প্রয়োজন? পরের কল্যাণের জন্যই এ দেহপাত হউক। ঠাকুরকে দেখিস্‌নি, শেষদিন পর্য্যন্তও লোককল্যাণের জন্য শিক্ষা দিয়ে গেছেন? আমারও কি উচিত নয় তাই করা? আর এ দেহ গেলেই বা কি আসে যায়? এ তো অতি তুচ্ছ পদার্থ, যদি দেশের লোকের হৃদয়নিহিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য শত শত বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই।" ধন্য গুরুভক্তি! ধন্য গুরু-আদর্শের প্রতি অনুরক্তি, ধন্য দেশপ্রেম!

শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য তৎপর ছিলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের মনে আত্মবিশ্বাস, নূতন কর্ম্ম আরম্ভ করিবার শক্তি, সাহস এবং দায়িত্ববোধের সহিত গুরুলঘু-বিচারক্ষমতা জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে

পারে। 'উদ্বোধন'-পত্রের তৎকালীন পরিচালক একটি অতি সামান্য বিষয়ের জন্য তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিতে আসেন এবং তজ্জন্য ভৎর্সিত হন। ব্যাপার এই, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং স্বামীজির শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উভয়েই 'উদ্বোধনে'র জন্য গীতার যে বঙ্গানুবাদ লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন্‌টি প্রকাশিত হইবে। স্বামীজি বলিলেন, "এটা এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে তার মীমাংসার জন্য তোদের এখানে ছুটে আসার দরকার ছিল। একটু বুদ্ধি বিবেচনা খরচ যদি না করতে পারিস, তবে তোরা কি করে কাজ চালাবি? এই দেখ্ দিকি, নিবেদিতা কেমন নিজের মাথা খাটিয়ে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যাচ্ছে—আমাকে একবারও বিরক্ত করে না।" অবশ্য তাহার পর তিনি তর্কভূষণ মহাশয়ের অনুবাদই প্রকাশ করিতে বলিয়া দেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তর্কভূষণ মহাশয়কে প্রথমকার অনুবাদ পুনরায় লিখিতে হইয়াছিল। কারণ তিনি তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন, "এ দেশের পণ্ডিতরা শ্লোকের ঠিক শব্দগত অনুবাদ করতে জানেন না।" উপরি উক্ত ঘটনার পর পত্রিকা-পরিচালকগণ ভয়ে আর অনেকদিন স্বামীজির কাছে ঘেঁষেন নাই। কেবল একবার একটা গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। স্বামীজি এইবারও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখেন, কারণ বিষয়টি বিশেষ গুরুতর এবং তৎসম্বন্ধে অনেক গোপনীয় কথাবার্ত্তা ছিল। এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য দেখা না করিয়া পত্র লেখায় এবং পূর্ব্বোক্ত সামান্য বিষয় লইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসায় স্বামীজি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামীজি মিশন হইতে প্রকাশিত পত্রিকাদির মতামত ও প্রবন্ধসমূহের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সর্ব্বদা দেখিতেন যেন তাহাতে তাঁহার প্রচারিত মতের

কোন বিরুদ্ধ কথা না লিখিত হয়। একবার কোন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ব্যক্তি কর্তৃক উহাতে এক সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, স্বামীজি তাহাতে বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিলেন। আর একবার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষে একটি সুবৃহৎ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল ও শোকপ্রকাশের অন্যান্য উপকরণের কিছু আধিক্য ছিল। স্বামিজী তাহা পাঠ করিয়া মহা বিরক্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ সম্পাদককে ডাকাইয়া আনিয়া ওরূপ অসার আক্ষেপোক্তি দ্বারা কাগজ বোঝাই করার জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। আর এক সময়ে উক্ত সম্পাদক সমাজসংস্কার-বিষয়ে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। সেইবারও সংস্কারবাদীদের যন্ত্রস্বরূপে আপনাকে নিয়োগ করাতে তিনি স্বামীজির তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন।

পাঠক দেখিয়াছেন মঠের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যে স্বামীজির দৃষ্টি ছিল। পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা তিনি এত ভালবাসিতেন যে, কোথাও এতটুকু ময়লা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবার জো ছিল না। কখন কখন ভৃত্যদিগের ব্যারামের জন্য ঘরদ্বারে ঝাঁট না পড়িলে নিজে ঝাঁটা লইয়া ঐসকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া তাঁহার হাত হইতে ঝাঁটা লইবার জন্য আসিত বা বলিত, 'আপনি কেন?' তাহা হইলেও ঝাঁটা দিতেন না, বলিতেন, "তা হলই বা—অপরিষ্কার থাকলে মঠের সকলের যে অসুখ করবে।" অনেক সময়ে নিজে সকলের বিছানাপত্র তদারক করিতেন, দেখিতেন রৌদ্র বা হাওয়ায় দেওয়া হইয়াছে কি না। যদি কাহাকেও এই বিষয়ে অমনোযোগী দেখিতেন তখনই সাবধান করিয়া দিতেন। আর একবার 'বাঘা' ঠাকুরপূজার জন্য আনিত জল নষ্ট করিয়া দেওয়ায় যে ব্রহ্মচারীর উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাহাকে খুব বকিয়া দেন। জীবনের শেষ বৎসর তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, মঠের সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের

অনুকরণে কেবল মধ্যাহ্নে একবার পূর্ণ আহার করিবেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় অল্প জলযোগ করিবেন, দুবেলা পূর্ণ আহার করিতে পাইবেন না। আর প্রত্যহ নিয়ম করিয়া যাহাতে বেদ ও পুরাণ পাঠ করা হয়, তদ্বিষয়ে সকলকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া রাখিয়াছিলেন। লীলাসংবরণের কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতে নিজেও এইসব ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, বেদের ব্রাহ্মণভাগ হইতেই পুরাণের উৎপত্তি। একদিন লাইব্রেরী হইতে 'গোপথ ব্রাহ্মণ' আনাইয়া শুদ্ধানন্দ স্বামীকে তাহার খানিকটা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন, নিজেও সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মঠের কেহ নিদ্রা যাইতে পারিবেন না, একেবারে পুরাণ-পাঠের জন্য সমবেত হইবেন। স্বামীজি কোন কিছুরই 'অতি' অর্থাৎ আধিক্য, আতিশয্য ভালবাসিতেন না। পূজাদি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম ছিল। ঠাকুরপূজা করিতে গিয়া বেশী তাড়াতাড়ি বা অনাবশ্যক আড়ম্বরপূর্ণ বিধিনিয়মপালনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভক্তির সহিত অকপট হৃদয়ে পূজা করিয়া যাও, সরল প্রাণে তাঁহাকে স্মরণ-মনন কর, একান্ত নির্ভরের সহিত তাঁহার পদপ্রান্তে শরণ লও—সেই হইল পূজা। বেশী খুঁটিনাটিতে কাজ কি? তাহাতে কেবল সময়ের অপব্যবহার। তাহা অপেক্ষা সেই সময়টা শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রালাপ, ধ্যানধারণা এবং তাঁহার উপদেশের অনুধ্যানে অতিবাহিত কর, তাহাতে বেশী ফল হইবে—এই কথা তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন। শাস্ত্রানুশীলনের উপর তিনি খুব জোর দিতেন। প্রত্যহ উহা আরম্ভ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজিত। নিয়ম ছিল, ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র সকলকে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাঠস্থানে সমবেত হইতে হইবে। কেহ কোন কারণে দেরী করিলে বা অনুপস্থিত হইলে স্বামীজির নিকট বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইতেন। অনেক সময়ে ইহাতে মঠের

গৃহকার্য্য বা ঠাকুরপূজার অসুবিধা হইত বা যথাযথভাবে সম্পন্ন হইত না। তাহাতেও স্বামীজির নিকট পরিত্রাণ ছিল না। সমস্ত কাজ ঠিক সময়ে নির্ব্বাহিত হওয়া চাই। স্বামীজি সকলকে যেমন ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, তেমনি আবার কঠোরভাবে শাসন করিতেও জানিতেন, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। শিষ্য ও গুরুভ্রাতৃগণও সেইজন্য তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন তেমনি ভয়ও করিতেন। ধ্যানধারণার উপর স্বামীজি বরাবরই জোর দিতেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে কয়েক মাস ধরিয়া এই সম্বন্ধে আরও বেশী কড়াকড়ি করিয়াছিলেন। ভোর চারিটার সময় ঠাকুরঘরে গিয়া ধ্যান করিবার জন্য ঘণ্টা পড়িত। ঘণ্টা বাজিবার আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলকেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইত। স্বামীজি রাত্রি তিনটার সময় বিছানা হইতে উঠিতেন, ঠাকুরঘরে তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তিনি তদুপরি উত্তরাস্য হইয়া বসিতেন, আর সকলে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন। তিনি না উঠিলে কাহারও আসন ত্যাগ করিবার অধিকার ছিল না। অনেক সময়ে ধ্যান করিতে করিতে দুই ঘণ্টারও উপর অতিক্রান্ত হইয়া যাইত। তাহার পর তিনি 'শিব' 'শিব' উচ্চারণ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া উঠানে পায়চারি করিতেন, কখনও বা শ্যামাসঙ্গীত বা শিবসঙ্গীত বা অন্য কোন ধর্ম্মবিষয়ক গান গাহিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "আহা! নরেনের সঙ্গে ধ্যান করতে বসলে কি তন্ময়তা আসে! একলা বসলে ঠিক অমনটি হয় না।"

এই কালে স্বামীজি নিজে যদি কোন দিন শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ধ্যানঘরে উপস্থিত হইতে না পারিতেন, তাহা হইলেও আর সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা সংবাদ লইতেন। অনেক সময় এইরূপ হইত যে যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তিনি হয় ত প্রত্যহই ধ্যান করিতে যান, কিন্তু

দৈবক্রমে সেদিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একবার অনেকদিন পরে একদিন স্বামীজি ঠাকুরঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দুইজন ব্যতীত আর কেহ নাই! তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সকলকে নিকটে ডাকাইলেন এবং কেন তাঁহারা ধ্যান করিতে যান নাই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই-তিন জন শারীরিক অসুস্থতার কথা জানাইলেন, আর কেহ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে স্বামীজির একজন গুরুভাইও ছিলেন। কিন্তু সেদিন কেহই নিস্তার পাইলেন না। তখনই হুকুম হইয়া গেল, যাঁহাদের শরীর অসুস্থ ছিল তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই সেদিন মঠে আহার করিতে পাইবেন না, ভাণ্ডারীকে বলিয়া দিলেন যেন তাঁহাদের জন্য চাল ডাল ইত্যাদি না লওয়া হয়। তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আহার করিবেন, এমনকি কলিকাতার কোন বন্ধুবান্ধবের বাটীতে যাওয়াও নিষিদ্ধ হইল। অগত্যা সেই দিন যাঁহারা ধ্যান করিতে যান নাই, তাঁহাদের সকলকেই ভিক্ষায় বহির্গত হইতে হইল। এত কঠোরতা, কিন্তু এদিকে আবার স্বামীজির হৃদয় এমন কোমল যে তাঁহারা মঠ হইতে অনাহারে বাহির হইয়া যাইবেন এই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। পরদিন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার ভাগ্যে কি জুটিয়াছিল। তখন খুব সদয়ভাব ও স্নেহময় ব্যবহার! খুব হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার গুরুভ্রাতার সঙ্গ লইয়াছিলেন তাঁহারা মঠ হইতে তিন মাইল দূরে সালকিয়ার একজন মাড়োয়ারী বণিকের বাটীতে চর্ব্বচূষ্য আহার করিতে পাইয়াছিলেন শুনিয়া স্বামীজি আহ্লাদে আটখানা। আবার কাহারও অদৃষ্টে ভালরূপ জুটে নাই শুনিয়া তাহা লইয়াও আমোদ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। স্বামীজি যে ভাবেই থাকুন—ক্রোধই

করুন আর যাই করুন, তাঁহার দর্শনেই সকলের আনন্দ হইত, তাঁহার উপস্থিতিই সকলের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি একাধারে গুরু, বন্ধু ও বয়স্য সমস্তই ছিলেন। জগৎজোড়া যশের বোঝা দূরে ফেলিয়া নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে আকাঙ্ক্ষানির্দ্ধৃত হৃদয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতেছিলেন। বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জ্জন নাই—কেবল বর্ষণ। তাঁহার প্রভাবে মঠের সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও এই সময়ে সাধন-ভজনের প্রবল বাসনা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সকলেই দৃঢ় যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত তৎপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। 'শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্'—এই ভাব সকলেরই মনে।

মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বাভাস

স্বামীজির জীবনের শেষ দুই মাসে (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মে ও জুন) এমন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় তিনি তখন মনে মনে মহাযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার গুরুভ্রাতা বা শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও অন্তঃকরণে ঘুণাক্ষরেও সে সন্দেহের উদয় হয় নাই। তাঁহার দেহাবসানের পর সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে এই সময়কার অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনার মধ্যেও একটা গূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার সামান্য কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ও অর্থ নিহিত ছিল, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কেহ তাহা লক্ষ্য বা তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। বাস্তবিক, স্বামীজির শরীরের অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে এত শীঘ্র মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া যাইবেন একথা কেহ কল্পনাও করেন নাই। কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি তাঁহার সমুদয় সন্ন্যাসী শিষ্যকে দেখিবার অভিলাষে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে দুই-এক দিনের জন্যও তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছিলেন। এমনকি যাঁহারা দূর সমুদ্রের পরপারে পৃথিবীর অপর অংশে ছিলেন তাঁহাদিগের নিকটও পত্র গিয়াছিল। কেহ কেহ আহ্বান পৌছিবামাত্র শীঘ্র শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ বা গুরুতর কার্য্যানুরোধে ঠিক সময়ে আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই—পরে যখন শুনিলেন তিনি আর ইহলোকে নাই, দর্শনলাভের শেষ সুযোগ প্রদান করিয়া চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাদের আক্ষেপের সীমা রহিল না।

দিন যত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল, স্বামীজি মঠ ও মিশনের

কার্য্যসংস্রব হইতে ততই সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন; ইচ্ছা—যাঁহাদের ভবিষ্যতে ঐ কাজ করিতে হইবে, তাঁহারা যেন স্বাধীন ভাবে তাঁহার সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত হন। তিনি বলিতেন, "সর্ব্বদা শিষ্যের কাছে কাছে থাকিয়া কত গুরু যে শিষ্যের অনিষ্ট করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না! একবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহা না হইলে গুরুর অবর্ত্তমানে তাহারা আপন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবে কেমন করিয়া?" তাঁহার মুখে একথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যদিগের মনে বড়ই ক্লেশ হইত। কারণ তাঁহারা জানিতেন, তিনি যদি ছাড়িয়া যান তবে কার্য্যের বিষম ক্ষতি হইবে। কিন্তু স্বামীজি সব জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই পার্থিব বন্ধনগুলি একে একে ছিন্ন করিতেছিলেন। এখন তাঁহার মন শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার পরমারাধ্যা শ্যামা-মায়ের চরণে সমাহিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই ধ্যানোন্মুখ হইয়া থাকিতেন। ধ্যানও তেমনি গভীর; যখন সাধারণ অবস্থায় থাকিতেন তখনও পর্য্যন্ত যেন অন্তরে তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকিত, কারণ দেখা যাইত পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্ন লইতেন বা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, এই সময়ে সেইগুলির প্রতিও আর যত্ন বা আগ্রহ ছিল না—সব বিষয়েই উদাসীন ভাব, সর্ব্বদাই যেন মানসতপে নিযুক্ত। মাঝে মাঝে এভাব দর্শনে গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ যে উদ্বিগ্ন না হইতেন তাহা নহে, কারণ তাঁহাদের মনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই কথাটি যখন তখন উদিত হইত—"ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন আর দেহ রাখবে না।" একদিন পূর্ব্ববিষয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে একজন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, "স্বামীজি, এখন কি আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনি কে?" স্বামীজি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "হাঁ, পেরেছি বৈকি!" কিন্তু সে উত্তরে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

কাহারও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সকলেই বুঝিলেন, এখন তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিতে পারেন।

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দকে একখানি পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন এবং উহা আনীত হইলে সেই দিন যে তারিখ তাহার পর কতকগুলি পাতা উল্‌টাইয়া পঞ্জিকাখানি নিজের ঘরেই রাখিয়া দিলেন। তদবধি মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিবিষ্টচিত্তে উক্ত পঞ্জিকার পাতা উল্‌টাইতে দেখিতে পাওয়া যাইত; বোধ হইত যেন তিনি কোন বিশেষ দিনের অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহার দেহান্ত হইলে সকলেই বুঝিলেন পঞ্জিকা দেখিবার উদ্দেশ্য কি ছিল। স্মরণ হইল, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও দেহত্যাগের পূর্ব্বে ঐরূপ করিয়াছিলেন। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় একদিন তিনি একজন শিষ্যকে পঞ্জিকা পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন এবং দুই চারি দিন পড়িয়া শুনাইবার পর বলিয়াছিলেন, "হয়েছে, আর দরকার নেই।" স্বামীজিও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক মহাপ্রস্থানের দিন নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একথা তখন একবারও কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

দেহত্যাগের তিন দিবস পূর্ব্বে একদিন অপরাহ্নে মঠের তৃণাচ্ছাদিত ময়দানে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামীজি গঙ্গাতীরের একটি স্থানে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহ গেলে ঐখানে সৎকার করবি।"

তাঁহার আদেশমত ঐখানেই এখন তাঁহার সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে, অচ্যুতানন্দ স্বামীকে ১৮৯৭ সালের ১০ই আগষ্ট তিনি বলিয়াছিলেন, "আর পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র জীবিত থাকব।" কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্ট আভাস দিয়াছিলেন ১৯০১

সালে। ঢাকার জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ার পর একদিন তিনি গম্ভীরভাবে শিষ্যদিগের সম্মুখে এই কথা বলিয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন, "আমি আর বড় জোর এক বছর আছি। এখন শুধু মাকে (তাঁহার গর্ভধারিণী) গোটা কতক তীর্থ দর্শন করিয়ে আনতে পারলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়। তাই চন্দ্রনাথ আর কামাখ্যায় যাচ্ছি। তোরা কে কে আমার সঙ্গে যাবি বল। স্ত্রীলোকের উপর যাদের খুব ভক্তিশ্রদ্ধা আছে শুধু তারাই যেতে পারে।"

কাশ্মীরে থাকিতে কয়েকদিন কঠিন পীড়া-ভোগের পর তিনি ভূমি হইতে দুইখণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর উঠাইয়া নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হইবে তখন সব দৌর্ব্বল্য চলিয়া যাইবে—বাহিরের কোন চিন্তা, ভয় বা উদ্বেগই থাকিবে না। আমি এখন হইতে মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত—এই পাথরের মত শক্ত, কারণ আমি শ্রীভগবানের চরণস্পর্শ লাভ করিয়াছি। এই বলিয়া হস্তস্থিত প্রস্তরখণ্ডদ্বয় আঘাত করিয়াছিলেন। নিবেদিতা বলেন, "স্বামীজি নিজের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা এত কম বলিতেন যে, এই কথাগুলি আমাদিগের হৃদয়ে চিরবিদ্ধ হইয়া আছে।" অমরনাথ হইতে ফিরিয়াও তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "বাবা অমরনাথ আমায় দয়া করে ইচ্ছামৃত্যুর বর দান করেছেন।" এই কথা শুনিয়া এবং পরমহংসদেব যে বলিয়াছিলেন 'এখন চাবি দেওয়া রইল, এর পর খুলবো' এবং 'ও যখন জানতে পারবে ও কে, তখনই দেহত্যাগ করবে'—এই সমস্ত স্মরণ করিয়া সকলেই ভাবিতেন তাঁহার লীলাবসানের পূর্ব্বে তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবে না। কিন্তু সামান্য মানব আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, শ্রবণ থাকিতেও বধির। যাঁহার খেলা, তিনি না বুঝাইয়া দিলে সাধ্য কি বুঝি!

নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "যে দিন তাঁহার তিরোধান হয় তাহার পূর্ব্ব

বুধবার একাদশী দিন স্বামীজি নিজে উপবাস করিয়াও শিষ্যগণকে স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহার্য্য দ্রব্য অধিক কিছু নয়—ভাত, আলুসিদ্ধ, কাঁঠালের বিচিসিদ্ধ, আর একটু ঠাণ্ডা দুধ। স্বামীজি তাহাই লইয়া হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে সকলকে আহার করাইলেন এবং আহারান্তে সকলের হাতে জল ঢালিয়া দিয়া নিজ হাতে গামছা লইয়া তাঁহাদের হাতমুখ মুছাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া একজন বলিলেন, 'স্বামীজি, ও কি করিতেছেন? আপনি আমাদের সেবা করিবেন, না আমরা আপনার সেবা করিব! স্বামীজি মধুর হাসিয়া ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, 'তা হোক। যীশুখৃষ্ট কি করেছিলেন? নিজের শিষ্যদের পা ধোয়াইয়া দেন নাই?' শিষ্য চমকিত হইয়া গেলেন। হঠাৎ যেন মুখ দিয়া বাহির হইতে যাইতেছিল 'কিন্তু সে যে অন্তিম সময়।' কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া গেলেন।

"শেষ কয়দিন স্বামীজির শরীরে কোন অসুখ ছিল না। যেন একখানি যোগময় তনু অন্তরস্থ উজ্জ্বল আত্মাকে আবরণ করিয়া ছিল মাত্র। কিন্তু সে সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার আলোকপ্রবাহ ফুটিয়া বাহির হইত। বোধ হয় অনন্ত জ্যোতির প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হওয়াতেই তাঁহার দেহ হইতে ঐরূপ প্রভা বিকীর্ণ হইত। কিন্তু কেহই বুঝিতে পারে নাই তাঁহার শেষ দিন এত নিকটে!"

এখন মনে হয়, এমন কি মহাসমাধির দিনও তাঁহার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ বিশেষ অর্থসূচক ছিল। সে দিন প্রাতে চা খাইতে খাইতে গুরুভ্রাতাদিগের সহিত বসিয়া অতীত দিনের অনেক আলোচনা ও গল্প করিয়াছিলেন এবং তৎপর দিবস শনিবার ও অমাবস্যা থাকায় ঐ দিন রাত্রে কালীপূজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা কালীমাতার পরম ভক্ত ও সাধক ঈশ্বরচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় স্বামীজি সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আসিয়াছেন!" এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দকে পূজার সমস্ত আয়োজন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তাঁহারাও ত্বরায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর স্বামীজি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া বেলা প্রায় ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত নির্জ্জন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। ঐ দিনকার একটি বিশেষ ঘটনা এই যে, তিনি ঠাকুরঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন—সাধারণতঃ কথনও ঐরূপ করিতেন না। ধ্যানের পর 'কে বলে তারিণী তোমায় তিমিরবরণী?'—এই গানটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে অস্ফুটস্বরে বলিতে শুনিলেন, "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল! কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।" খুব উচ্চ ভাবাবস্থার প্রেরণায় হৃদয়দ্বার স্বতঃ উদ্ঘাটিত না হইলে তিনি প্রায় কথনই নিজের সম্বন্ধে এ রকম কথা বলিতেন না। সুতরাং এ কথা শ্রবণে স্বামী প্রেমানন্দ একটু বিচলিত হইলেন। তাহার পর স্বামীজির আদেশে শুদ্ধানন্দ স্বামী মঠের লাইব্রেরী হইতে শুক্লযজুর্ব্বেদ গ্রন্থ আনিয়া ভাষ্যসমেত এই মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন—

'সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমার্গন্ধর্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম।

স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা॥'—

(শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত বাজসনেয়-সংহিতার মাধ্যন্দিনী শাখার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪০শ শ্লোক), কিন্তু মহীধরকৃত ভাষ্য স্বামীজির মনোমত হইল না। তিনি বলিলেন, "এ ব্যাখ্যা আমার মনে লাগছে না। ভাষ্যকার 'সুষুম্না' পদের যে ব্যাখ্যাই করুন, পরবর্ত্তী কালে তন্ত্রাদিতে দেহাভ্যন্তরস্থ

সুষুম্না নাড়ী বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তাহারই বীজ এই বৈদিক মন্ত্রে নিহিত রহিয়াছে। তোরা এই সব শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম প্রণিধান করবার চেষ্টা করবি। শাস্ত্রের অর্থসম্বন্ধে নিজে নিজে চিন্তা করবি, তা হলেই মৌলিক ব্যাখ্যা বার করতে পারবি।" স্বামীজি উপরোক্ত মন্ত্রের যেরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে এবং পরদিন কালীপূজা করিবার ইচ্ছা হইতে স্পষ্ট বুঁঝা যায়, এই দিন ষট্‌চক্র ও তৎসাধন-প্রক্রিয়ার কথা বিশেষভাবে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল।

স্বামীজি সাধারণতঃ পৃথকভাবে নিজগৃহে আহার করিতেন, কিন্তু এইদিন সকলের সহিত নীচে বসিয়া বিশেষ তৃপ্তি ও রুচির সহিত আহার করিয়াছিলেন। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা ১টার সময় (অন্যান্য দিন অপেক্ষা ১ ঘণ্টা ১॥০ ঘণ্টা পূর্ব্বে) স্বয়ং ব্রহ্মচারীদিগের গৃহে গিয়া তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ক্লাশে যোগ দিতে বলিলেন। তিন ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাকরণ-শাস্ত্রের আলোচনা হইল। স্বামীজি বরদরাজের লঘুকৌমুদীর সূত্রগুলি নানা হাস্যোদ্দীপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সহিত জড়িত করিয়া, সূত্রের ভাষা লইয়া বহুবিধ রহস্য করিতে করিতে সেগুলিকে অতি সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া শিষ্যদিগের মনোমধ্যে গাঁথিয়া দিলেন এবং বলিলেন, কলেজে অধ্যয়নকালে এইরূপ গল্প, উপমা ও কৌতুকের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার সহপাঠী বন্ধু (পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল) দাশরথি সান্যাল মহাশয়কে এক রাত্রের মধ্যে সমগ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস আয়ত্ত করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ত হইলে স্বামীজিকে যেন কিঞ্চিৎ ক্লান্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ঐ দিন বৈকালে স্বামীজি প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত বেলুড় বাজার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। শরীর খারাপ হওয়া অবধি স্বামীজি অনেক দিন এত পথ হাঁটেন নাই। কিন্তু এইদিন কোন কষ্ট অনুভব করিলেন না—বলিলেন,

শরীর খুব লঘু বোধ হইতেছে। প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত অনেক বিষয়ের মধ্যে বেদবিদ্যালয়-স্থাপন সম্বন্ধেও কথাবার্ত্তা হয়। প্রেমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বেদপাঠে কি উপকার হইবে?' স্বামীজি ইহার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উত্তর দিয়াছিলেন, 'আর কিছু না হোক—সংস্কারগুলো ত দূর হবে!'

পাঠক দেখুন, এখনও পর্য্যন্ত আসন্ন মহাপ্রয়াণের কোন বাহ্য লক্ষণই নাই! কিন্তু ইঙ্গিত যথেষ্ট আছে।

মহাসমাধি

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মঠে ফিরিয়া স্বামীজি সকলের সহিত আলাপ ও কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তার পর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজিলে নিজগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক গঙ্গাবক্ষের দিকে মুখ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। একজন ব্রহ্মচারী নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজি স্বয়ং মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন এবং তাঁহাকে গৃহের বহির্ভাগে বসিয়া ঐরূপ করিতে আদেশ দিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিনি উক্ত ব্রহ্মচারীকে নিকটে আহ্বান করিয়া মাথায় বাতাস করিতে বলিলেন এবং গরম বোধ হওয়ায় গৃহের সমুদয় জানালা দরজা খুলিয়া দিতে বলিয়া কক্ষতলে শয়ন করিলেন। তখনও হাতে মালা রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ বাতাস করার পর তিনি শিষ্যকে পা দুটি একটু টিপিয়া দিতে বলিলেন। তার পর বোধ হইল যেন ঘুমাইতেছেন বা ধ্যান করিতেছেন। শিষ্য পদসেবা করিতে লাগিল। এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। স্বামীজি বামপার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার পর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন এবং ক্ষুদ্র বালক স্বপ্নে যেরূপ কাঁদিয়া উঠে সেইরূপ একটা অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। হাতখানি একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং মস্তকটি উপাধানচ্যুত হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। তাহার এক মিনিট কি দুই মিনিট পরে পূর্ব্ববৎ আর একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পরই সব যেন স্থির হইয়া গেল—ক্লান্ত শিশু যেন মার ক্রোড়ে ঘুমাইতে লাগিলেন। চক্ষু দুটি ভ্রূর মধ্যস্থলে স্থিরভাবে নিবদ্ধ, মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ

প্রকটিত—দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি মহাধ্যানে নিমগ্ন। তখন ৯টা বাজিয়া মিনিট দশেক মাত্র হইয়াছে।

ব্রহ্মচারীটি অল্পবয়স্ক। কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি একজন অধিকবয়স্ক সন্ন্যাসীকে (বোধ হয় নিশ্চয়ানন্দকে) ডাকিলেন। তখন সবে মাত্র খাওয়ার ঘণ্টা পড়িয়াছে। তিনি আসিয়াই নাড়ী দেখিলেন, কিন্তু নাড়ীর গতি অনুভূত না হওয়াতে তৎক্ষণাৎ আর একজনকে আহ্বান করিলেন (ইনি বোধ হয় প্রেমানন্দ স্বামী)। দুইজনেই দেখিলেন নাড়ী নাই। শঙ্কায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিতেছেন না—বিশ্বাসও হইতেছে না যে তাঁহাদের প্রিয়তম স্বামীজি সত্যই তাঁহাদিগকে চিরদিনের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন! প্রেমানন্দ স্বামী মনে করিলেন, বোধ হয় সমাধি হইয়াছে; ঠাকুরের নাম শুনাইলেই বাহ্য চৈতন্য হইবে। সেই জন্য তিনি ও নিশ্চয়ানন্দ উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সমাধিভঙ্গ হইল না। হায় হায়, এ যে মহাসমাধি!

ইতোমধ্যে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা সকলে আসিয়া পড়িলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ বোধানন্দ স্বামীকে ভাল করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নাড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ তখন নির্ভয়ানন্দকে বলিলেন, "হায় হায়! আর কি দেখিতেছ? শীঘ্র মহেন্দ্র ডাক্তারকে (বরাহনগরের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ মজুমদার) ডাকিয়া আন।" একজন তখনই ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন; আর একজন কলিকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে সংবাদ দিতে গেলেন। রাত্রি সাড়ে দশটায় সময়ে তাঁহারা উভয়ে মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তারও আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন এবং হস্তাদি ঘুরাইয়া কৃত্রিম উপায়ে চৈতন্য-

সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি বারটার সময় ডাক্তার বলিলেন, প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার পরেও স্বামীজির দেহের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তাঁহার যে পীড়া হইয়াছিল বা মৃত্যু হইয়াছে এরূপ কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না—এত সুস্থ, সবল ও জীবন্ত দেখাইতেছিল! বাস্তবিক মৃত্যুতেও যেন তাঁহাকে সমাধিলীন শিবমূর্ত্তির ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছিল। বিশাল পদ্মচক্ষু দুটী ঊর্দ্ধগামী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের শ্বেতাংশ হইতে যেন অপরূপ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সে রাত্রি এই ভাবে কাটিল।

প্রাতে দেখা গেল—তাঁহার চক্ষু দুটী জবাকুসুমের ন্যায় লোহিতাভ হইয়াছে এবং নাসিকাদ্বার ও মুখপ্রান্তে একটু রক্তচিহ্ন রহিয়াছে। প্রাতে কলিকাতা হইতে সুবিজ্ঞ ডাক্তার বিপিনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিলেন। তিনি স্বামীজির দেহ পরীক্ষা করিয়া এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু রাত্রে মহেন্দ্রবাবু বলিয়া গিয়াছিলেন, হৃদ্‌রোগই মৃত্যুর কারণ। তাহার পর আরও অন্যান্য ডাক্তার আসিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষণাদি শুনিয়া কি কারণে ঠিক মৃত্যু হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কেহই একমত হইতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন, মাথার শির ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আর কিছু না হউক এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, জপ ও ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া স্বামীজির প্রাণবায়ু অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মৃত্যুর যথাযথ কারণ কোন চিকিৎসকই স্থির করিতে পারেন নাই। তবে যিনি যাহাই বলুন, মঠের সন্ন্যাসীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বলিতেন তাহাই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ স্বামীজি যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জন্মও অদ্ভুত, মৃত্যুও অদ্ভুত!

ভগিনী নিবেদিতা প্রাতেই আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজির দেহ-পার্শ্বে বসিয়া বেলা ২টা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ২টার সময় নীচের দালানে দেহ নামাইয়া আনা হইল। তারপর উহা গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অলক্তক-রঞ্জিত চরণদ্বয়ের চিহ্ন গ্রহণ করা হইল। তদনন্তর ঐ পুণ্যদেহ প্রদক্ষিণ করিয়া ধূপ-ধুনা-প্রজ্বলন ও শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদ সহকারে দীপারতি সম্পাদিত হইল। তার পর সকলে একে একে স্বামীজির শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ করিতে লাগিলেন, কেহ বা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণরেণু গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এস পাঠক! আমরাও এই মাহেন্দ্রক্ষণে মনে মনে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার পদরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া প্রাণ ভরিয়া গাই—

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।"

অনন্তর সকলে 'জয় গুরু মহারাজজীকী জয়', 'জয় শ্রীস্বামীজি মহারাজকী জয়' ধ্বনিতে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া স্বামীজির নির্দ্দেশমত পূর্ব্বকথিত বিল্ববৃক্ষের সমীপস্থ গঙ্গাতীরে তাঁহার পূতদেহ ভস্মীভূত করিলেন।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার স্বামীজির পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তৎকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন। তিনি প্রায় বলিতেন, "আমি চল্লিশ পেরুচ্ছি না।" একথাও বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল।

এই ভাবে ভারতের জাতীয় জীবনে এক নব অঙ্কের সূচনা মাত্র করিয়া দিয়াই কর্ম্মশ্রান্ত বীর চির অবসর গ্রহণ করিলেন। এই তন্দ্রামগ্ন, আলস্যাচ্ছন্ন জাতির বক্ষ হইতে সমুদ্ভূত এই মহাকর্ম্মীর আদর কি ভারতবাসী

বুঝিবে? জগতে আসিয়া যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন সবই ভারতের জন্য। ইহাতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হইয়াছে বটে, সংস্কৃত ভাষার মণিময় গর্ভের কঠিন আবরণের মধ্যে যে অমৃতের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন তাহা মুক্তহস্তে জগতের সকলকেই পরিবেশন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের শ্রেয়ঃসাধন। মন্দভাগিনী ভারত সর্ব্বস্ব হারাইলেও তাহার শূন্য রাজকোষে লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের শেষ চিহ্নস্বরূপ এই মহার্হ বেদান্তরত্ন পুঞ্জীভূত কুসংস্কার-ধূলিরাশির মধ্যে এক অবজ্ঞাত কোণে পড়িয়াছিল। স্বামীজি আসিয়া আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন এখনও এই রত্নের পরিবর্ত্তে দুঃখিনী ভারতের ত্রিশ কোটি অসহায় সন্তানের ভাগ্য আবার ফিরিতে পারে। সেইজন্য তিনি সমগ্র জাতির চিন্তাভার আপন মস্তকে লইয়া অমানুষিক পরিশ্রমে হৃদয়রক্ত পাত করিয়া এই গভীর অরণ্যে সূর্য্যালোক-প্রবেশের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এখনও অনেক কার্য্য বাকী। কোথায় নবযুগের রথিবৃন্দ, স্বামীজির কণ্টকাকীর্ণ গুরুভার পতাকা স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। এস বাঙ্গালী, এস ভারতবাসী, হীনতার কলঙ্কডালি লইয়া কাঙ্গালের ন্যায় সভ্যজাতির রাজসূয়সভার বহির্দ্দেশে বসিয়া না থাকিয়া বীরদর্পে উত্থিত হও, স্বামীজির পুণ্যচরিত স্মরণ করিয়া তাঁহার অক্ষয় স্মৃতির বজ্রদৃঢ় বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া কঠোর কর্ত্তব্যের অভিমুখে ধাবিত হও, ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার মুক্ত করিয়া দাও, তাহা হইলেই তাঁহার দেহধারণ সার্থক হইবে।

ওঁ শিবমস্তু

কোষ্ঠীবিচার

নিম্নে প্রকাশিত কোষ্ঠীখানি পূজনীয় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ স্বামী আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। দর্শনাদিশাস্ত্রে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে তিনি উহা প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রবাবু ঐ সঙ্গে তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে নিম্নলিখিত কয়টি কথা ছিল—

"স্বামীজির কোষ্ঠী আমি অবিনাশ বাবুর (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) নিকট পাই। তিনি উহা আসল কোষ্ঠী দেখিয়া নকল করিয়া লইয়াছিলেন এবং স্বামীজির মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া উহার সত্যতা নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কোষ্ঠী দেখিয়া স্বামীজির দেহান্তকাল কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—অবশ্য স্বামীজির জীবিতাবস্থাতেই। আমরা ফল মিলাইবার জন্য ছয় মিনিট মাত্র কাল পিছাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ যে সময় কোষ্ঠীতে ছিল তাহা অপেক্ষা ছয় মিনিট পরে করিয়াছি। ইহা করিবার উদ্দেশ্য স্বামীজির জীবনের সহিত কোষ্ঠীর ঐক্যসম্পাদন। আর এইরূপ ৫।৬ মিনিট কমবেশী হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা। অনেক সময় ১০।১২ মিনিটও এদিক ওদিক করা আবশ্যক হয়। তাহার পর ঘড়িও সাধারণতঃ ঠিক থাকে না। স্বামীজির পূর্ব্ব কোষ্ঠীতে ধনুলগ্ন ছিল, ঐ ছয় মিনিট সরাইয়া দেওয়ায় মকরলগ্ন হইয়া গিয়াছে। ধনুলগ্নে স্বামীজির মত লোক জন্মেন না। কিন্তু মকরলগ্নে তাহা সম্ভব। এই ভুল সংশোধন করিয়া আমি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলি এবং তাঁহাকে কোষ্ঠীখানি তৈয়ার করিতে বলি।...তিনিও আমার কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং তাঁহার অপরাপর (জ্যোতিষজ্ঞ) বন্ধুর সহিত ঐ কথা লইয়া বহু বিচার করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে মকরলগ্ন করা উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।"......

এই সম্বন্ধে আমি পুরুলিয়ার উকীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য গণিত ও ফলিত উভয়বিধ জ্যোতিষে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন শ্রদ্ধাস্পদ সত্যব্রত

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

এই ঠিকুজির প্রথমেই "প্রচলিত বিচার্য্য-নিরয়ণ জন্মকুণ্ডলী" দেওয়া আছে অর্থাৎ উক্ত জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহসংস্থাপন অয়নাংশশোধিত নহে। ৪২১ শকাব্দে একবার দৃক্‌গণিত ঐক্য করিয়া গ্রহস্ফুট নির্ণয়ের জন্য খণ্ডা (Table) প্রস্তুত করা হইয়াছিল; তৎকালে ৩০শে চৈত্র তারিখে বিষুবারম্ভণ হইত। তৎপরে আর দৃক্‌গণিত ঐক্য করা হয় নাই। বিষুবারম্ভণ ক্রমশঃ পিছাইয়া বর্ত্তমান সময়ে ৯ই চৈত্র তারিখে হইতেছে। অতএব উক্ত দিবসের পর হইতেই মেষ-সংক্রামণ ধরা উচিত। অয়নাংশ সংস্কার করিয়া গ্রহসংস্থাপন অর্থাৎ সায়ন জন্মকুণ্ডলী করিলে এ সকল প্রমাদ উপস্থিত হয় না এবং চক্ষেও দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্ট গ্রহের অবস্থিতির সহিত ঐক্য হয়। এই মহাপুরুষের সায়ন জন্মকুণ্ডলী দেওয়া আছে। ইঁহার যে পুরাতন কোষ্ঠী আছে তাহার জন্মসময়ে ৬ মিনিট যোগ না করিলেও সায়নলগ্ন মকরই হইবে। ইহার সায়ন গ্রহস্ফুট হইতে বর্গাদি নির্ণয় করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে জ্যোতির্ব্বিদমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ইনি কি প্রকার উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন। নিরয়ণ কুণ্ডলী ধরিয়া বিচার করা অনর্থক, যেহেতু প্রথমতঃ নিরয়ণ গ্রহস্ফুট (position of planets) যন্ত্রাদি সাহায্যে দৃষ্ট গ্রহের অবস্থিতির সহিত ঐক্য হয় না এবং দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যথা—

চল-সংস্কৃত-তিগ্মাংশোঃ সংক্রমো যঃ স সংক্রমঃ।
অজা-গল-স্তন ইব রাশি-সংক্রান্তিরুচ্যতে॥ ইতি বশিষ্ঠঃ
অয়নাংশ-সংস্কৃতো ভানুর্গোলে চরতি সর্ব্বদা।
অমুথ্যা রাশি-সংক্রান্তিস্তস্যাঃ কালবিধিস্তয়োঃ॥ ইতি পুলস্ত্যঃ
দিনরাত্রিপ্রমাণানাং নির্ণয়ো নভ-সংক্রমাৎ।
যতঃ সকলকর্ম্মাণি পুণ্যোঽতশ্চল-সংক্রমঃ॥ ইতি রোমকঃ

সত্যবাবুর কথার মর্ম্ম এই, রাজেনবাবু যে মকর-লগ্ন করিবার জন্য ৬ মিনিট পরে জন্মসময় ধরিয়াছেন, তাহা না ধরিলেও (সায়নগণনায় যাহা ধরিয়াই প্রকৃতপক্ষে গণনা করা উচিত) মকর লগ্নই হইবে।

শকাব্দাঃ ১৭৮৪।৮।২৮।০।২।৪৮

প্রচলিত বিচার্য্য নিরয়ণ জন্মকুণ্ডলী । জন্মকালীন গ্রহস্ফুট ।

কে ৪ ০	ম ১	০ ০
০		বু ২২ শু ২১ লং ০।২
০ শ১৩ চ১৩	বৃ ১৪	র ২৯ রা ২১

গ্রহাঃ	রাশি	অংশ	কলা
রবিঃ	৮	২৯	২০
চন্দ্রঃ	৫	১৬	১৫
কুজঃ	০	৬	১৭
বুধঃ	৯	১১	৪৩
গুরুঃ	৬	৪	১
শুক্রঃ	৯	৭	২
শনিঃ	৫	১৩	৩৬
রাহুঃ	৭	২২	১৫
কেতুঃ	১	২২	১৫
লগ্নঃ	৯	০	২
অয়নাংশঃ	০	২১	৫৬

(Measured from চিত্রা)

১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ (ইংরেজী ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভোর ৬টা ৪৯ মিনিট), সোমবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, হস্তানক্ষত্র, কন্যারাশি, শুকর্ম্মা যোগ, দেবগণ, শূদ্রবর্ণ। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে জন্ম। মকর লগ্ন, শনির ক্ষেত্র, চন্দ্রের হোরা, শনির দ্রেক্কাণ, শনির তুর্য্যাংশ, চন্দ্রের সপ্তাংশ, শনির নবাংশ, বুধের দশাংশ, শনির দ্বাদশাংশ, শুক্রের ত্রিংশাংশ। লগ্ন শনির সিংহাসনবর্গ প্রাপ্ত এবং চন্দ্রের পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।

গ্রহাণাং বর্গচক্রম্

	১	১/২	১/৩	১/৪	১/১০	১/৬	১/৭	১/৮	১/৯	১/১২	১/৫	১/৩০	
সূর্য্যঃ	বৃ	চ	র	বু	বৃ		বু	বৃ	বৃ	বৃ	শু	শু	
চন্দ্রঃ	বু	র	শ	বৃ	শু	শ	শু	বৃ	শু	ম	বৃ	বৃ	
কুজঃ	ম	র	ম	ম	বু	শু	বু	শু	শু	ম	শ	শ	গোপুরবর্গ
বুধঃ	শ	চ	শু	ম	ম	বৃ	বৃ	চ	ম	শু	বু	বু	পারিজাতবর্গ
গুরুঃ	শু	র	শু	শু	বৃ	ম	ম	শু	ম	র	ম	ম	পারিজাতবর্গ
শুক্রঃ	শ	চ	শ	শ	ম	ম	ম	শু	বৃ	বৃ	বু	বু	
শনিঃ	বু	চ	শ	বৃ	বু	বৃ	বু	বৃ	শু	শ	বৃ	বৃ	পারিজাতবর্গ
রাহুঃ	ম	র	চ	শু	শ	শ	শ	শু	শ	চ	শ	শ	
কেতুঃ	শু	র	শ		র	শ	র	শু	চ	শ	শ	শ	
লগ্নঃ	শ	চ	শ	শ	বু	শু	চ	ম	শ	শ	শু	শু	লগ্নাধিপতিশনিরসিংহাসনবর্গ

সায়ন বর্ষকুণ্ডলী

সায়নমতে ষট্ সমুদ্রযোগ ঘটিয়াছে।

লগ্নপতি শনি স্বীয় পারিজাতবর্গ ৯মপতির উত্তমবর্গ এবং ১০মপতির পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।

৯মপতি বুধ ১০মপতি ও ৫মপতির পারিজাতবর্গ ও লগ্নপতির উত্তম বর্গপ্রাপ্ত। ১০ম পতি ও ৫মে পতি শুক্র লগ্নপতির উত্তমবর্গ দেবগুরুর পারিজাতবর্গ এবং নিজ ও ভাগ্যপতির এক এক বর্গ প্রাপ্ত।

৭ম পতি বৃহস্পতির গোপুরবর্গ ৯ম পতির পারিজাতবর্গ এবং দশমপতি পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।

৪র্থ পতি কুজ স্বীয় গোপুরবর্গ ভাগ্যপতির পারিজাতবর্গ এবং ১০ম পতির পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।

বিদ্যাযশোযোগঃ

বিদ্যাধিপে বা যদি চন্দ্রসূনৌ, লগ্নে সুখে লগ্নপসংযুতে বা বলান্বিতে পাপদৃশা বিহীনে, জ্ঞানী যশস্বী ভবতি প্রজাতঃ॥ বিদ্যাধিপতি বুধ ও শুক্র লগ্নে অবস্থান করায় জ্ঞানী ও যশস্বীর লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। বলবতি শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপযাতে শুভশতমুপযাতি স্বামিদৃষ্টেরিলগ্নে সুরগুরুনবভাগাত্রিংশদংশত্রিভাগে, দশম ভবনপে বা বীতভোগস্তপস্বী।

(জ্যোতির্নিবন্ধ)

নবমভবনসংস্থে মন্দগেহন্যৈরদৃষ্টে। ভবতি নরপযোগে দীক্ষিতঃ পার্থিবেন্দ্রঃ॥

বৃহজ্জাতকে।

এই স্থলে রাজযোগ-সংযোগে সন্ন্যাসী হইয়াও রাজযোগের ফলভোগী।

গুরৌ কর্ম্মগে মন্দিরং চিত্রশালং পিতুঃ পূর্ব্বজেভ্যোহপি তেজোধিকত্বম্।

ন তুষ্টো ভবেচ্ছর্ম্মণা পুত্রকাণাম্ পচেৎ প্রত্যহং প্রস্থসামুদ্রমন্নম্॥

১০মে গুরু থাকিলে জাতক স্বকুলশ্রেষ্ঠ পুত্রসুখহীন হয় এবং তৎসন্নিধানে প্রত্যহ বহুলোক আহার করে অর্থাৎ তিনি বহুলোকের আহারদাতা হন।

পারাশরীয়াঃ—"ধর্ম্মকর্ম্মাধিপৌ চৈব ব্যত্যয়েনাবৃত্তৌ স্থিতৌ।

যুনক্তি চেত্তদা বাচ্যং যোগোহয়ং প্রবলঃ স্মৃতঃ।"

এস্থলে জাতকের ৯ম ও ১০ম পতি উভয়ে লগ্নস্থ এবং ৫ম পতিত্বহেতু যোগ বিশেষ প্রবল হইয়াছে। লগ্ন ও ৭মপতি নবমে; ৪র্থপতি মঙ্গল পাতালে থাকিয়া আকাশস্থ

বৃহস্পতিকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছেন। শনি ও বুধ অর্থাৎ লগ্ন ও ৯ম পতি স্থানবিনিময় সম্বন্ধে বদ্ধ।

কেন্দ্রত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকৌ।
অন্য ত্রিকোণপতিনা সম্বন্ধো যদি কিং পরং॥
নিবসেতাং ব্যত্যয়েন তাবুভৌ ধর্ম্মকর্ম্মণোঃ।
একত্রান্যতরো বাপি প্রবলৌ যোগকারকৌ॥

পূর্ব্বোক্ত দশবর্গ বিচারস্থলে ৯ম ও ১০ম পতি পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত হওয়ায় "পারিজাতস্থিতৌ তু নৃপো লোকানুশিক্ষকঃ"—জাতক উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া লোকশিক্ষক হইতে পারিয়া ছিলেন।

সুখকর্ম্মাধিপৌ চৈব মন্ত্রিনাথেন সংযুতৌ ।
ধর্ম্মেশেনাথবা যুক্তৌ জাতশ্চেদিহ রাজ্যভাক্।
লগ্নাধীশাদ্ধননাথাদ্ধনে তুর্য্যে চ পঞ্চমে।
শুভখেটযুতে বিপ্রব্রজ্যাযোগং তথা ভবেৎ॥
ভাগ্যেশে লগ্নভাবস্থে লগ্নেশে ভাগ্যরাশিগে।
ধনেশে কেন্দ্রকোণস্থে খড়্গযোগ ইতীরিতঃ॥
তৎফলমাহ

বেদার্থশাস্ত্র-নিখিলাগম-তত্ত্বযুক্তি-বুদ্ধিপ্রলাপ-বলবীর্য্য-সুখানুরক্তাঃ।
নির্মৎসরাশ্চ নিজবীর্য্যমহানুভাবাঃ খড়্গে ভবন্তি পুরুষাঃ কুশলাঃ কৃতজ্ঞাঃ।

সায়ন কুণ্ডলীতে পূর্ণরূপে এবং নিরয়ণ কুণ্ডলীতে আংশিকরূপে অংশাবতার বা উজ্জ্বল বিভুতিযোগ ঘটিয়াছে।

কেন্দ্রগৌতি দেবেজ্যৌ স্বোচ্চে কেন্দ্রগতেঽর্কজে।
চরলগ্নে যদা জন্ম যোগোঽয়মবতারজঃ।

জাতকের শুভলগ্নগুলি কোণ কেন্দ্রে অবস্থিত। 'মন্দেন্দু'যোগ ও 'জীবভৌম' যোগ প্রবলভাবে ঘটিয়াছে।

পাতালে হি গতো ভৌমঃ সবলঃ সৌম্যদৃগ্‌যুতঃ।
লগ্নভাবে গতে সৌম্যে মনুজঃ কীর্ত্তিভাগ্ ভবেৎ॥ (যবনজাতকে)

শেষ কথা এই যে জাতকের রিপুপতি ও ধর্ম্মপতি বুধগ্রহ জন্মস্থলে এবং বিদ্যাকর্ম্ম ও যশঃপতি শুক্রগ্রহ উদিত অবস্থাপন্ন হইয়া জন্মস্থলে একত্র হওয়ায় জাতক ধর্ম্মার্থ যশস্কর কর্ম্ম এবং বিদ্যার্থই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায় এবং ধর্ম্মার্থ অনেক শত্রু সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া যশোভোগী হইয়াছেন। আর এই শুক্র উদিত ভাবাপন্ন বলিয়া ইঁহার বিদ্যা ও কর্ম্মজন্য যশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ব্যয়পতি ও পরাক্রমপতি বৃহস্পতি কর্ম্মভাবাপন্ন হওয়ায় জাতকের কর্ম্মে ধর্ম্মার্থব্যয় অর্থাৎ ত্যাগ এবং পরাক্রমই প্রধানরূপে লক্ষিত হইবে।

ধনপতি এবং জন্ম বা দেহপতি শনি ধর্ম্মস্থানে উচ্চাভিলাষী হইয়া অবস্থিতি করায় দেহকে অর্থাৎ জীবনকে ধর্ম্মার্থই এবং গুরুসেবাতেই নিয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায়।

এই যোগটি পরমহংসদেবের সহিত একরূপ হইয়াছে। তবে তাঁহার শনি তুঙ্গ বা উচ্চস্থ। কিন্তু ইঁহার উচ্চাভিলাষী সুতরাং তাঁহার তুলনায় অল্পফলপ্রদ এবং সেই জন্যই ইনি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

আর এই সব ফলগুলি উপরোক্ত বিশেষ বলবান রাজযোগের সহিত একত্র হওয়ায় ইঁহার তুল্য ব্যক্তি ইঁহার সময় দুর্লভ হইবে।

সুরাট মল্লার-একতালা

মন চল নিজ নিকেতনে।

সংসারবিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে ॥

বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন,

পরপ্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে ॥

সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,

সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে ;

লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,

পরম যতনে রাখরে প্রহরী শম দম দুইজনে ॥

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম,

পথভ্রান্ত হলে শুধাইবে পথ সে পান্থ-নিবাসিগণে ;

যদি দেখ পথে ভয়েরি আকর, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,

সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥

(শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত প্রথম দর্শনের দিন স্বামীজি এই গানটি তাঁহাকে শুনাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন।—পৃঃ ১০৫)